ভক্তির প্রাণ

অধ্যাপক শ্রীভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম এ
রিসার্চ্চ স্কলার।

মূল্য ৪৲ টাকা

কলিকাতা,
৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীটস্থ
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীরাধাবল্লভ কর্ম্মকার দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক
বি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোম্পানী,
২৫নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

যিনি

সাধুগণের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে

সাধুবংশে জন্মিয়া

নিজের মহিমান্বিত বৈষ্ণব আত্মা

ক্ষুদ্র দীনরূপে প্রকাশ করিয়া

চরিত ক্রমে

স্বর্গলোকে পদস্থাপন করেন

সেই আত্মমিত্র

শ্রীউপেন্দ্র

তুষ্টিলাভ করুন।

মুখবন্ধ

প্রাণের মূল রহস্য দেখাবার জন্যই মানুষের 'দর্শন-শাস্ত্র'। দেখবার ও দেখাবার নানা রীতি। এ বিষয়ে সাত্বতদিগের মত আলোচনা ক'রে ঐ রহস্য যেমন বুঝেছি তাই নিজের বিচারবুদ্ধিমত এই গ্রন্থে প্রকাশ ক'রলাম। সব প্রাণ এক প্রাণে, এক প্রাণ সব প্রাণে, দু ভাবেই প্রাণে নিত্যই কাজ, নিত্যই জ্ঞান, নিত্যই আনন্দ। শুদ্ধ প্রাণ নিজের লীলায়, নিজের ইচ্ছায় আত্মগোপন ক'রে প্রাণের খেলা খেলেন। খেলার অভিনয়ে বিভোর হ'য়ে বিহ্বল হবার ভাবই প্রাণের অশুদ্ধ ভাব। এই অশুদ্ধ ভাব সুতরাং প্রাণের ছল। ছল ছল ব'লে তার মূলে খেলার ভাবটা অবশ্যই সত্য, খেলাটাই কেবল ছলনা। এই ছলে জীব আত্মহারা, তাই তার কাছে প্রাণের জীবনের কাজে জন্ম মৃত্যু, জ্ঞানের ভাবে নূতন বোঝা ভুল করা, আনন্দের ভোগে পেয়ে সুখ হারিয়ে দুঃখ। শুদ্ধ প্রাণ শুদ্ধ ভাবে এই ভাবের অতীত, খেলার অভিনয়কে অভিনয় ব'লে যখনই ধ'রতে পারে তখনই এই ভাবের অতীত। প্রতি প্রাণের পেছনে এক অখণ্ড প্রাণের ভাব ধ'রতে পারলেই জীব এই শুদ্ধ ভাব পায়। এই ভাবে প্রত্যেক প্রাণ এক প্রাণের ভাগীদার, সেই প্রাণেরই 'ভক্ত'। প্রাণের এই ভক্তির ভাবই এই গ্রন্থে বিশেষ ক'রে আলোচনা করবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। যে দিকে এই ভক্তির ভাবকে যেরূপে দেখেছি সেই দিক্ ধ'রে তাই দেখাবার জন্য যত্ন ক'রেছি। কোনও সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বাঁধবার চেষ্টা করি নাই। সাত্বতদিগের মতই কেবল মাত্র 'ভক্তির প্রাণের' ভিত্তি। যা গেঁথেছি তাতে যেমন যা ত্রুটি হ'য়েছে, তার জন্য নিজের বিচারবুদ্ধিরই দোষ। পদে পদে এরূপ ত্রুটি যে হ'য়েছে বেশ বুঝি। তবু প্রাণের জিনিষ যেমন ভাবে দেখি তেমন ভাবে দেখাতে দোষ নেই ব'লেই 'ভক্তির প্রাণ' প্রকাশ ক'রতে সাহস ক'রলাম।

ভক্তির ভাব প্রাণের দীনহীন কাঙ্গালের ভাব, কেননা ভক্তির প্রাণ শুদ্ধ প্রাণের প্রাণের পাশে অতি ক্ষুদ্র, প্রতিপদে তাঁরই অনুগ্রহের ভিখারী। তাই দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, সেই মত ভাষায়, 'ভক্তির প্রাণ' সাধারণের গোচর করা গেল। কাঙ্গালের উচ্চ সংস্কৃত বেশ মানায় না। তবে যেখানে প্রাণের ঐশ্বর্য্য আপনা আপনি দীন বেশের ভেতর দিয়েও ফুটেছে, ভাষার বেশেও তার আভাস অগত্যা এসেছে।

চুঁচুড়া,
হুগলি কলেজ, ডিসেম্বর ১৯২২

ইতি
বিনীত গ্রন্থকার

ভক্তির প্রাণের সূচিপত্র

ভক্তির প্রাণ।



কাজের তাড়া

কাজ, কাজ, কাজ ক'রেই মানুষ পাগল। সকাল বেলা উঠেই বাড়ীর কর্ত্তা একবার ভেবে নেন, সারা দিনরেতে তাঁকে কি ক'র্ত্তে হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেন কতটা কাজ অপরকে দিয়ে ক'রিয়ে নেবেন। সব ঠিক ক'রে হুকুম দেন, আর নিজেও কোমর বাঁধেন। বাড়ীর গিন্নী উঠলেন, উঠেই দেখে নেন ঝি চাকর কতটা কি ক'রলে, দেখে শুনে তাদের কাকে কি ক'রতে ব'লবেন মনে মনে সেটা ঠাওর করেন, ক'রেই সময়মত তাদের দিয়ে সেই কাজ গুলি ক'রিয়ে নেবার চেষ্টায় থাকেন। আর নিজেও যে কাজে যতটুকু তাল দিতে হবে, সেটাও ভাবতে ভুলেন না, ভেবে চিন্তে সেইরকম তালটা দিয়ে যান। ছেলেপিলেগুলাও ঘুমথেকে উঠে পর্য্যন্ত যার যেমন কাজ, তেমনি একটা না একটা কাজে আছেই। ঝিবৌরাও যে যেমন কাজের, তারা তেমনি তেমনি কাজেই সকাল থেকে লেগে থাকে। কাজ না ক'রে কাহারই পার পাবার উপায় নেই।

ঘরেও যা বাহিরেও তাই। পথের পথিককে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দেবে, কি না কি একটা কাজের জন্যই চলেছে। কেউ হাটে বাজারে খাবার দাবার সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যস্ত। কেউ বা মেহনত করে দুপয়সা উপায় করবার জন্যই ছুটা ছুটি ক'রছে। কেউ বা যা হয় কিছু একটা ক'রে, যে কোনও একটা কাজে যোগ দিয়ে, নিজেকে

চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছে। শুধু একটু আনন্দ, একটু সুখ পাবার তরেও কেউ বা লালাইত হ'য়ে কোনও একটা কাজ নিয়ে প'ড়েছে। কিছু জানবার নিমিত্তে, কিছু শোনবার নিমিত্তে, কিছু শেখবার নিমিত্তেও কত লোক কত কাজে কত জায়গায় র'য়েছে। প্রাণের মায়া, প্রাণের মমতার খাতিরেও, এখানে সেখানে কত জন কত কি ক'রছে, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

তুমি ঠাকুর এখনি ব'লবে, সবাই বৃথা কাজে ঘুরে ম'রছে। মানুষ সবাই প্রায় বোকাই। প'ড়ে, শুনে, দেখেও মানুষের চোখ ফোটে না। নহিলে কি এমন হয়? কাজ কাজ ক'রে ত মরে, কাজ ক'রে কে কবে শান্তি পেয়েছে? কাজের পর কাজ, আবার কাজ, নিবৃত্তিও ত নেই। যদি দেখা যেত, কিছু দিন কিছু ক'রে তারপর মধুর আরাম, তাহ'লে না হয় বোঝা যেত, কাজের একটা আদি আছে, একটা অন্ত আছে, আর শেষে সুখ আছে। কৈ কুত্রাপি ত সেটা দেখা গেল না। খেটে খুটে কেবল কষ্টটাই বরাবর লাভ। আরত কিছু দেখা যায় না। বরঞ্চ যখন কাজ থাকে না, তখনই মানুষ, আঃ বাঁচা গেল, ব'লে আরাম করে। আর যখন লোক কাজের হাত হ'তে এড়ান পেয়ে রাত্রে নিদ্রার কোলে বিশ্রাম নেয়, তখনই মনে করে, অথবা ঘুমেথেকে উঠে বুঝতে পারে, হাঁ একটু শান্তি সুখ পেয়েছে। তবেই কাজের চেষ্টা নিজের অশান্তি নিজেই ডেকে আনা। এ ছাড়া বুঝে শুঝে ত আর কিছু বলা চলে না। কাজেই দুঃখ, কাজ ছেড়েই সুখ। এই সার কথা, এই খাঁটি সত্য। মানুষ কাজ ক'রে মরে, আর কাজ ছেড়ে বাঁচে। এ কথা অপলাপ করবার কিছুতেই জো নেই।

সংসারের সার তত্বটা পণ্ডিত মহাশয় এই রকমে বেশ আমার মাথায় ঢুকোবার চেস্টা করেন বটে, কিন্তু প্রাণ কি এতে বুঝ মানে? আমি মূর্খ, আমি না হয় নাই বুঝলাম, কিন্তু জগতের সবায়েরই ত একই গতি, কৈ কেউ বুঝতে চায় না কেন? মুখে যে যা বলে দেখি

বলুক না কেন, তত্ত্ব কথা শুনে বড় কাহাকেও ত কাজ ছাড়তে দেখলাম না। ছেড়ে ছুড়ে চ'লে যারা যায়, তাদেরও ত আবার একরকম না ঐকরকমের একটা সংসার পাতাতেই দেখি। নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে নীরবে আরাম ভোগ ক'রছে, এটাত কৈ বড় চোখে পড়ে না। সন্ন্যাসী ঠাকুর ত দেখি আমার চেয়েও বেশী কাজ নিয়ে ঘোরেন। তাঁর চেলার দল, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর আত্মীয় স্বজন, তাঁর সমাজটা, খুব খাট বোধ হয় না ত। জগৎটাকে উদ্ধার ক'রতে তিনিত কম ব্যস্ত, কম ব্যাপৃত থাকেন না। তবু ব'লবে তিনি কাজী নন, আমিই কাজী। কেন? কিসে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় হটবার পাত্র নন। ঐ শোন, গুরু গম্ভীর ভাবে তিনি নিষ্কর্ম্মার খাঁটি তত্ত্ব আওড়াতে আরম্ভ ক'রেছেন। তিনি বলেন "বাপুহে, সব কাজেইকি মানুষকে কাজী বলা চলে? ঐ যে তুমি ভবঘোরে প'ড়ে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই, ক'রে বেড়াবে, এটা দেও, ওটা দেও ক'রে লোকের কাছে মুখের ফেনা ভাঙ্‌বে, ঐগুলাই কাজ, আর ঐগুলা ক'রেই তুমি কাজী। প্রাণটাকে ব্যতিব্যস্ত করে মানুষ যখন এইরকম কাজের টানে পড়ে, তখন তার কাজের হাত থেকে এড়াবার জো থাকে না। একটা শেষ হ'তে না হ'তেই আর একটার টানে প'ড়তে হয়। একটা কাজে ফল হলেও আর একটা কাজের ফলের জন্য প্রাণটা ব্যস্ত হ'য়ে ওটে। অমনি আর একটা কাজে হাত পড়ে। আর কাজে ফল না হলেও মানুষ ব'সে থাকতে চায় না। ভাল দেখা যাক আর এক রকমে, আর এক খেলা খেলে, নিজের কাজটা হাসিল করা যায় কি না! এই রকমে সারা জীবনটা মানুষের কাজের বাঁধনে বাঁধা প'ড়তে হয়। নিষ্কৃতি নেই। ঐ আশা, ঐ আকাঙ্ক্ষাগুলা সব প্রাণের ভিতরে লুকান থাকে, আবার একটা দেহ পেলেই জেগে ওঠে। ভবঘোরে কাজের ফেরই এমনি। কিন্তু বাপু যদি এটা ওটা চাই এভাব টুকু ছেড়ে দিতে পার, তবে আর তোমায় কাজ বাঁধে কিসে? একে-বারে বাপু যদি নিষ্কাম হয়ে প'ড়তে পার, তবেই ত তুমি ফলে নিষ্কর্ম্মা

হয়ে দাঁড়ালে। কাজ যখন তোমায় টানতে পারছে না, তখন তুমি কাজী কিসে? কাজে ঝোঁক যখন তোমার প্রাণের কোনও আশা থেকে আপনি নিজের জোরে উঠছে না, তখন তুমি কিছুতেই কাজী নও। হয়ত এখনি জিজ্ঞাসা করবে এও কি সম্ভব? কিছু চাইনে, কিছু ক'রব না, ত থাকব কি নিয়ে? থাকবার পরিচয় বা কি দেব? এর উত্তর আমি ব'লব যে বাপু যাতে তোমায় বাহিরের টানে ঘুরিয়ে মারে এমন কিছু চেও না, এমন কাজ ক'র না। প্রাণের ভিতর দিকে চেয়ে প্রাণের কাছে দাঁড়াও, তাঁকেই ভাব, তাঁর ভাবেই চল ফের। বস্! তুমি নিশ্চিন্ত। কাজের টানে, ভব ঘোরে প'ড়তে আর হবে না। এরকমের কাজেও অকাজ। বুঝলে ত কাজ হলেই কাজ হয় না। সন্ন্যাসী ঠাকুর এইরকমের যখন কাজী, তখন তিনি নিষ্কর্ম্মাই বটেন, এতে আর সন্দেহটি নাই।

ঠাকুর তাই যদি হ'ল, তবে তুমিও ত, আমি বোকা সোকা হ'লেও, আমার মতেই ফিরে দাঁড়ালে। তবে তুমি পণ্ডিত, কাজের কথায় একটু ভাবের তফাৎ ক'রলে বটে। ওটা মেনে নিলেও কিন্তু ব'লতে হবে, যে কাজ না ক'রে থাকতে পারা যায় না। এ সত্যটা খাঁটি সত্য সাচা কথা। বাহিরের কাজ, আর ভিতরের কাজ, এই যা প্রভেদ। ঘুমের ঘোরেও মানুষের প্রাণটা ভিতরের কাজেই আছে। স্বপ্নই দেখুক আর নিজের খোজটাই লউক। যোগী ঠাকুরও যোগে ঐ ভিতরের কাজে—বড় প্রাণের সঙ্গে নিজেকে মিল মিশ খাওয়াবার চেষ্টায় আছেন। বাইরের কাজে তুমি আমি নিজের প্রাণেরই ফূর্ত্তির চেষ্টায়, স্বার্থের তাড়নায়, ঘুরে বেড়াও ও বেড়াই; মহা-প্রাণের সেবকের কিন্তু জগতের প্রাণটা, সকল প্রাণীর প্রাণটা যাতে ফুর্ত্তি পায়, জগতের স্বার্থটা যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টাতেই চলেন ফেরেন। ফল কাজের তাড়া সর্ব্বত্রই।

কেন এমনটা হয় বুঝবার চেষ্টা করেছে কি? বুঝতে চাইলেই এটা অতি সহজেই বুঝা যায়। কঠিন কথা কিছুই নয়। চারিদিকেই

দেখ, একটু তলিয়ে দেখ, বেশ মনে মনে ঠাওর ক'রে দেখ, বুঝবে সকল ঘটেই একটা প্রাণের অধিষ্ঠান আছে। সবই জীবন, সবই জীব, সর্ব্বত্রই প্রাণ। যেটা ম'রেছে বলে মনে হয়, সেটার অন্তরালেও কোটী কোটী জীব। শুধু তাই নয়, শত শত জীব নিয়ে আলাদা একটা প্রাণের অধিষ্ঠানে একটা জীব, আবার সেই রকম সব জীবের উপরে একটা জীব। এই রকম সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রাণের ধারা। একটা প্রাণের মহাস্রোতে ছোট ছোট প্রাণ, তাদের আশ্রয়ে, তাদের অধিষ্ঠানে, আরও ছোট ছোট প্রাণ। এই রকমেই ব্রহ্মাণ্ডটা সাজান।

সাড়ীগাঁথা সাজান গোজান কতকগুলা ছোট প্রাণের উপরে একটা প্রাণের যখন লোপ হয়, সে প্রাণটা যখন আর একটা অন্য রকম সাজান গোজান প্রাণের সাড়ীর ভিতর স'রে যায়, তখন যেখান থেকে বড় প্রাণটা চ'লে যায় সেটাকে বলি মরা জিনিষ। বড়'র দিক্ দিয়ে সেটা প্রাণহীন বটে, তার ভিতরে ছোট ছোট প্রাণের খেলা কিন্তু ঠিক আছে, তবে অন্য ভাবে। 'পঞ্চত্ব' পেয়ে পঞ্চ ভূতের সঙ্গে মিশে, যে যে প্রাণে সেই সেই ভূতের বাসা, সেই সেই প্রাণের অধিষ্ঠানেই তখন মরা দেহটা ছড়িয়ে পরে। ভূত-গুলা ছোট বড় প্রাণের ঘাড়ে চেপে সারা জগৎটা ভেল্কি করে বেড়ায়, প্রাণের চোখের উপর মরা দেহের ভৌতিক কাণ্ড দেখায়। ভূতের দেহটা ছায়াবাজী অসারই। প্রাণ কখন মরে না, ম'রতে জানে না। 'মরাপ্রাণ' সোণার পাথর বাটী। 'প্রাণ' বেঁচে থাকবেই। নিজের অস্তিত্বটা সে জাগিয়ে রাখবেই রাখবে। ছোট প্রাণ, বড় প্রাণ, সবার সম্বন্ধেই এ কথা অব্যর্থ ভাবে খাটবে। কাজেই প্রাণের বেঁচে থাকার পরিচয়। অন্য রকমে তার পরিচয় মাথাতেই আসে না। নিজেকেই যখন নিজে দেখে, নিজেকেই যখন নিজে ভাবে, নিজের আনন্দেই যখন নিজে থাকে, তখনও প্রাণ কাজেই বেঁচে থাকবার পরিচয় দেয়। এ অন্যথা হয় না, হ'তে

পারে না। যে সৎ, তার যে অস্তিত্ব আছে, সেটা সকল অবস্থাতেই একরকম না একরকম কাজেই। নিজের প্রাণের ভাব, সতের ভাব, বজায় রাখতে, প্রাণকে, প্রাণধারী জীবকে, কাজ ক'রতেই হবে। এই হ'ল সার কথা। ছোট ছোট প্রাণের উপরে বড় প্রাণ থেকে ছোট ছোট প্রাণ গুলাকে চালিয়ে আপনি চলে। ছোটগুলা তার মাঝে যতদূর সম্ভব আপনাদের খেলা খেলে। মানুষের ভিতরে কোটী কোটী জীব, একবিন্দু রক্তের মধ্যে অগুণতি জীব, তার তার ভিতর আবার কত কত জীব, এমনি এমনি ধারায় প্রাণের চালনায় অনুচালনায়, মানুষের প্রাণ কাজের স্রোতে ভেসেছে। মানুষ ছেড়ে অন্যদিকে তাকাও ঐ একই রীতি, একই নিয়ম। যেখানে বড় প্রাণ ম'রেছে, সেটাকে বলি অচেতন; সেখানে ছোট প্রাণের বাঁচবার ধারা ঠিক বজায় আছে। গাছ পালা গুলা যখন জীবন্ত, তখন তাদের বড় প্রাণটা ঠিক সজাগ। ম'লে ছোট প্রাণ গুলা নিজের নিজের ভাবেই বেঁচে থাকবে।

এইবার বুঝলেত ভাই কাজ তোমার ক'রতেই হবে। পায়ে চলবেনা, মনে মনে চলতে হবে। চোখে দেখবে না, মনে মনে দেখতে হবে। কাণে শুনবে না, মনে শুনবে। মুখে খাবে না, মনে খাবে। সংসারের কাজ নিয়ে না চল, না দেখ, না শুন, না খাও, ভিতরের কাজ নিয়ে এ সব ক'রতে হবে। নিজের প্রাণটাকে কখনই ঝেড়ে ফেলে দিতে পারবে না। আত্মহত্যা তোমার ক্ষমতার অতীত। আত্মা ঘুরবে ফিরবে চলবে, আত্মার স্বভাবটাই ওই। এমন ধারণা ক'রতেই পায় না, যে ওটা একেবারে বিকল হয়ে প'ড়বে। মুখে ব'লতে পায়, ভেবে কিছুতেই উঠতে পারবে না। পারবে কিসে? যা নিয়ে তোমার ভাবনা, সে সব গুলাতেই যে কাজের খেলা। কাজেই সমস্ত জগতের ভাব, তাতেই তোমার ভাবনা। জগৎ ছেড়ে তোমার ভাবনা কোথায় দাঁড়াবে? নিজের উচ্ছেদ না হ'লে তা হয় না। নিজের উচ্ছেদ কথার কথা, পাগলের প্রলাপ, সুবোধের কথা নহে।

বড় বড় বেদান্ততীর্থ সাংখ্যতীর্থ তর্কতীর্থ তোমার বাড়ী চলাফেরা করেন, সংসারের সার কথা তাঁদের মুখে তুমি খুবই শুনছ, সুতরাং বেশ বুঝছি তুমি এখনি একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বলবে, প্রাণটা একবারে নস্যাৎ নাই হোক, ওটার 'আমি এক জন' এ ভাবটা উড়ে যাবে বৈকি। আর সেইটা যাতে হয়, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে এড়াতে হ'লে তার জন্যই ত চেষ্টা ক'রতে হয়। কথাটা কিন্তু প্রাণের ভিতর থেকে বল'তে পার কি ভাই ?

আমি আছি ভাবা যার স্বভাব, তার সে স্বভাব ঘুচবে কিসে ? জলের ফোঁটা সাগরে মিশলেও তার নিজের কাছে সে নিজের আছে। প্রাণটা যেখানেই মিশুক না, যত বড় প্রাণেই মিশুক না, নিজের কাজে সে নিজেই আছে। তার নিজের থাকা হলনা, এ ত কিছুতেই হ'তে পার না। বলবে আগুনের ফুলকো আগুন থেকে বেরিয়ে একেবারেই লোপ পায়, প্রাণটাও তেমনি বড় প্রাণ থেকে বেরিয়ে, ভবের খেলা শেষ ক'রে, ফুলকোর মতই ঘুচে যায়। না এ বলতে পার না। আগুনও কিছু একটা জিনিষ নয়, ফুলকোও কোনও জিনিষ নয়। অন্য একটা জিনিষের অবস্থার ভেদে আগুন, আর ফুলকো। আগুন নিবলে সে জিনিষটা তাতে লোপ পায় না। ছ'ড়িয়ে প'ড়লেও ভাগে ভাগে ছ'ড়িয়ে থাকে। প্রাণের দশ দশা ঘুচে যায় যাক, প্রাণ যাবে কোথা ? প্রাণ ত একটা দশা নয় যে ঘুচবে। খাঁটি জিনিষ যেটা সেটা কখনও উপে যায় না। কর্পূরের কণাগুলা খুব ছোট ছোট হ'য়ে হাওয়ায় মিশে যাক, কণায় কণায় কর্পূর ঠিক থাকে। প্রাণ কিন্তু ছোট হ'তে জানে না, ভাঙতে জানে না, গুঁড়িয়ে যেতে জানে না। ঘি জ্ব'লে গিয়ে ঘিয়ের কণা হাওয়ায় মিশুক, তাতে ঘিয়ের একবারে লোপ হয় না। প্রাণ বড় প্রাণের সঙ্গে মিশে, তার জ্যোতির সঙ্গে নিজের জ্যোতিটা মিশিয়ে দিয়ে, ঘিয়ের মতনও জ্ব'লে যায় না। ভৌতিক কাণ্ডে ছেদ ভেদ চলে, খাঁটি জিনিষ প্রাণ আস্তই থাকে। যদি বল ভাল উপে যাক আর নাই যাক, আকাট আড়ষ্ট

হয়ে ত প্রাণ থাকতে পারে, আর সেইটা হ'লেই ত ভাল হয়, সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। যতই বল, কিছুতেই আমি বুঝব না, প্রাণ আর প্রাণ থাকবে না, প্রাণ ছাড়া হ'বে। তার অস্তিত্ব ভাসবেই, আর সেই ভাবে সে কিছু করবেই। থাকা আর করা তার ধাতুর সঙ্গে জড়ান। প্রাণের ধাতে নিষ্কর্ম্মার ভাব সয় না, সইতে পারে না।

যেটা নেই সেটা হয় না, আর যেটা আছে সেটা ভাই কিছুতেই ঘুচে যায় না। নিজের অস্তিত্বই প্রাণের অস্থি মজ্জা, সে ঘুচবে না। তার উপরে সে ছোট হতেও জানে না। তবেই তাকে কাটতে পার না, পোড়াতে পায় না, জলে গুলতে পায় না, তার রস টেনে তাকে শুকিয়ে মারতেও পার না। জগতের সব স্তরেই সে আছে, ছোটর ছোট, বড়র বড়। ছোটগুলাকে কোলে ক'রে বড় প্রাণ,বড়গুলাকে কোলে ক'রে আরওবড় প্রাণ, ক্রমে বিশ্ব জুড়ে বিশ্বের প্রাণ। সকলের চেয়ে বড় এই প্রাণটাই সবগুলাকে চালায়, আর নিজেও খেলা ধূলা করে। বড়র বড়, ছোটর ছোটগুলা সব নিজের নিজের গণ্ডির মধ্যে থেকে নিজের নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে থাকে। সবাই ক'রবে কাজ, কিন্তু নিজের নিজের সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবে না।

এখন জোড় গলায় বলা যায়, থাকতেও হবে, কিছু না কিছু ক'র্ত্তেও হবে। সবাইকেই হবে। স্বভাবের তাড়াতে, প্রাণের তাড়াতে কাজ ক'র্ত্তে হবে। চোকই বোজ, আর নাকই টেপ, অকেজো হতে পার্ব্বে না, হ'তে চেও না। মরাই ভাল ব'লে আর হা হুতাশ ক'র না। ম'রতে পারবে না, মরা হবে না। বল আর না বল, বাঁচতেও হবে, কাজ ক'র্ত্তেও হবে। এমন অবস্থায় ঢিল দিয়ে আর লাভ কি ? কাজ কর, খুব কাজ কর, কাজ নিয়েই থাক ; আর বল কাজ নিয়েই থাকব। মিছে কথার ফাঁদে পড়ে নিষ্কর্ম্মা হ'তে গিয়ে অকর্ম্মা হও না। ভাল ক'রতে না পার মন্দ ক'রতে হবে। প্রাণের কাজের তাড়া বিষম তাড়া। কাজ ক'রবেই ক'রবে,তবে দেখো বুঝে শুঝে ক'রো। নইলে বড় ঝঞ্ঝাট,

বড় জ্বালা। ঠিক কাজটি বুঝে নিয়ে না ক'রলেই বিপদে প'ড়েছ। প্রাণ যখন কাজই চায়, তখন প্রাণের ঠিক যা কাজ তাই আগে বুঝে নাও, নিয়ে কাজ কর। প্রাণটাকে বৃথা ঘুরিয়ে মের না, তাকে 'বিরক্ত' ক'র না, তাকে পালাই পালাই ডাক ছাড়িও না।

এখনি তুমি ব'লবে, বল'বে কেন ঐ ব'লচ, প্রাণের তাড়ায় কাজ ত ক'র্ত্তে হবে, বুঝবো কার তাড়ায়? তাড়া না থাকলে বুঝবোই বা কেন? এ কথা অবশ্যই ব'লতে পার। যে তোমায় করাতে চায়, সে তোমায় বোঝাতেও চায়। তুমি ভাল না বোঝ, তার দোষ নয়, তুমি ভাল না কর, তার দোষ নয়। করবার তাড়াও প্রাণে, বোঝবার তাড়াও প্রাণে। একটু অপেক্ষা কর সে কথাটা খুলে ব'লছি। মনে জেনে রেখ, যে থাকতে চায়, ক'রতে চায়, সে জেনে শুনেই থাকতে চায়, ক'রতে চায়। সতের সঙ্গেই চেতনা, ভাবের সঙ্গেই ভাবনা। যেখানে চেতনা নেই সেখানে খাঁটি কিছুই নেই। ভাবনা না থাকলে অস্তিত্বও নেই।

(২)

জানবার ঝোঁক।

সবাই বাঁচতে চায়, মুখে বলুক আর নাই বলুক, মনে মনে প্রাণে প্রাণে, বাঁচতে ছাড়া ম'রতে কেউ চায় না, চাইতে পারে না, চাইবার জো নেই। বাঁচতে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে শুঝে প্রাণ বাঁচিয়ে চ'লতে হবে, একথাটাও বুঝতে সবাই পারে, বোঝে ও সবাই। বুঝে না চ'ললেই বিপদ্, প্রাণ বাঁচান ভার। একটু বেহুঁস হ'লেই একটা না একটা ঘা খেতে হবে। যতক্ষণ হুঁস থাকে প্রাণটাও ততক্ষণই ঠিক থাকে। ম'লে একবারেই বেহুঁস। লোকে তাই যখন দেখে কেউ একটু অবুঝের মত, একটু বেহুঁসের মত কাজ ক'রে ফেলেছে, অমনি বলে, তুই ম'রেছিস। হুঁসিয়ার হ'য়ে তাই সবাই থাকতে চায়, হুঁসিয়ার হ'য়ে সবাই চ'লতে চায়।

মানুষের সব কাজ একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ, দেখবে যে সবটার ভিতরেই সে যে স'মজে চ'লছে এটা খুব স্পষ্টই দেখা যায়। খেতে ব'সেছে, ব'সে প্রাণ তার যেটা চায় না, সেটা সে জিবে দেবে না, দিতে চাবে না। জিবটেই তখন তার প্রাণের দরজা। ঐ খানটা দিয়েই প্রাণটা তখন বাহিরের সঙ্গে গতায়াতটা রেখেছে। যেই কোনটা ভাল লাগল, বেরিয়ে আদর করে প্রাণ সেটীকে তুলে নিলে। আর যেই কোনটা খারাপ লাগল, নিজের সঙ্গে মিশ খেল না, অমনি দরজাটা বন্ধ করে দিলে, ভিতরে নিজে লুকিয়ে রইল। ভাল একটা কিছু শুনতে পেলে কাণের দরজাটা তখনি খুলে দেয়, আর মন্দ লাগলেই দরজাটা একরকম বুজিয়ে দিতে চায়, দিয়ে নিজে ভিতর দিকে স'রে প'ড়তে চায়। ভাল গন্ধ পেলে নাকটা ফাঁক ক'রলে, আর দুর্গন্ধে নাকটা বুজলে। খুব ভাল দেখলে চোখদুটা দিয়ে যেন সেটাকে গিলতে যায়, কদাকার দেখলে সেদিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, না হয় বোজে। ভাল নরম সরম একটু মিটে ঠাণ্ডা গায়ে লাগলে সেটাকে যেন জ'ড়িয়ে ধরে, আর কড়া রকমের বা বেশী গরম বোধ হলে, যেন গায়ের ছেঁদাগুলা বুজিয়ে দিয়ে ভিতরে পালাতে পারলে বাঁচে। ফল কথা চোক, কাণ, নাক, জিব, গা, এই সব দরজার কপাটগুলা বিপদ্ বুঝলেই প্রাণ এক রকমে না এক রকমে বন্ধ ক'রে দিতে চায়।

মানুষের কথা ছেড়ে দাও, বনের পশু, গাছের পাখী, এমন কি ছোট ছোট পোকা মাকর, এগুলার কাজের রীতি যদি বেশ ক'রে দেখ, দেখতে পাবে সবাই হুঁসিয়ার, সবাই সতর্ক। নিজের সঙ্গে তর্ক ক'রে, বিচার ক'রে, বেশ যখন বুঝতে পারে নিজের সেটা দরকার, তখনি সেটা ক'রতে তাদের প্রাণ এগিয়ে আসে। নইলে পেছিয়ে পড়ে, বাহিরে আর নিজেকে ধরা দেয় না। দাউ দাউ আগুন জ্ব'লে উঠেছে, অমনি সবাই প্রাণ নিয়ে পালাবে, আগুনের ঝাঁজ, আগুনের তাপ, প্রাণে কারু সইবে না। কড় কড় কড়া করে বাজ প'ড়ল, আর যে যেখানে ছিল দেখতে দেখতে প্রাণটা বাঁচাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল, যেখানে

হোক যেন কোথায় লুকিয়ে প'ড়ল। ও শব্দে, ও মারত্মক শব্দে, সবাই-কের প্রাণেই বড় ত্রাস। বিষের হাওয়া বইলে, সে গন্ধে, সে বাষ্পের কাছে, কেউ তিষ্ঠিতে চায় না, প্রাণের মায়ায় পারে ত স'রে যাবেই যাবে। বিষ খেতে কেউ চায় না, সবাই মুখ স'রিয়ে নেয়। খুনেকে সম্মুখে দেখলে সবাই ড'রিয়ে ওঠে, শিউরে ওঠে। সে আকার প্রাণের দেখবার নয়, প্রাণ তা দেখতে চায় না।

বেশী কথায় কাজ কি, শাক সবজি গাছ পাতরাগুলাও প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যতটা সম্ভব সতর্ক। অচল, নড়বার ত ক্ষমতা নেই, বিপদের সময় প'ড়ে মার খেতে হয়, তবু যতক্ষণ পারে, যতক্ষণ প্রাণটা থাকে, নিজের কোটরের মধ্যে প্রাণটা জীইয়ে রাখতে চায়। শুকনা বাতাস বইতে লাগল, আর বাহিরে যে প্রাণের স্ফূর্ত্তির পরিচয়টুকু ছিল, অমনি সেটুকু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বা শুকিয়ে মুকিয়ে প্রাণটাকে ভিতরেই টেনে রেখে দিলে। সুদিন এলে, সুবাতাস বইলে,আবার এদের প্রাণ সেজে গুজে বেরুবে। বিষ খাওয়াতে গেলে, বিষ ছোঁয়াতে গেলে, বিষ সোঁকাতে গেলে, এরাও সিট্‌কে মিট্‌কে ওঠে। ছিঁড়বে বুঝলে, ভাঙবে বুঝলে, উপড়ে ফেলবে বুঝলে, জড়সড় হ'য়ে পড়ে। প্রাণের মায়া এদেরও আছে, প্রাণ যাবে বুঝলেই প্রমাদ গণতে থাকে। সংসারের এক একটা ঘটনা দেখে হয়ত হঠাঃ তোমার মনে খট্‌কা লাগবে, ঐ ত কেউ কেউ বুঝে চ'লতে চায় না, প্রাণ বাঁচাতেও চায় না। তলিয়ে দেখলে এ ধাঁদাটা বেশী ক্ষণ থাকবে না। যে ম'রতে চাইছে তার প্রাণের ভিতরটা একবার যদি তাকিয়ে দেখ, দেখবে যে সে বাঁচতে চায় ব'লেই ম'রতে চাইছে, ম'রতে চায়না ব'লেই বাঁচতে চাইছে না, বুঝে চ'লতে চায় বলেই বুঝ মানে না। কথাটা একটু খুলে না ব'ললে ভাল ক'রে বলা হবে না।

এ যে দেখছ এক অনাথা, নিজের জীবনের সার, নিজের জীবনের আশা, যার মুখ তাকিয়ে প্রাণ ধ'রে রেখেছিল, সেই ছেলে হারিয়ে, তাকে যমের হাতে দিয়ে, আর বাঁচতে চাইছে না, সেটা কেন বল দেখি ?

বেশ বুঝ, দেখবে ঐ অনাথাটা প্রাণে প্রাণে তাকেই জ'ড়িয়ে ধ'রে ছিল, তার প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণকে এক ক'রে নিয়ে ছিল,'আমার' ব'লতে যা কিছু সেটা ঐ ছেলেতেই তার ছিল। যখন প্রাণের সেই প্রাণটাকে সে আর খুঁজে পায় না, তখন তার প্রাণটা আর বাঁচে কিসে? যে সম্বন্ধটা, যে বাঁধনটা, এই জীবনের এক মাত্র বাঁধন বলে সে ভেবে নিয়েছিল, সে বাঁধনটা যখন খ'সে গেল, তখন আর সে থাকে কি ক'রে? কিন্তু বাঁচতে সে ঠিক চায়, প্রাণটা যাতে সুস্থির হয় তা সে না চেয়েই পারে না। ভিতরে তার বাঁচবার টান খুব। তাই সে নিজের প্রাণের সঙ্গে একটা বিচার করে বুঝে নেয় যে দেহটা না বদলালে প্রাণ তার ধরে আসবেনা, এ দেহটার সঙ্গে যে বাঁধনটা ঘটেছিল সেটা যখন ছুটে গেছে তখন ছাড় দেহটাও যাক। ও দেহটা রাখবার জন্যে সে আর তখন যত্ন ক'রতে চায় না, বুঝে শুঝে হিসাব ক'রে, দেহটা রাখবার নিয়ম গুলা মেনে চ'লতে চায় না। ঐটা ফেলে দিয়ে আবার নূতন সংসার সে পাতাতে চায়, নূতন বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে চায়। সে দুঃখে শোকে কিছুতেই বুঝ মানছে না বটে, তার ভিতর কিন্তু আসলটা সে বুঝে নিয়েছে, নিয়ে সেই রকমে নিজেকে চালাতে চাইছে, এটার পরিচয় তার অবুঝের কাজের মধ্য দিয়েও বেশ পাওয়া যাচ্ছে। প্রবোধ না মেনেও সে বুঝেছে, না বাঁচতে চেয়েও সে ঠিক বাঁচতে চাইছে।

ঐ যে ঐ পাগলাটার,হিত অহিত জ্ঞান নেই, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই, ঐ ঝাঁপিয়ে জলে প'ড়ছে, ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে প'ড়তে চাইছে, তার ভাবগতিক দেখেও তোমার মনে হ'তে পারে বটে যে ও বোঝেও না, বাঁচতেও চায় না। নারে ভাই, ও ঠিকই বোঝে, ঠিকই বাঁচতে চায়। ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, এ দেহটা ওর যতদিন আছে ততদিন ও আর সংসারের কোনও কাজেই আসবে না, যার জন্যে, যে সুখের জন্যে, যে ভোগের জন্যে, মানুষ বাঁচতে চায় এ দেহে ওর সে ভোগটা আর ঘ'টবে না: ওর প্রাণ সেটা বুঝে নিয়েছে ব'লেই দেহটার উপর ওর আব আস্থা নেই, দেহটা গেলেই ও বাঁচে। ও আবার তা হ'লে

নূতন দেহ নিয়ে নূতন সাজে, সংসারে চ'লবে, ফিরবে। ওর প্রাণের ভিতরের খবরটা এই। ওর কাণ্ডজ্ঞান আছে বলেই আপাততঃ কাণ্ডজ্ঞান নেই, হিত বোঝে বলেই এখন হিতাহিত দেখে না।

এই রকম জগতে দেখবে কোথাও ভালবাসার টানে পড়ে, কেউ বা গুরুতর শোক পেয়ে, কেউ দারুণ ক্রোধের বশে, কেউ দুরন্ত ভয়ে, কেউ বিষম লোক লজ্জায় বা ঘৃণায়, কেউ বা সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে একবারে ছাড়ান পাবার আশায়, নিজের দেহটার উপর আর মায়া মমতা রাখতে চায়না। নিজের প্রাণটা যাতে ভাল ভাবে থাকতে পারে সেইটা চায় ব'লেই, বুঝে শুঝে দেহটাকে তারা ফেলে দিতে চায়, ম'রতে চায়। তাদের মরণের কামনা, ঠিক দেখতে গেলে, বাঁচনেরই কামনা মাত্র। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সার বুঝেছে ব'লেই তারা অবুঝ সেজেছে, জেনেছে ব'লেই অজ্ঞানের কাজ ক'রছে। অজ্ঞান কেউ নয়, বোকা কেউ নয়।

মোটামুটি বলা যেতে পারে সবাই বাঁচতে চায়, আর যাতে বাঁচতে পারবে সেটা জেনে শুনে সাবধান হ'তে চায়। এটা সুতরাং বলাই বেশীর ভাগ যে বাঁচবার কামনার সঙ্গে বাঁচবার উপায় জানবার কামনা-টাও বরাবর থাকে, নইলে সতর্ক হ'তে পারবে কেন? প্রায়ই দেখবে বাঁচতে চেয়েও বাঁচবার উপায়টা ঠিক না বুঝতে পেরেই, যেটা উপায় নয় সেটাকে উপায় মনে ক'রেই, লোক ইচ্ছা না থাকলেও প্রাণ হারায়। খাবারে বিষ আছে না জেনে, প্রাণধারণ ক'রতে খাবার খেতে গিয়ে কারও বা প্রাণ যায়। জীবনযাত্রায় কাজের গতিকে নদী পার হ'তে গিয়ে বিপদের সম্ভাবনাগুলা ভাল ক'রে না বুঝতে পারায় কেউ প্রাণে মরে। প্রাণের দায়ে পালাতে গিয়ে কি হ'তে কি হ'তে পারে সেটা ঠাওর ক'রতে না পেরে, প'ড়ে গিয়ে দারুণ আঘাতে মরার কথাও অনেক শুনা যায়। ফড়িঙটে আগুন দেখে প্রাণের উল্লাসে আগুনে প'ড়লে কি হবে তা না জানায় আগুনে প'ড়ে পুড়ে মরে। প্রাণের সুখভোগের আশায়, কিসে কতটা দুর্ভোগ এটা প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারার অভাবেই

কত লোক অকাজকে সুকাজ মনে করে; তাই ক'রে প্রাণটা নষ্ট করে। ফল কথা প্রাণ যা চায়, তাই আছে জেনে সেটা পেতে গিয়ে তাতে প্রাণ যা চায়না সেইটা আছে, এটা বুঝতে না পারাতেই, বেঘোরে অনেকের প্রাণ যায়। ঠিক বোঝা গেলেই প্রাণটা থাকতে পারবে, ঠিক বোঝার অভাব হলেই প্রাণটা স'রে যেতে চাবে। ঠিক বুঝাই ঠিক বাঁচা, ভুল বুঝাই মরার ধারা।

বাঁচবার উপায়টা লোক জানতে পারে কিসে? পারে কর্ম্মভোগে। দেখে শুনেই জানতে হয়, আর গতি নেই। জীবনটা ত অল্প দিনের নয়। কত ওলট পালট হ'য়ে গেছে, কত যুগ কেটে গেছে। দেখা শুনা বর কম হয়নি। আর তুমি একলাও নও, কোটি কোটি মানুষ জ'ন্মেছে, ম'রেছে, তাদের দেখা শুনার ফলটা কতক কতক তোমার জানবার জন্যে ব্যবস্থা ক'রে গেছে। সুতরাং জানবার বন্দোবস্ত ঠিক আছে। জানবার ইচ্ছাও তোমার ঠিক আছে। এখন তোমার শক্তির উপরেই তোমার জানবার পরিমাণটা নির্ভর ক'রবে। কিন্তু যতটা জানবে ততটাই বাঁচবার পথটা প্রশস্ত ক'রবে। যা হ'ক, জানবার ব্যবস্থাটা জগতে কি রকমে আছে সেটা একবার বুঝ। সমস্ত জীব জগৎটা এই ব্যবস্থার মধ্যে কি রকম অবস্থায় আছে সেটাও সঙ্গে সঙ্গে ভাব।

তুমি যখন মায়ের কোলে ছিলে, খুব শিশু ছিলে, তখন তোমার শরীরটা বজায় রাখবার জন্য যা যা দরকার তোমার মা সব ক'রেছেন। তোমার খিদে পেলে তুমি কেঁদেছ, মা এসে মুখে দুধ দিয়ে গেছেন। কখনও খাবার সময় বুঝে তুমি না কাঁদলেও তোমায় মাই খাইয়ে গেছেন। তোমার পাছে ঠাণ্ডা লাগে, অসুখ হয়, গায়ে জামা জোড়া দিয়ে রেখেছেন। তোমার নিজের যখন বোঝবার শক্তি পাকেনি, তখন না বুঝে পাছে তুমি জলে পড়, আগুনে থাবা দাও, তাই এসব বিপদ্ থেকে বাঁচাবার জন্যে মা তোমায় চোখে চোখে রেখেছেন। হঠাৎ হয়ত একবার দীপে থাবা দিয়ে ছেঁক করে আঙ্গুলগুলা পুড়ে গেছে, আর তুমি কত

কেঁদে উঠেছ, তুই একবার পোড় খেয়ে, একটু বয়সের সঙ্গে জানবার শক্তি জন্মাবার সঙ্গে নিজেই এ বিষয়ে সতর্ক হয়েছ। বয়সের সঙ্গে, নিজেই ঠাণ্ডায় গায়ে জামা দিতে চেয়েছ। খাবার সময় নিজেই চেয়ে খেয়েছ। দেখে শুনে শিখেছ কি খেলে খিদে ভাঙ্গে, কি গায়ে দিলে ঠাণ্ডা না লাগে, সর্দ্দি জ্বর না হয়, শরীরে কষ্ট না পাও। যতই বয়সে বেড়েছ, ততই এই রকমে শরীর রাখবার জন্য যা যা দরকার দেখে শুনে শিখেছ, আর সেই রকম ভাবে নিজেকে চালিয়ে, শরীরটা, তোমার শরীরের মধ্যে প্রাণটা, বজায় ক'রে বাঁচিয়ে রেখে গেছ। ক্রমে এমন অবস্থায় এসে প'ড়েছ যে তোমাকে বেছে গুছে তোমার প্রাণ বাঁচাবার উপকরণ পছন্দ ক'রে নিতে হ'য়েছে। প্রকাণ্ড জগতের সঙ্গে বয়সে তোমার যতই সম্বন্ধ বেড়েছে, ততই তোমার ওপর বাছবার ভারও বেড়েছে। এখন তুমি দু পাঁচটা খাবার জিনিষ জাননা, অগুণতি খাবার তোমার এখন জানা হ'য়েছে। কোনটা তোমার প্রাণে সবে, কোনটা খেলে তুমি ঠিক বাঁচতে পারবে, এটা তোমাকে ভেবে চিন্তে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুঝে নিতে হয়। এই রকম তোমার সকল দিকেই। শরীরটা ঠিক রেখে যেতে হ'লে, যত যত রকমের যত যত জিনিষের দরকার, তা এখন তোমার জানবার সুযোগও খুব হ'য়েছে, জানছও খুব বেশী, শুনছও খুব বেশী। এখন বুঝে সেগুলা ঠিক মত ব্যবহার করবার ভার তোমারই ওপর। তোমার প্রাণ বাঁচাবার যত উপায় তুমি জানতে পারছ, ততই তোমার জ্ঞান বাড়ছে, জানবার শক্তি বাড়ছে ব'লব। আমার প্রাণ, তোমার প্রাণ, সকলের প্রাণের সঙ্গে, সকলের প্রাণ বাঁচাবার পক্ষে, সারা জগতের জিনিষগুলা, সারা জগতের যা কিছু সব, কি রকমে খাপ খায়, এইটা বোঝাই, এইটা সমজানই, তোমার জানা। নানা রকমে ভাগ করে, মানুষ এই জানবার কথাটারই পরিচয় দেয়। মানুষের বিজ্ঞানগুলার এই জন্যেই প্রচার। ইচ্ছা ক'রলেই, যারা জানে তাদের আশ্রয় নিলেই, তুমি এ সব আয়ত্ত ক'রতে পার, নিজের ক'রে নিতে পার, নিজের জানা ব'লে পরিচয় দিতে পার।

তুমি হয়ত মনে মনে ভাবছ মানুষের না হয় জানবার, প্রাণ বাঁচাবার উপায় জানবার, এই রকম সব ব্যবস্থা আছে, ছোট ছোট জীব জন্তুর উপায় কি ? আরে ভাই, যে তাকে ছোট করেছে, সে তার ভাবনা ভেবেই ক'রেছে। ছোট কেউ অমনি হয়নি। সবই ছিল 'মানুষ। মানুষ থেকে যেমন কর্ম্ম ক'রেছে, যেমন ভাবে জীবন কাটিয়েছে, তেমনি ভাবে থাকবার জন্যেই, তেমনি দেহ পেয়েছে, তেমনি জন্ম পেয়েছে। এ ব্যবস্থা করবার যে আছে, বুঝে সুঝেই সব ক'রেছে। পূরোপূরি বোঝবার শক্তি নিজের দোষে হারিয়েছে বলেই ছোট ছোট হয়েছে, কিন্তু তার প্রাণের যতটুকু দাম, তার প্রাণ কর্ম্মভোগ করবার জন্যে যে রকম ভাবে যতটুকু থাকবে, সে রকমের জানবার উপায় তার অতি ছোট জানবার শক্তিটুকুর মধ্যেও ঠিক আছে। পাকে প'ড়ে এখন সে নিজে বড় জেনে শুনে নিয়ে চ'লতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাণটা রাখতে হবে, এই জ্ঞানটার সঙ্গে, তার শক্তির মধ্যে যতটুকু হ'তে পারে, ততটুকু অমনি অমনি আপনা আপনিই বুঝে যে কোন রকমে তার জীবনটা চালিয়ে যায়। যেখানে জীব সেখানেই জ্ঞান, কমই হোক আর বেশীই হোক। জ্ঞান মানেই প্রাণ বাঁচাবার জ্ঞান। প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ। সংসারে পঞ্চভূতের বাসায় বাসায় প্রাণ যতদিন ঘুরবে, ততদিন সেই সেই বাসাগুলা, সেই সেই দেহগুলা, বজায় রাখবার উপায়গুলা-কেই সবাই প্রাণ রাখবার উপায় বলে ঠিক করে, আর সেই জানাকেই জ্ঞান সঞ্চয় করা বলে ধ'রে নেয়।

আসল কথা কিন্তু ভাই সংসারের জ্ঞানটা যখন বাহিরের দেহ বজায় রাখবার জ্ঞান, তখন সেটা খাঁটি জ্ঞান বলা যায় না। দেহটা আমার সঙ্গে জ'ড়িয়েছে বটে, কিন্তু যখন 'আমার' তখন সেটা ত 'আমি' নই। যারা ঠিক জ্ঞানী হ'তে চায়, তারা তাই দেহের সম্পর্কে এই জগতের জ্ঞানটাকে আমার ব'লেই মনে করে, করবারই কথা। খাঁটি প্রাণটা যখন দেহ ছাড়া, তখন সেই খাঁটি প্রাণটার খবর নেওয়াই খাঁটি জানা। সেই খাঁটি প্রাণ যেখানে আছে, যেমন ভাবে আছে সেইটা

বোঝাই বোঝা। সেই জ্ঞানই জ্ঞান, আর বাহিরের জ্ঞান, জগতের জ্ঞানটা, একটু বিকৃত জ্ঞান। এই বিকৃত জ্ঞানটা, পঞ্চভূতের সম্পর্কে জ্ঞানটা, তাই বিজ্ঞান। প্রাণ যখন নিজে খাঁটি থাকে তখন তার সেই অবস্থাকে খোলা প্রাণ, মুক্ত প্রাণ, ব'লতে পার। আর যখন তাকে ভূতে ধরে, ভূতের বাঁধনে সে বাঁধা পড়ে, পরের তৈয়ারি বাসাকে, দেহকে, আপন ব'লে পরিচয় দেয়, তখন তাকে কয়েদী প্রাণ, বদ্ধপ্রাণ, ব'ললে দোষ হবে না। সেইরকম, জ্ঞান যখন খাঁটি প্রাণে, তখন 'শুদ্ধ, মুক্ত', আর যখন ভূতের বাসায়, তখন 'দূষিত, বদ্ধ'। যারা ঠিক আমাকেই আমি ব'লে বোঝে, যারা পরমহংস, * তারা জ্ঞানেরই খোঁজে আছে, আর তুমি আমি সব মানুষই প্রায় ঐ বিজ্ঞানের প্রসারটা বাড়াবার জন্যেই আছি। ফল জানতে সবাই চায়, না চেয়েই পারে না।

ঠিক বাঁচতে পারলেই, বাঁচবার উপায় জানতে পারলেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয়। প্রাণ যেন নিজেকে নিজে ভাল ক'রে জাহির ক'রতে পারে, প্রাণের যেন বাহার খোলে। প্রাণ তখন নিজেকে নিজে সুস্থির দেখে খুসী হয়, নিজের গৌরবে তখন নিজেই ধন্য মনে করে। প্রাণের এই উচ্ছ্বাসটাই প্রাণের উল্লাস, প্রাণের আনন্দ, প্রাণের সুখ। বাঁচবার সঙ্গে এ আনন্দটা প্রাণের থাকেই থাকে। বেঁচেই সবাই সুখী, জেনেই সবাই সুখী। বাঁচবার পূরা অভাব কখন হয় না, জানবার পূরা অভাব কখনও হয় না, তাই আনন্দের পূরা অভাবটাও জীবের কখনও হয় না। যেখানে জীবন, সেখানেই চেতনা, আবার সেইখানেই আনন্দ। তবে ধারার ইতর বিশেষ অবশ্যই আছে। জীবন যেখানে এক রকম স্থির, জ্ঞান সেখানে ঠিক সেই জীবনের উপায় দেখিয়ে দিয়ে যাবে, আনন্দ

* 'হংস' শব্দটি সংস্কৃতে 'সোহং, সোহং, সোহং সোহম্' এইরূপ ভাবনা হইতে 'হংসো, হংসো, হংসো' এইরূপ ভাবে দাঁড়ায়। এমনি মরা মরা মরা হইতে রাম রাম ধরিবার গল্প কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে।

সেখানে মোটামুটি স্থায়ী আছে। একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই, সব ধারাতেই এদিক্ ওদিক্ হয়। তা হ'লেও 'সতের' সঙ্গে, 'চিতের সঙ্গে 'আনন্দের' একবারে অভাব হয় না। সতেরও পূরা লোপ নেই, চিতেরও নেই, আনন্দেরও নেই।

(৩)

সুখের খোঁজ

যে যতক্ষণ বেঁচে থাকে, জ্ঞানও তার ততক্ষণ থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ বেঁচে থাকার অবস্থায়, ঐ জ্ঞান থাকার অবস্থায়, কোন রকমে জীবনের একটা স্ফূর্ত্তির, জ্ঞানের একটা স্ফূর্ত্তির পরিচয়ে আনন্দও একটা ভোগ করে। বাঁচাই সুখ, জানাই সুখ।

দেখ, ঐ একটা মুটে মাথায় এক মস্ত মোট নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে এইভাবে, যেখানে যেতে হবে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে, পয়সা রোজকারের জন্যে যেখানে যেতে হবে, সেইখানে ছুটেছে। সেখানে যখন মুটে পৌঁছাল, মোটটা ফেল্‌লে, তখন আঃ বাঁচা গেল বলে হাঁপ ছাড়লে, আর তাতেই সে বাঁচলাম ভেবেই একটু সুখ পেলে। মোটের ভারটা এতক্ষণ তার প্রাণটা পেষণ ক'রছিল, প্রাণটা যেন দেহ থেকে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু মোটটা নামিয়ে ধড়ে তার প্রাণটা এল, প্রাণটা স্থির হ'ল, আর সেইটেতেই তার প্রাণের স্ফূর্ত্তি হ'ল, সুখের আস্বাদটা তখন সে একটু পেয়েছে ব'লেই বুঝতে পারলে। খাটা খাটুনির পর প্রাণের স্ফূর্ত্তিতে এই রকম আনন্দের ধারা কত রকমেই এই 'কর্ম্মভূমিতে' প্রকাশ পায়। অনেক সময়ে তাতে কতই বাড়াবাড়িও এসে দাঁড়ায়। যাক সে কথা। এখন প্রাণের কোন রকম চাপটা স'রে গেলেই প্রাণে যে একটা বাঁচলাম ব'লে আনন্দ আসে এটা বেশ বোঝা গেল।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন, প্রাণযাত্রায় কাজের গতিকে প'ড়ে কি দৈবের গতিকে প'ড়ে, বাড়ীতে আটক প'ড়ে, কাজের কাজ ক'রতে না পেয়ে, যে কাজে জীবন চ'লবে তা থেকে কোনরকমে বঞ্চিত হ'য়ে, মানুষ যেন ম'রে থাকে ; আবার কাজ জুটলেই, কাজে লাগতে পারলেই, বাঁচা গেল ব'লে মানুষের মনে কত না আনন্দই আসে ! তা হ'লে প্রাণ আপনাতে আপনি স্থির হ'লেও আনন্দ পায়, আর নিজের 'কাজে'ও নিজের স্ফূর্ত্তি বুঝতে পারে।

একটা গুরু গম্ভীর বিষয় শিখবার জন্যে, জানবার জন্যে, তাতে মনটা লাগিয়ে রেখে, মনে মনে ক্লান্ত হয়ে প'ড়ে, শেষে তার একটা হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে, মনটা তা থেকে স'রিয়ে নিতে পারলে, বাঁচা গেল ব'লে মনে কতকটা আরাম পাওয়া যায়। জানবার চাপাচাপিটে গেল ব'লে তখন প্রাণের চেতনাশক্তিটে যেন সুস্থির হয়ে, প্রাণের স্ফূর্ত্তি টের পায়। পরীক্ষার পর মুখস্থের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সকল ছাত্রই প্রাণে প্রাণ পায়, পরে যা হয় হোক, মাথাটাকে খালি ক'রে, নিজের চৈতন্য বৃত্তিটেকে বিশ্রাম দিয়ে, বেশ সুখ অনুভব করে। কাজের চাপের মত জানবার চাপ স'রে গেলেও সুস্থির চৈতন্যের আনন্দ এই রকমে কত দিক্ দিয়েই দেখা যায়।

আবার ওই দেখ, মা জীবনযাত্রার উপায় হবে ভেবে ছেলেটিকে বিদেশে চাকরীর জন্যে পাঠিয়েছে, কয়দিন তার খবর না আসায় মার প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে, আজ বৈকালে ডাকপিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেল, ছেলের একটু অসুখ হ'য়েছিল, এখন সেরেছে, এই খবর তাতে আছে, তাই প'ড়ে, খবর জেনে, বাঁচলুম ব'লে মার মনে বেশ আনন্দ হ'ল। কেন হ'ল ? যা জানতে চায়, যা জানলে বাঁচতে পারে, তাই জেনে প্রাণে প্রাণ পেয়ে, তার প্রাণে সেই সুখটুকু উঠল। এই রকম প্রাণ যা জানতে চায়, যা জানলে বাঁচব ব'লে ভাবে,সেই জানাতেই প্রাণের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের সুখ।

মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, খুব ঘুমিয়ে বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক

এক রকম তুলে দেয়, তার কাজের ইন্দ্রিয়গুলা ঢিল প'ড়ে যায়, তার জানবার ইন্দ্রিয়গুলাও নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে, দেখবার জন্য বাহিরের বিষয় জানবার জন্য, ভাববার জন্য, তার মন আর বাহিরের দিকে মুখ বাড়িয়ে থাকেনা, তখন মানুষের সেই 'অঘোর' ঘুমে মানুষের কতটা বিশ্রাম সুখ! করার শক্তি, জানার শক্তি, এইরকমে অসাড় হ'য়ে প'ড়লে, তারা প্রাণের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়, প্রাণকে তখন উদ্ব্যস্ত হ'তে হয় না, নিজেতে নিজে থেকে আপনাতেই আপনার জানবার শক্তি, করবার শক্তি, গুটিয়ে রেখে, বেঁচেছি ব'লে নিজেকে বুঝে, নিজেকে খাড়া রেখে, প্রাণ 'স্থির সুখ' ভোগ ক'রতে থাকে। ধ্যানে, যোগে, যোগীরা অনেকটা এইরকমের বাঁচাতেই, অনেকটা এইরকমের জানাতেই, 'স্থির সুখ' টের পায়।

ফল, যে কোনও রকমে 'বেঁচেছি' বুঝলেই, কাজে না কাজে, জানায় ভোলায়, প্রাণ নিজের অস্তিত্বের নিজের চৈতন্যের খোঁজ পেলেই, 'আছি' 'বুঝছি,' এটা ঠাওর করতে পারলেই, আনন্দ পাবেই পাবে। এ ভাবটা প্রাণের যাবারও নয়। অতি বড় ব্যাধিতে যন্ত্রণায় শরীর অবশ হ'য়ে প'ড়েছে, ঘন ঘন মূর্চ্ছা হ'চ্ছে, কিছুই করবার শক্তি নেই, জানবার শক্তি নেই বল্লেই হয়, তেমন অবস্থাতেও 'আছি জেনেই' মানুষের একটু সুখ। ডাক্তার কবিরাজের কথায় যখনি রোগী বুঝছে যে বাঁচতে পারবে, 'আছি' বোঝবার শক্তিটা যাবে না, তখন তার মধ্যেও প্রাণটা তার স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে। তবেই যতক্ষণ থাকে ব'লে মানুষ বোঝে, ততক্ষণই এই আনন্দটা তার জীবনকে জ'ড়িয়ে থাকে। যখনই মানুষ কিছু ক'রতে চায়, জানতে চায়, এ আনন্দটার, জীবনের যাতনার সঙ্গে জড়ান ঐ সুখটার, ভালরকম উচ্ছ্বাস ভোগ করবার জন্যেই চায়, এটা স্থির। বাঁচবার মতন বাঁচতে হবে, জানবার মত জানতে হবে, আনন্দের মত আনন্দ পেতে হবে, এই ভাব নিয়েই 'জীবনযাত্রা'। শুধু এ জীবন নয়, সারা জীবনটা, পরের, পরের পরের, সব জীবনটা জুড়েই, এই ভাবটা সবাই বজায় রাখতে চায়। সুখের খোঁজ প্রাণের বাঁচবার ইচ্ছার,

জানবার ইচ্ছার, সঙ্গে সঙ্গে না থেকেই পারে না। যে কেউ দেখবে বাঁচতে চাচ্ছে, বাঁচবার উপায় জানবার খবর পেতে চাচ্ছে—আর সবাই তাই চাচ্ছে—তারা সবাই প্রাণের সুখটা প্রাণে প্রাণে পাবার জন্যে চাচ্ছে।

বেঁচে থাকলেই যখন সুখ, জানতে পারলেই যখন সুখ, তখন সুখের আর খোঁজ কেন ? বেঁচে ত থাকতেই হবে, জানতে ত হবেই হবে, না বেঁচে না জেনে ত থাকবার জো নেই। সুখ ত তা হ'লে আপনা থেকেই আছে। যা আছে তা আবার কে খোঁজে, যে খোঁজে সেত বড়ই বোকা। এ ধাঁধা আপনিই মনে ওঠে বটে। কিন্তু আসল কথাটা বুঝলে ধাঁধাটা স'রে যাবে। কথা এই, জিনিষ আমার থাকলেই আমার হয় না। আমার আছে ব'লে জানা চাই। বাঁচার সঙ্গে, জানার সঙ্গে, সুখ আছে ব'লেই সুখ ভোগে লাগেনা। সুখ আছে ব'লে বুঝার দরকার। চিনতে না পারলে আপনার জিনিষও পর হয়। চিনিয়ে না দিলে তার উপর মমতা হয় না। মমতা না হ'লে প্রাণ তাকে কোল দেয় না। কাজেই সে থেকেও থাকেনা। কাছে থাকলেই আপনার হয় না। প্রাণটা অনুভব ক'রে, জ্ঞানটা অনুভব ক'রে, খাঁটি সুখ যে পাই, এটা সহজে মানুষ বুঝতে পারে না, বুঝতে চায়ও না। বাঁচবার তাড়ার সঙ্গে, জানবার তাড়ার সঙ্গে, সুখের তাড়াটাও প্রাণে আপনি জেগে ওঠে, কিন্তু সংসার জুড়ে এমনি মোহ, যে প্রাণের ঘরের ভিতর তার খোঁজ না নিয়ে, বাইরে মানুষ সুখ সুখ ক'রে খুঁজে মরে, ঘুরে মরে। এই রকমে, কেমন ক'রে বাঁচব কেমন ক'রে বাঁচব ব'লেও মানুষ ছুটাছুটি ক'রে মরে, কিন্তু প্রাণের ভিতরেই যে তার জীয়নকাটি লুকান আছে, সেটা সমজাতে পারেনা। বাঁচবার জন্য এটা কি, ওটা কি, সেটা কি ব'লে চারিদিকে মানুষ খবর নিয়ে বেড়ায়, কোন্‌টা কি রকমে জানতে পারলে প্রাণ সুস্থির হবে ব'লে ভেবে ভেবে অস্থির হয়, অথচ প্রাণ যে সুস্থিরই আছে, প্রাণের কাছে গিয়ে সেই সার খবরটা নিতেই ভুলে যায়। যাই হোক; ঘুরেই মরুক আর হাঁপিয়েই

বেড়াক, প্রাণের ঝোঁক যে সুখের দিকেই এটা বুঝতে কখনও কারও বাকি থাকেনা।

সুখ সুখ করে প্রাণ খুঁজে বেড়ায় বটে, কিন্তু বেড়িয়ে সুখ ত কখনই পেয়েছি ব'লে মনে ক'রতে পারেনা, সুতরাং প্রাণের সুখের খোঁজ না করাই ভাল। যতই কর, যতই ভাব, যে কাজেই হাত দাও, যে তত্ত্বই বুঝ, সুখ কিছুতেই নেই। ক'রতে ভাবতে প্রাণ উদ্ব্যস্তই হয়, সুখ তাতে হবে কিসে? কেউ কখন কোনও কাজ ক'রে, কোনও ভাবনা নিয়ে, সুখী হয়েছে শুনেছ কি? খাটতে খাটতে যার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে তার সুখ কোথায়? ভাবতে ভাবতে মাথা ঘুরে প'ড়ছে, তাতে তখন আনন্দ কিসে? এই রকমে সুখ কোথাও নেই বলে, সুখকে একবারে উড়িয়ে দিতে অনেকেই চায়। কিন্তু, ভাই, ক'রে ভেবে যদি সুখ না থাকে ত মানুষ ক'রতে ভাবতে চায় কেন? একবার ঠ'কে সতর্ক হয় না কেন? তবেই বুঝতে হবে, করায় ভাবায় সুখ আছেই আছে, পূরা মাত্রায় না থাক কিছু আছে। তাই মানুষ সেটা ছাড়তে পারে না, ছাড়তে চায় না। সুখ না পেলে কেউ কখনও কিছুতে লেগে থাকে কি? প্রাণে যেটা মিশ খায় না, প্রাণ সেটা ত আপনা হ'তেই ঝেড়ে ফেলে দেবে। প্রাণকে কি সেটা শিখিয়ে দিতে হবে? আসল কথা এই, ক'রে ভেবে প্রাণ বাঁচে, আর সঙ্গে সঙ্গে সুখ প্রাণে প্রাণে টের পায়, কিন্তু মোহে প'ড়ে বুঝে উঠতে পারে না যে ক'রেই বেঁচে আছে, ভেবেই বেঁচে আছে, আর ক'রে ভেবেই সুখে আছে।

অনেকেই এখনই বলবেন, আর ভাই, তোমার মনেও কথাটা বেশ লাগবে, যে বেমালুম ভাবে সুখ একটা কাজের সঙ্গে, ভাবনার সঙ্গে থাকে থাক, উল্টটাও যে আছে, দুঃখটাও যে সঙ্গে সঙ্গে আছে, আর থেকে হাড়ে হাড়ে বেঁধে, এটাত না মেনে পারা যায় না। কথাটা শুনলে ঠিকই বোধ হয় বটে, কিন্তু ভেবে দেখলে কথাটায় সার নেই। আগেই ত ব'লেছি ভাই, সুখ থাকলেও সুখকে না চিনতে পারলেই বিড়ম্বনা বটে। সুখ খুঁজতে বেরিয়ে ভাবলাম চিন্তালাম, খাটলাম খুটলাম,

কিন্তু সুখ যে পেলাম সেটা মালুম ক'রতে পারলাম না, না পেয়ে ঠিক ক'রলাম সুখ পেলামই না, তখন খাটুনিটে আর ভাবনাটা ভেবে প্রাণে স্থির হ'তে পারলাম না, আর সেই ভাবে বুঝলাম খাটুনিতে আর ভাবনায় দুঃখই সার হ'ল, সুখ হ'ল না। উল্টাটা ভেবেই উল্টা দাড়াল, ঠিক যেটা সেটা কিন্তু ঠিকই ছিল। দুঃখও প্রাণের জিনিষ নয়, মরণও প্রাণের জিনিষ নয়, মোহও প্রাণের জিনিষ নয়। প্রাণ নিজে সদাই সুখী, জীয়ন্ত আর সজাগ। কিন্তু তবুও প্রাণ কষ্টে পড়ে, মরে, আর বেহুঁস হয়। হয় ভুলে। এ ভুল জগৎ জুড়ে, সমস্ত প্রাণ জুড়ে।

এইবার বেশ বুঝছি, আমার দুই গালে সজোরে দু'ঘা দিয়ে তুমি আমাকে বোঝাবে দুঃখ আছে কিনা? বাস্তবিকই এটা বড় বিষম কথা যে জগতে দুঃখ নেই। যতই যে বুঝাগ না কেন, এমন কথায় কেউ কাণ দেবেনা। জগতে দুঃখের বার্ত্তা, শোকের বার্ত্তা, সকল সময়ে, সব জায়গায়। এই জন্যে মুনিঋষিরা সবাই ব'লে গেছেন, আর বুঝদার মানুষমাত্রই ব'লবে, দুঃখের জ্বালা শোকের জ্বালা যদি এড়াতে চাও, ত জগৎ ছেড়ে, কাজ কর্ম্ম ছেড়ে, কাজের ভাবনা ছেড়ে, যেখানে জনমানবের সমাগম নেই, সেইখানে গিয়ে সুখে শান্তিতে থাক। বেদ ছাড়া, কোরাণ ছাড়া, এ এক অদ্ভুত কথা, যে বেমালুমভাবে সবাই জগতে সুখেই আছে, দুঃখের কথাটি নেই।

রাগ ক'রনা ভাই, কথাটা যা বলেছি সেটা যতটা অসার ভাবছ, ততটা অসার হয় ত নয়। বিপদ্ আপদ্, দুঃখ শোক জগতে নেই একথা ব'ললে পাগলের মতন প্রলাপ বকা হ'ল সেটা ঠিক। কিন্তু ভাই, বল দেখি প্রাণের বিপদ্ আপদ্‌টাই কি? আর তাতে দুঃখ শোকটাই বা কি?

কাজে কর্ম্মে, বেঁচে থাকতে হবে ব'লে নানারকম জানা শুনায়, সংসারের সঙ্গে মস্ত একটা সম্পর্ক তুমি ভাই পাতিয়ে ফেলেছ। শুধু তুমিই টুকু তোমার নিজের নয়, তোমার ব'লতে সংসারের অনেকটা তোমায় ঘিরে ব'সেছে। প্রাণটা তোমাকে তোমার নিজের গণ্ডির মধ্যে

আটকে না রেখে, সারা জগ টার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে, আর সেই জগতে যার সঙ্গে একটু না একটু সম্বন্ধ ঘ'টছে তাকেই প্রাণ নিজের ব'লে কোলে তুলে নিচ্চে। এই রকমে তোমার মহাপ্রাণটা যতই নিজের প্রসার বাড়ায়, ততই যেন নিজেই বড় হ'য়ে পড়ে। বড় হ'ক ভাল কথা, তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু ঘা খেলেই বিপদ্। এই বড় আয়তনটার কোনখানে একটু বাঁধন ছিঁড়লেই তুমি প্রমাদ গ'ণ। তোমার ঘর, তোমার বাড়ী, তোমার গ্রাম, তোমার নগর, তোমার দেশ, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার আত্মীয়, তোমার কুটুম্ব, তোমার বন্ধু, তোমার জানা শুনা পরিচিত যে কেউ, যাদের নিয়ে তুমি মস্ত সংসারী, তাদের কারু তোমার সঙ্গে সম্বন্ধের ছেদ ভেদ হ'লেই তোমার প্রাণ, তোমার বড় প্রাণটা, অস্থির হ'য়ে পড়ে। ঘর ভেঙ্গে গেল, তার মাল মসলা যা কিছু নিজের ভাবে মিশে গেল, মাটী মাটীতেই গেল, পাঁচ ভূত ছাড়া পেয়ে খোলা প্রাণে বড় বড় ভূতের সঙ্গ নিলে, তুমি কিন্তু তোমার ঘরখানা গেল বলে, তোমার সঙ্গে ঐ পাঁচ ভূতের যে সম্বন্ধটা পাতান হ'য়েছিল, সেই বাঁধনটা খুলে গেল ব'লে, আকুল হ'য়ে প'ড়লে। যে যার সে তার সঙ্গে গেল, তোমার ভুল বোঝার দরুণ প্রাণের ঐ ভুল বাঁধনে যে আয়তনটা বেড়ে ছিল সেটা ছোট হ'ল ব'লে, প্রাণটা গুটিয়ে এল বলে, প্রাণের ঐ ভুল স্ফূর্ত্তিটে আর রইল না, আর তার অভাবেই তুমি 'দুঃখিত' হ'লে। দুঃখটা কিন্তু তোমার নিজের তৈয়ারী করা জিনিষ, প্রাণ থেকে ওঠেনি, নিজেই প্রাণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। দৈব ঘটনায় তোমার এই রকম যা কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হ'ল ব'লে মনে কর, তারা কেউ বিপদ্‌গ্রস্ত হয় নি, তাদের মধ্যে যে যেখানকার, সে সেই খানে ভিড়েছে বা ভিড়ছে, তুমি মাঝে থেকে আমার গেল আমার গেল ব'লে, মিছামিছি প্রাণ ছোট হ'ল ভেবে, সেই ভাবনাতে দুঃখের ছায়া দেখ। কিন্তু ভাই, তোমার প্রাণ কিছুই ছোট হয়নি। প্রাণ ছোট হ'তে জানে না, ছোট কখনই হয় না। তুমি যেটা প্রাণের বাড় ভেবে-ছিলে, সেটা তোমার প্রাণের বাড় নয়, আর কতকগুলা প্রাণ তোমার

প্রাণের দেহে চাপিয়ে, সেগুলাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে, নিজে বড় সেজে ব'সেছিলে মাত্র। সেগুলার যে গতিই হোক না, তোমার সত্যি সত্যি কিছুই যায় আসে না। যায় আসে ভাবনাটার ভুল ভাবনায়, সেটাই তোমার দুঃখ শোক বিপদ্ আপদ্। তোমার মমতাটা ভুল বুঝার উপর জ'ন্মেছিল, কষ্টটা তাতেই পাও। ফল প্রাণে তোমার প্রাণ ঠিক আছে, আর সেই সার কথাটা বুঝলে, তোমার প্রাণের নিজের স্ফূর্ত্তি, নিজের আনন্দ, তোমার কখনই ঘুচবে না, ঘুচতে পারেনা।

এখনি তুমি ব'লবে, আর বলবার কারণও তোমার বেশ আছে, যে তাই যদি হ'ল তবেত প্রাণ কাজকর্ম্ম যত না ক'র্বে, জান্‌তে শুন্‌তে যত না চাবে, ততই সুখী হবে, আর কাজে কর্ম্মে নিজেকে লাগালে, জান্‌তে শুন্‌তে খুব ধড়ফড় ক'ল্লেই ত দেখছি কষ্টে প'ড়বে। প্রাণ নিজের বাঁচার পরিচয় দিতে গিয়ে ম'রবে, সুখের পরিচয় পেতে গিয়ে দুঃখে প'ড়বে, এ যে বড়ই বিপরীত হয়ে দাঁড়াল। প্রাণ বাঁচতেও চাবে সুতরাং কাজ ক'র্ত্তেও চাবে, জানতেও ব্যস্ত হবে। তা হ'লে যে বাঁচনেই তার সুখ ব'লে বুঝান হ'য়েছে, সে বাঁচনে সুখ না হ'য়ে দুঃখই ত হ'য়ে প'ড়ছে, একথা কি ক'রে না ব'লে থাকতে পারা যায়।

না ভাই, ফের তুমি মিছে একটা গোল পাকাচ্চ। প্রাণ নিজেকে খুব চারদিকে ছ'ড়িয়ে দিক, জাহির করুক, আর প্রাণ প্রাণ থাকলে সেটা ক'র্বেবই ক'র্বে্ব, এ কথায় ত কেউ অন্য কথা ব'লবে না। আপনার সেই পসারে প্রাণের যদি স্ফূর্ত্তির অনুভব না হ'ত, তাহ'লে প্রাণ তার জন্য লালায়িত হবেই বা কেন, খাটতেই বা যাবে কেন? তাতে প্রাণের আনন্দ ঠিকই আছে। কিন্তু এ পসারের সঙ্গে, চারিদিকে সকলের সঙ্গে মেলা মেশার সঙ্গে, তোমার যেন ভুল ধারণাটা না হয়, যে ওরা তোমার, আর তুমি ওদের নিয়েই বড়। এ ধারণাটাতেই বিপদ্। যখন যার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'চ্চে তখন সে তোমার হয় হোক, কিন্তু জেন যে কোনও আলাপ পরিচয় তোমার চিরকালের জন্য নয়, তুমি সারা ব্রহ্মাণ্ডটার সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাবার অধিকার রাখ। তোমার এত বড়

কুটুম্বের মণ্ডল থাকতে তোমার কাছথেকে দু' দশটা এদিকে ওদিকে ছ'ড়িয়ে প'ড়লে তোমার ব্যাকুল হবার মতন ত কিছুই হয় না। জগতের প্রাণ নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে নিজে ঠিকটি হ'য়ে বসবার জন্যে, নানা রকমে নিজেকে ওল্টাচ্চে পাল্টাচ্চে,তোমার তাতে কি যায় আসে ? তোমার গণ্ডির মধ্যে যে দল যখন ঢুকল, তাদের নিয়েই তুমি প্রাণের স্ফূর্ত্তি অনুভব কর, আবার সে দল যদি চ'লে যায়, আবার একদল আসবে, আসবেই আসবে, এসে তোমার প্রাণের আসরে নামবে, তাদের নিয়েই তখন আনন্দ কর, তাদের সঙ্গে প্রাণের মিল মিশ কর, ক'রে ঠিক সুখ পাবে। এক হিসাবে সবই তোমার, আবার অন্য হিসাবে তোমার কিছুই নয়। যখন যে আয়তন পাও, তাতেই তখন তোমার প্রাণের ঠিক স্ফূর্ত্তি আছে। সেটা ভুলে, যেটা গেছে সেটা তখন তোমার ভেবে মর কেন? সুখ তোমার সকল অবস্থাতেই আছে,তুমি সেটা না ত'লিয়ে বুঝে, তোমার যা ছিল তা নেই ভেবে মিছে দুঃখ টেনে আন। তোমার যে ছিল সে ছাড়া পেয়ে তোমার বাড়ী থেকে এখন অন্য জায়গায় গেছে, যাক না কেন ? তোমার সঙ্গে তার এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গেছে গেছেই। দূরে থাকলেও আপনার যে সে আপনারই। সমস্ত জগৎ জুড়ে তোমার এমনি সবই আপনার। সবাইকের সঙ্গেই একে একে আলাপ ক'র্ত্তে ত হবে, পরিচয় ঝালিয়ে নিতে হবে। তোমার পর কেউ নেই।

এই কথাটা ভাল ক'রে যদি বুঝতে পার ত দেখবে যেটায় তুমি বিপদ্ ব'লে ভাবছ, দুঃখের কারণ ব'লে ঠাওর ক'রছ,সেইটাতেই তোমার নূতন সুখের আভাস আস্‌ছে। তোমার প্রাণ খালি থাকবে না। যে যেখানে যায় যাক, পুরাণ বন্ধু গেলে, প্রাণ নূতন বন্ধু জুটিয়ে নেবেই নেবে। আপনার ব'লে যখন সে ব্রহ্মাণ্ডটাকে নিতে পারে, তখন তার বন্ধুর,আপনার জনের, অভাব কি কখনও হয় ? সকল অবস্থাতেই প্রাণ আপনার পাবে, পেয়ে নিজের স্ফূর্ত্তি ঠিক বজায় রাখবে। অতীতের মিছে শোক প্রাণ ছেড়ে দেবে, সুখ কখনই প্রাণ ছাড়া হবে না, হবার উপায় নেই। বিপদ আপদ শোক দুঃখের পসরা মাথায় ক'রে তাই সকল প্রাণই নূতন

সুখের সম্বন্ধে পরিচয় পাবার জন্যে সকল সময়েই চলেছে। যতই ঘটুক, যাই হ'ক, সবাইকে বাঁচতে হবে, আনন্দও পেতে হবে। সুখ চাই, আনন্দ চাই, স্ফূর্ত্তি চাই, এ ভাবটা কখনও ঘুচতে পারে না।

এতক্ষণে ত বুঝলে ভাই, সুখের টান প্রাণেরই টান। যেখানে প্রাণ মিলবে সেইখানেই সুখও মিলবে। প্রাণ দেখলেই তোমার প্রাণ উল্‌সে উঠবে। খাঁটি আপনার পেলে কার না স্ফূর্ত্তি হয়? যে যার সে তার সঙ্গেই ঠিক মিশ খায়, অপরের সঙ্গে খায় না। প্রাণ প্রাণের সঙ্গেই মিশ খাবে, অপরের সঙ্গে খাবে কেন? সারা জগৎ ঘুরে দেখ প্রাণ প্রাণই খুঁজছে, সুখের জন্য। যেখানে প্রাণ আছে ব'লে মনে ক'রছে, প্রাণ সেই দিকেই ছুটছে, আপনার টানেই ছুটছে, এ আর কাকুইকে ব'লে দিতে হয় না, শিখিয়ে দিতে হয় না। চোকের পেছুন থেকে, চোকের প্রাণের টানে বেড়িয়ে যখন প্রাণ আপনার খুঁজছে তখন খুব যেটা ভাল রূপ সেইটা দেখবার জন্যেই লালায়িত হ'য়ে পড়ে। চোকের প্রাণ প্রাণ পায় রূপে, তাই সে তখন খোঁজে রূপই, রূপের যা সেরা তাইই, অন্য কিছু নয়। যেখানে সেটা পায় সেখানে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করে, ক'রে সুখ ভোগ করে। এই রকম নাকের প্রাণ ভাল গন্ধ পেয়ে, জিবের প্রাণ ভাল সোয়াদ পেয়ে, কাণের প্রাণ ভাল শব্দ পেয়ে, আর চামড়ার প্রাণ ভাল ছুঁয়ে, প্রাণের নাগাল পায়, পেয়ে আরাম পায়। মনের প্রাণ মনের মিল পেয়ে যেন নূতন প্রাণ পায়, আর উল্‌সে ওঠে। ফল দেহের সব জানালা খুলে দিয়েই প্রাণ তাকিয়ে তাকিয়ে এই রকমে আপনার জনের খোঁজ কর, দেখতে পেলেই ছুটে যায়, গিয়ে তাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে আপনা আপনি আনন্দে ফুল্‌তে থাকে। তোমার প্রাণের সঙ্গে জগতের কোথাও কারও প্রাণ যদি এইরকমে ঠিক মিশ খাবার মতন হয় তাহ'লে সেটায় তোমার প্রাণের সুখের টান ঠিক বজায় থাকে। যদি চিরকাল মিশ না খায় ত যতক্ষণ খায় ততক্ষণই সেখানে সুখের টান, পরে আর নয়। জগতের কিন্তু ভাই কোন প্রাণই একভাবে থাকে না। তার বাইরের দেহ কেবলই বদলায়। তাই

জগতের কোনও প্রাণের সঙ্গে তোমার সুখের সম্বন্ধও বেশী ক্ষণ থাকে না। যে রূপ আজ বড় মধুর, সে রূপ, প্রাণের সেই পূরন্ত রূপ, সে প্রাণের সঙ্গে বেশী দিন বা বেশী ক্ষণ দেখতে পাবে না। ফুটন্ত গোলাপ চিরকাল তার ফুটন্ত রূপ দেখাবে না। তার প্রাণ ঠিক যেন নিজেকে ফোটাতে না পেরে আবার নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সে রূপ শুকিয়ে যায়। তোমার চোখে প্রাণ আর কাজেই রূপের সুখ পায় না। সারা বিশ্বে এই রকম প্রাণের বাহিরের পরিচয় কেবলই ফিরছে। বাহিরের কোনটার সঙ্গেই তাই প্রাণের সুখের বাঁধন চিরকাল অটুট থাকতে পারে না। যদি কোথাও প্রাণের ফুটন্ত পরিচয় চিরকালই ফুটন্ত থাকে তবে সেইখানেই, সেই প্রাণের সঙ্গেই, সম্বন্ধ হ'লে সে সম্বন্ধ আর ঘুচে যায় না। সংসারে তার আশা নেই। নাই থাক, তবু প্রাণ প্রাণের খোঁজ না ক'রে থাকতে পারবে না, সুখের খোঁজ না নিয়ে চুপ ক'রে থাকবে না। ভাল খাব, ভাল দেখব, ভাল শুনব এর চেষ্টা বাঁচনের সঙ্গে থাকবেই থাকবে, আর এই সব চেষ্টাই প্রাণের স্ফূর্ত্তির চেষ্টা। চোক কাণ দিয়ে দেখে শুনে জেনে প্রাণের খোঁজ পেলেই তাকে নিয়ে প্রাণ স্ফূর্ত্তিতে বাড়তে থাকবে, আর যতক্ষণ এই বাড় বজায় থাকবে ততক্ষণ সে বেঁচে আছি ব'লে বুঝবে। যখন এ ভাবটা আর ঘ'টতে পারবে না এমনি দাঁড়াবে তখন প্রাণ দেহ বদলাবে, ব'দলে আবার নিজের ভাবে ঘুরবে ফিরবে, থাকবে, জানবে শুনবে, জেনে শুনে সুখে থাকবে। প্রাণের এ ভাবের কখনও লোপ হবে না। তার অস্তিত্ব, তার চেতনা, তার আনন্দ, নানান ভাবে সংসারেও বজায় থাকবেই থাকবে। তার নিজের ভাবে সে সদাই "সচ্চিদানন্দ"। তার জীবনের স্রোত তিনটা ধারায় ব'ইবেই ব'ইবে।

কাজের বাছাই।

প্রাণ ম'রতে জানেনা বটে, কিন্তু প্রাণের বাঁচনের সঙ্গে মরণের খেলাটাও না থেকে পারে না। এ একটা জীবনের মস্ত হেঁয়ালি, এর রহস্য বুঝে ওঠা বড় কঠিন। মানুষ জন্মাল, বাড়ল, বুড়ো হ'ল, শেষে ভবের খেলা সাঙ্গ ক'রলে। কাকুইকে বা বাড়তেও হয় না, বুড়ো হ'তেও হয় না, অমনি অমনিই স'রে প'ড়তে হয়। সব জীব জন্তুই এমনি জন্মে আবার মরে। মরার হাত থেকে এড়ান পেতে কোথাও দেখা যায় না, অমর দেবতারাও নাকি মরে, মর্ত্তের জীবের ত কথাই নেই। ম'রে আবার বাঁচে বাঁচুক, কিন্তু না ম'রে কারুরই পার পাবার জো নেই। মরা গাছ ফের গজায় গজাগ, কিন্তু মরে যে এটা ঠিক। মরাটা জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে ফেরে, এতে আর ভুলটি নেই। দেহটা বদলাতে সবাইকেই হয়। প্রাণীর দেহ মরণের জন্যেই। পঞ্চভূতের দেহ একদিন না একদিন পঞ্চভূতে মিশবেই মিশবে। এর অন্যথা হ'তে পারে না, হয়ও না।

এক হিসাবে এই মরণটা জীবনের সঙ্গে সকল সময়ই লেগে আছে ব'ল্লেও চলে। এখনি যে দেহটাকে যে রকম দেখছ, পরক্ষণেই সেটা ঠিক তেমনটি নেই। কমতি বাড়তি, একটু অদল বদল, সব সময়েই চলেছে। ছোট বয়সের রাম, আর বড় বয়সের রাম, দুয়ে খুব তফাৎ। এমনি আজকের রাম আর কালকের রাম, আবার আরও তন্ন তন্ন ক'রে দেখলে, এ বেলার রাম আর ও বেলার রাম,এমন কি, এখনকার রাম আর তখনকার রাম, ঠিক একটি নয়। পঞ্চভূতের দেহের সাজ তিলার্দ্ধও এক রকম থাকে না। বাইরের ভূত কেবলই ঐ বাসায় ঢুকচে আর বেরুচ্চে। বাসাটারও ভাঙ্গন, গড়ন, কত রকমেই হ'চ্চে তার দিশে পাবার জো নেই। আর সে ভাঙ্গন গড়নের বিরামও নেই। সরু মোটা, ছোট লম্বা একই দেহের এই সব নানা রকম অদল বদল ভাব। একটা দেহের এই মুহূর্ত্তের ভাব অন্য মুহূর্ত্তের ভাবের সঙ্গে

কিছুতেই মিলবে না। কাজেই বলা যেতে পারে, যা আছে তা পর ক্ষণেই থাকবে না। যা দেখ, যা শোন, যা সোঁক, যা ছোঁও, যা চোষ একটু একটু উল্টে পাল্‌টে সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্চে। আর যেখানে এই সব দেখবার জিনিষ, শোনবার জিনিষ, সোঁকবার জিনিষ, ছোঁবার জিনিষ, চোষবার জিনিষ আছে, যে ঘটে এই পাঁচভূতের যাতায়াত আছে, সেই ঘটই সর্ব্বদা ভাঙ্গছে চূরছে। মানুষ বল, পশু বল, কীট বল, পতঙ্গ বল, গাছ পালা বল, নদ নদী বল, পাহাড় পর্ব্বত বল, দেশ ভূঁই বল, কোনটাই দুদণ্ড ঠিক এক রকম থাকে না। বাঁচতে বাঁচতেও যেন ম'রছে আর বেঁচে উঠছে। আলাদা দেহ, দেহধারী জীবের সকল সময়েই ঘ'টে উঠছে।

যাই হ'ক, এই অদল বদল, ঐ মরণের লীলা, প্রাণকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না। প্রাণের ধাতের সঙ্গে মরণ খাপ খায় না। প্রাণের কখনই মরণ হয় না। সুতরাং ব'লতে হয় যে মরার হাওয়াটা প্রাণের দেহের ওপর দিয়েই ব'য়ে যায়। দেহের ভূতের সাজ যখন খ'সে যায়, আমরা বলি অমুক প্রাণীটা ম'রে গেল, আর যখন তার একটু ওলট পালট হয়, তখন বলি প্রাণীটার অবস্থার তফাৎ হ'ল। জীবনে আর মরণে, এবং জীবনের দশ দশায়, প্রাণীর প্রাণটা ঠিকই বজায় থাকে, সুতরাং আসল প্রাণীটা কখনও পঞ্চত্ব পায় না।

প্রাণ পঞ্চত্ব পাক, আর নাই পাক, প্রাণকে কিন্তু এ জগতে পাঁচ ভূতের সঙ্গে চলা ফেরা ক'রতেই হবে, আর তাতে তার নানান্ দশা, মরণের দশা, ঘ'টবেই ঘ'টবে। এ রোধ করবার কোন উপায় নেই। উপায় না থাকলেও কিন্তু প্রাণ নিজের ধর্ম্ম, নিজের ভাবটা, সকল অবস্থাতেই রাখতে ব্যস্ত হয়, এটা বেশ লক্ষ্য করা যায়। ম'রতে হবে বটে, দেহ বদলাতে হবে বটে, কিন্তু যাতে বেঘোরে না ম'রতে হয়, সেটা প্রাণের প্রাণে প্রাণে সকল সময়েই জাগে। মরণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যাওয়াই প্রাণের ইচ্ছা। প্রাণের এই সংকল্পটা যাতে যাতে পূর্ণ হয় সেই সেই মতন নিজের জীবন চালিয়ে যাওয়াই, সেই

সেই রকম কাজকর্ম্ম করাই, মানুষের যে সেরা ধর্ম্ম, এ আর বলার দরকার হয় না।

যা ক'রলে মরণের হাত হ'তে এড়ান পাওয়া যায়, মানুষকে তাই ক'র্ত্তে হবে, সেই রকম কাজ কর্ম্ম বেছে নিতে হবে। কাজে কর্ম্মে কিন্তু ভূতের সঙ্গে সম্পর্কটা যত মানুষ পাকিয়ে তুলবে, যতই ভূত ঘাড়ে চেপে বসবে, ততই ভূতের ঘাড় মটকাবার সুবিধে হবে, বাগ পেলেই ঘাড় ম'টকেও দেবে। ভূতকে আপনার ব'লে ভাবলেই বিপদ্ ঘ'টবে। যা কিছু ভূতের, সে সব থেকে নিজেকে যতটা পার দূরে দূরে রাখবে। কেমন ক'রে? কেন ভাই, তুমি, তোমার প্রাণ, যখন ভূত নয়, তখন ভাবনা কিসের? ভূত ভূতের সঙ্গে মিশতে লালায়িত হয়, তুমি হবে কেন? ভূতের নৃত্য চারিদিকে হয় হ'ক তোমার কি? তোমার প্রাণের সম্বন্ধ, খাঁটি সম্বন্ধ, প্রাণেরই সঙ্গে। সমস্ত জীবের প্রাণের সঙ্গে তুমি নিজের সম্বন্ধ বুঝে নাও, আর তোমার ভূতের ভয় থাকবে না।

দশ দিকেই প্রাণ, দশ দিকেই প্রাণী। প্রাণীদের দেহগুলার সঙ্গে, ভৌতিক সাজের সঙ্গে, তোমার কুটুম্বিতা নেই, আছে খাঁটি প্রাণগুলার সঙ্গে। তোমার বাইরের দেহটার সঙ্গে, খোলসটার সঙ্গে, দশ দিকে প্রাণীদের দেহের যে সম্পর্কটুকু ঘটে, সেটুকু জগতে তোমার জীবন যাত্রাটা কোনরকমে বাইয়ে যাবার জন্যে, খাঁটি সম্পর্ক সেটা কিছুতেই নয়, হ'তে পারে না। তোমার দিক্ দিয়ে দেখলে, তোমার প্রাণ যেন জগতের কেন্দ্র, আর সবাইকের প্রাণ তুমি টানছ, তারাও তোমার প্রাণ টানছে। প্রাণের এই টানটুকুই তোমায় সোজা পথে টেনে নিয়ে যেতে চাবে। অন্য টানে প'ড়লেই, দেহের টানে চললেই, তুমি বিপথে গেলে। পথহারা হ'য়ে তখন ভবঘোরে পাক খেতে থাকবে। প্রাণের খাঁটি ভাব তখন আর প্রাণে তোমার জাগবে না, উল্‌টা উৎপত্তি হবে।

দেহের সম্বন্ধে, তোমার ছেলের দেহ, স্ত্রীর দেহ, আত্মীয় স্বজনের দেহ, বন্ধু বান্ধবের দেহ, তোমার কাছে আপনার বোধ হয়। তাদের

দেহটার ওপর আপনার ভাবটা ছ'ড়িয়ে দিয়ে তুমি প্রায়ই নানা রকম দুর্ভোগ ভোগ ক'রতে থাক। তাদের দেহটার কোন রকম এ ধার ও ধার হ'লেই তোমার প্রাণের আনন্দ উল্টে যায়, তুমি ঘোর দুঃখে অচেতন অভিভূত হ'য়ে পড়। উল্ট সম্বন্ধ ধ'রেই উল্টা বিপদ। নইলে তোমার আনন্দ নষ্ট করে কে? এই রকম তোমার নিজের দেহটার সঙ্গে খুব ঘনিষ্টভাবে সম্পর্ক পাতিয়ে, সেটাকে শুধু আপনার নয়, একেবারে আপনি ব'লে মনে ক'রে, পদে পদে তোমায় লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয়। তার 'স্বাস্থ্য' একটু নষ্ট হ'লেই তোমার নিজের প্রাণেরই যেন আর সোয়াস্তি থাকে না। পরকে আপনার ভাবার ফল এমনই হবে বৈ আর আর কি হবে!

এইখানে এইবার একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভূতের বাসায় প্রাণ থাকে ব'লে, প্রাণ যে নিজের বাসাকে, নিজের দেহকে, আপনার ভাববে, আর অপর প্রাণের বাসাগুলাকে ঐ রকম প্রাণের টানে কতকটা আপনার ব'লেই ধ'রে নেবে, এ বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। ভূতের মাঝেও ত প্রাণ আছে। সাক্ষা না হ'লেও পরোক্ষ ভাবে, একটু সম্বন্ধ দেহের সঙ্গে না আছে এমন নয়। পঞ্চভূতের ছোট ছোট প্রাণ গুলা একটা দেহ গ'ড়িয়ে তার মাঝের বড় প্রাণটাকে জ'ড়িয়ে তারই আশ্রয়ে থাকে। কাজেই আমার দেহটাই আমি আপনি, আর আমার যারা আপনার ভাবি তাদের দেহ নিয়েই আপনার ভেবে বসি। একথা ঠিক বটে। কিন্তু সমানে সমানে খাঁটি টান। যেখানে দেহের ভিতর প্রাণ, সেই প্রাণই তোমার আপনার। ছোট ছোট প্রাণের সঙ্গে, দেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ঐ ছোট ভাবেই ভাবলে, তোমার আর উল্টা ভাবা হবে না, আর তাতে উল্টা উৎপত্তিও হবে না। দেহটাকে প্রাণ বুঝলেই বিপদ্। একটা প্রাণ, বড় প্রাণ, ধ'রে কতকগুলা জীবাণু যখন নিজদের মধ্যে মিল মিশ ক'রে, সামঞ্জস্য রেখে, তাদের একটা দল পাকিয়ে থাকে, তখন সেই দলটা হ'ল একত্রভাবে ঐ প্রাণের সম্বন্ধে একটা 'দেহ'। সেটা

প্রাণ নয়, তার অন্তরালে প্রাণ। ঐ দেহের মধ্যে জীবাণুগুলার অবস্থার ফেরফার যা হবে, তাদের মিলে মিশে থাকার রকম যা বদলাবে, তাতে প্রাণের বড় বেশী যায় আসে না। দেহের রোগ ভোগ ঐ জীবাণুগুলার সঙ্গেই তাদের মেলামেশা অবস্থার সঙ্গেই জড়ান। তাতে প্রাণের কোনও প্রাণের টানে ত ঘা লাগবার কথা নয়। জীবাণুগুলা যদি বাসাটাকে ভেঙ্গেই ফেলে তখনও প্রাণের প্রাণের জিনিষ কিছু নষ্ট হয় না। তাদের দল ভাঙ্‌লে প্রাণের কি? তোমার নিজের প্রাণের সঙ্গেই যখন তোমার দেহের এমনই সম্পর্ক, তখন তোমার যারা আপনার তাদের দেহের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু বেশী নিকট হ'তে পারে না।

এইটুকু প্রাণে প্রাণে বোঝবার অবকাশ এ জগতে বড় পাওয়া যায় না। প্রাণে প্রাণে ভিতরের সম্পর্ক ঘটুক, বাইরে সকল সময়েই কিন্তু এই দেহ নিয়েই প্রাণের সম্পর্কের পরিচয় জগতে ঘটে। খাঁটি প্রাণে খাঁটি প্রাণে জগতে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যদি কোথাও হয় সেখানে আর প্রাণের উল্টা অবস্থা ঘটে না, আনন্দের অভাবে বিষাদ সেখানে আর প্রাণকে ভোগ ক'রতে হয় না। এই মরণের দেশে, প্রাণ দেহ ধ'রে সম্পর্ক পাতায়, পাতিয়ে যা কিছু দুর্ভোগ তা ভোগ ক'রতে থাকে। তবে এর মধ্যেও যদি নিজেকে ঠিক 'অমর' ভেবে বুঝে উঠতে পারে, প্রাণে প্রাণে 'অমর' লোকেই নিজেকে টেনে নিতে পারে ত তখন আর তাকে বিষম অবস্থায় প'ড়তে হয় না, সে সকল অবস্থাতেই সজাগ আর পূর্ণানন্দ। তার মোহ কখনও নেই, তার 'দুঃখ' কখনও নেই। 'মর' জগতের মধ্যে এই রকম 'অমর' হ'তে পার কিসে? ভাবনা কি ভাই, প্রাণ ঠিক যেটি বলে সেইটি কর। সেই রকম কাজে, প্রাণের মনের মতন কাজে, তুমি 'সুস্থ' প্রাণে থাকবে, মরণ জানবে না, মরণের জ্বালা জানবে না, মরণ হেঁসে উড়িয়ে দিতে শিখবে, মরণেও জীবন দেখবে, মরা প্রাণ দেখলে, মরা দেহ দেখলে, আবার একটা প্রাণের জীবনের নূতন ধারা বুঝবে। তোমার প্রাণ কি বলে বুঝ না কি ভাই? তোমার প্রাণ যখন দশ দিকের প্রাণের টানে বাঁধা, তখন

আর তোমার বুঝতে বাকী কি ? মিলে মিশে সব প্রাণের সঙ্গে থাক, আর যেখানে যারা মিলে মিশে আছে তারা যাতে সেই রকমে সুস্থ থাকতে পারে, তাই তুমি কর। এ ছাড়া তোমার কিছু কাজ নেই। তুমি মিলিয়ে মিশিয়ে সব সুস্থ রাখতে না পার তাতে তোমার দোষ নেই, কিন্তু তোমার কাজ ঐ মিলিয়ে মিশিয়ে সব রাখবার জন্যে যত্ন করাই। যদি পার ত কাউকে ম'রতে দিও না, মারতে কাউকে যেও না। না মারা আর ম'রতে না দেওয়াই হ'ল তোমার জীবনের সার 'ধর্ম্ম'। যে ইচ্ছার সঙ্গে, যে সংকল্পের সঙ্গে, মরণের সম্পর্ক আছে, সেটা একবারে মন থেকে উপড়ে ফেল, 'অহিংসা' সার কর, 'দ্বেষ' 'ঘৃণা' এসবকে মনে স্থান দিও না, কেন না এরা চায় জীবের মরণ। তা হ'লেই তুমি প্রাণের ইঙ্গিতে কাজ ক'রতে পার্ব্বে। জগতে মরণের হাত এড়াতে না পারলেও, জগৎকে, জীবজগৎকে, মরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলেও, সেই সংকল্পে, ম'রব না, ম'রতে দেব না, এই ভাবনায়, তোমার প্রাণ সুস্থ থাকবে, মর জগতেও 'অমর' থাকবে। প্রাণের কাজ করবার জন্যে জীবাণুগুলা যেখানে যেমন ভাবে মিলাচ্ছে, যে দেহ যেমন ক'রে তুলছে, সেগুলাকে দিয়ে তাদের বড় প্রাণের কাজ যতটা ক'রিয়ে দিতে পার, সে বিষয়ে যতটা সাহায্য ক'রতে পার, ততটাই তোমার জীবনকে তুমি সার্থক ক'রলে। বাঁচ, বাঁচাও, এই হ'ল তোমার জীবনের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্রেই সিদ্ধি।

সবাই যাতে সমস্ত জগতের কাজে লাগতে পারে, সমস্ত জগৎকে বাঁচাতে পারে, আর নিজে নিজে বাঁচতে পারে, এই অভিসন্ধিতে কাজ করাই ঠিক কাজ করা। জগতের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধটা বাড়িয়ে তোলবার জন্যে যেমন যেমনটি দরকার, জীবের দেহের তেমনি তেমনি ভাব বজায় করাই হ'ল কাজ। জগতের প্রাণের ব্যবস্থায় সেটা যখন যেমন হয়, তুমি সেইটুকু সবাইকের সম্বন্ধে ঠিক রাখবার জন্যে নিজের কাজ ক'রে যাও।

মূলমন্ত্র বজায় রেখে জীবনের কাজ কি ক'রে বেছে নেবে এটা

এখন বুঝলেত ? না বুঝে থাক ত ভাই একটু বিস্তার ক'রে ব'লছি শুন।

মানুষের কাজের পাঁচটা বৈ ছটা ধারা নেই। চোকে দেখবে, কাণে শুনবে, নাকে গন্ধ নেবে, জিবে রস চুষবে, আর গায়ে ছোঁবে। যা দেখবে, যা শুনবে, যে গন্ধ নেবে, যে রস চুষবে, আর যা ছোঁবে, সেইগুলাকে এমন ক'রে পরিপাটী করে তুলবে যে তাঁদের সম্পর্কে প্রাণের যেন স্ফূর্ত্তি হয়। যে যে কাজে এই রকম পারিপাট্য হয় সেই সেই কাজই আসল কাজ। জীবের দেহের ভোগের ইন্দ্রিয়গুলা এই রকম ভোগের পরিপাটীতেই চরিতার্থ হবে, প্রাণও স্ফূর্ত্তি পাবে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের হাত দিয়ে যা কিছু জীবের ভোগে লাগতে পারে, সেই গুলা সব প্রাণের খাঁটি ভোগের মতন ক'রে তোলাই ঠিক কাজ করা, ঠিক ভাবে বাঁচার পরিচয় দেওয়া। দেহের ভোগ প্রাণের সঙ্গে যতক্ষণ খাপ খাবে, ততক্ষণ দেহ ঠিক স্ফূর্ত্তি পাবে, যখন যেমন আকারে দাঁড়ান উচিত, জীবজগতের সঙ্গে, বাইরের সঙ্গে, সামঞ্জস্য রেখে যাবার জন্যে দেহের যেমন ভাবটি হওয়া উচিত, ঠিক তেমনটিই হবে। ঠিক ভোগটা জুটিয়ে দেওয়াই হ'ল ঠিক ক'রে করা। জীবের ভোগ ঠিক থাকলে, তার প্রাণ উল্লাসে থাকবে, আর উল্লাসে থাকলেই আর আর প্রাণের আর আর দেহের যাতে স্ফূর্ত্তি হয়, তার জন্যে যত্ন করবে, কেন না স্ফূর্ত্তির প্রাণের সঙ্গেই স্ফূর্ত্তির প্রাণ মিশতে চায়।

কি রকম ভোগে এই খাঁটি স্ফূর্ত্তি টুকু প্রাণের হয় এটা বুঝতে না পেরে প্রায়ই জীবকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয়। ভাল দেখলে, ভাল দেখালে, চোখের তৃপ্তি হয় ভেবে. ভাল দেখে বা ভাল দেখিয়ে শেষে অনেক সময় ফল ভাল হয় না, প্রাণের স্ফূর্ত্তি না হ'য়ে উল্টা হ'য়ে বসে, প্রাণের অবসাদ এসে দাঁড়ায়। রূপের লালসায় নিজের দেহের সর্ব্বনাশ, প্রাণের অহরহই দেখা যায়। ভাল গানে ম'জে, ভাল আহারের লোভে প'ড়ে, আতর গোলাপ ভোগ করে, রেশম পশম মকমলে গা মুড়ে, প্রাণের উল্লাস বিষম বিলাসের আকারে মেতে ওঠে,

উঠে প্রাণেরই বিপদ্ ঘটায়। প্রাণের ভোগ যাতে দুর্ভোগ না হ'য়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সকলকেই সতর্ক হ'য়ে কাজ ক'রতে হবে। বাঁচাতে গিয়ে যাতে প্রাণকে মেরে ফেলা না হয়, সেটা সকল সময়েই হিসাব ক'রে বুঝতে হবে। এ না ক'রলে 'প্রাণের' উপকার ক'রতে গিয়ে অপকার করা হবে, তোমার কাজ অকাজ বা অপকর্ম্ম ব'লে ধরা হবে।

একটা কথা হ'চ্ছে, জীবের ভোগ দুর্ভোগ হয় কেন? যাতে প্রাণের বাঁচবার কথা, আনন্দ পাবার কথা, তাতে অবসাদ বা কষ্টের হেতু কি? হেতু, ভোগে সামঞ্জস্য ঘটে না ছাড়া আর কিছু নয়। ভোগের একটা উপকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রতে গিয়ে কতকগুলার সঙ্গে প্রাণের এমন সম্বন্ধ ঘটে উঠল যে প্রাণ তাতে তিষ্ঠিতে পারে না, প্রাণের ভোগের দেহে, তার পঞ্চভূতের ঘরে, তাদের আদর হ'তে পারে না। সামঞ্জস্য রেখে ভোগ করা বড় কঠিন কথা।

এইটা ক'রতে না পারলেই প্রাণের ভোগের দেহে মরণের কাজ আরম্ভ হয়, শেষে মরণ, দেহের উচ্ছেদ, ঘটে। মরজগতে এই সামঞ্জস্যের অভাব সকল সময়েই দেখতে পাওয়া যায়।

কেন এ সামঞ্জস্যের অভাব হয়? অভাব হয় মানুষের জানবার দোষে। কি রকম ভোগে দুর্ভোগ হবে না, এটা জানতে হ'লে ভোগের যা কিছু তার সমস্ত পরিচয় মানুষের পাওয়ার দরকার। পরিচয় না পেলে, না জেনে শুনে একটা টানে প'ড়ে কিছুতে প্রাণ সঁপলে, তারই অন্য একটা টানে প্রাণ বার হ'য়ে যাবে। অমৃতের আড়ালে যদি বিষ থাকে ত অমৃত ভেবে সেটা খেলে বিষের জ্বালায় প্রাণ যাবেই যাবে। জীবজগৎ জুড়ে ভোগের জিনিষ সাজান র'য়েছে, জীবই জীবের জীবন, কিন্তু জীবের ভিতরে, জীবের শরীরে, মরণের উপকরণ লুকান রয়েছে, সে উপকরণ তোমার জীবনের শত্রু, সেটা তুমি না জানতে পারলেই ম'রেছ আর কি। তোমার জীবদেহে সমস্ত উপকরণের সঙ্গে যদি ঠিকভাবে একভাবে মিশে না যেতে পারে ত সে ভোগের জিনিষটা একদিকে যদিও তোমার প্রাণের স্ফূর্ত্তি দেখাবে

অপর দিকে তোমার প্রাণকে, ভোগের দেহকে, ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

'বাঁচতে' আর 'বাঁচাতে' যদি চাও, তাহলে সুতরাং যা তা কাজ ক'রলে চ'লবে না। কাজে বাঁচনের পরিচয় বটে, কাজ না ক'রে বেঁচে থাকবার উপায় নেই বটে, কিন্তু, ঠিক কাজটি না ক'রলেই, জেনে শুনে কাজ না ক'রতে পারলেই, কাজেই মরণ এসে জুটবে, কাজের দেহ বদলাবে। জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ ক'র্ব্বে, ভোগ ক'র্ব্বে, যে কাজে যে ভোগ হবে, তাতে দুর্ভোগের কতটা ভয় তাও আগে থেকে বুঝে নিয়ে কাজ ক'র্ব্বে। হয়ত দেখবে দুর্ভোগের হাত হ'তে জগতে এড়ান পাবার উপায় নেই। নেই বটে, কিন্তু দুর্ভোগের ভয় যতটা ক'মিয়ে আনতে পারা যায় ততটাই লাভ।

(৫)

জানব' কি ?

জীবন্ত জগতে নিজে বাঁচ আর অপর অপরকে বাঁচাও, বাঁচতে দাও, এই মন্ত্র সার ক'রে যেমন কাজ ক'র্ত্তে হবে, তেমনি কিসে বাঁচা যায় আর বাঁচান যায় সে রহস্যটা বুঝতে হবে, নইলে কেমন ক'রে কাজ ক'রবে বল ? প্রাণের যে যে ধারায় জগতে প্রকাশ সেগুলা না জানলে বাঁচাবে কাকে ? প্রাণকে বাঁচাবার জন্যে ত ভাই তোমায় ব্যস্ত হ'তে হবে না, তাকে পাথরে আছড়ালেও সে মরবে না। মরণের অধিকারটা, মরণের শাসনটা প্রাণের বাইরের ধারায়। যে দেহ নিয়ে প্রাণ চলে ফেরে, যে সব দেহের সঙ্গে প্রাণের আলাপ পরিচয় সংসর্গ হয়, মরণের ব্যাপার সেই সব নিয়েই। বিষের গাছের বিষের ফল

খেলে প্রাণের দেহ ভেঙ্গে প'ড়্বে, বিষের হাওয়ায় প্রাণের দেহই শুকিয়ে যাবে। 'ভৌতিক' জগতের যেটার প্রাণের দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার হ'তে পারবে না, সেটা ব্যবহার ক'রতে গেলেই প্রাণ যেন একটু গুটিয়ে যাবে, প্রাণের তেমন স্ফূর্ত্তি থাকবে না। যে যে জীবের দেহের সঙ্গে প্রাণের 'আপনার এরা' এই ভাব প্রকাশ পায়, সেই সেই জীবের সেই সেই দেহের একটু আধটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই প্রাণ শিউরে উঠবে, কেঁপে উঠবে। ভৌতিক দেহের সম্পর্কে দেহের অন্তরে, মনে প্রাণে, একটু ব্যথা লাগলেই, বাইরের সামঞ্জস্যের একটু এধার ওধার হ'লেই, প্রাণ যেন আর স্থির থাক্‌তে পারবে না। নিজের দেহের ভিতর বার, আর নিজের সম্পর্কে সব জিনিষের ভিতর বার, কোন্ অবস্থায় কেমন দাঁড়ায়, এইগুলা জান্‌তে পারলে তবে বাঁচতে বাঁচাতে পারা যাবে।

প্রাণবাঁচনের সমস্যাটা তাহ'লে বড় সোজা নয় একথা না ব'ল্‌লেও এখন চলে। প্রাণের সম্পর্ক জগতে ত বড় ছোট খাট নয়। এক হিসাবে জগতের একটা প্রাণের সঙ্গে সমস্ত জীবেরই সম্বন্ধ আছে। প্রাণের টান, এর সঙ্গে ওর, ওর সঙ্গে তার, এ ত সব জুড়েই আছে। টানাই প্রাণের ধর্ম্ম, সব প্রাণ সবাইকেই টানে। কাজের পরিচয়ের সঙ্গে, প্রাণের এই পরিচয়ের পরিসরও বাড়তে থাকে। যতই বাড়ে ততই ঝঞ্ঝাটও বাড়তে থাকে। নূতন 'বন্ধুটি' কে? কেমন? তার কি স্বভাব? এ না জানতে পারলেই বিপদ্। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, তার সঙ্গে ব্যবহারে, যদি তোমার বিপদ্ ঘটে ত জানবে তোমার বুদ্ধির দোষেই ঘ'টেছে। না জেনে শুনে তুমি শত্রুকে মিত্র ব'লে কোল দিয়েছ। যে তোমায় মারবে তাকে ভুল ক্রমে তোমার প্রাণদাতা ব'লে ঠাওর করেছ। বেছে গুছে বন্ধু না চিনে বন্ধু ব'লে মেনে নিলে কষ্টের আর সীমা থাকেনা। এ জগতে এমন বিপদ্ সকল সময়েই ঘ'টছে। মানুষ যতই জানতে চাক, সব পরিচয় সব জিনিষের নিয়ে উঠতে পারে না। পারে না কেন না সব জিনিষই এ জগতে

স্বভাবতই 'জটিল'। খাঁটি প্রাণ খাঁটি অবস্থায় এ জগতে থাকে না, শত শত ছোট ছোট প্রাণ নিয়ে থাকে। একটা প্রাণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে গিয়ে তোমার হাজার অজানা বন্ধুর বেড়ায় প'ড়তে হবে। একটির জন্যে হাজারের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে হবে। সেগুলা কিন্তু ঐ প্রাণেরও ঠিক নিজের নয়। তারা ওকে জ'ড়িয়ে আছে বটে, ওর কতকগুলা কাজ শেষ ক'রে দেবার জন্যে ওর কাছে জুটেছে বটে, কিন্তু তারা গরজে পড়ে ঐ রকম দল বাঁধলেও গরজ ফুরুলেই দল ভেঙে যে যেখানে যাবার সে সেখানে চ'লে যাবে। দলের এই বাঁধুনির সঙ্গে ভাঙ্গানির ভাবটা সব জায়গাতেই আছে। বাঁধুনির ভাবটা যেন 'অমৃত' আর ভাঙ্গানির ভাবটা যেন 'বিষ'। তোমার দেহের সঙ্গে আর একটা দেহের সম্পর্ক ঘটলে ঐ সম্পর্কে হয়ত ভাঙ্গানির ভাব জেগে উঠবে, না হয় বাঁধুনির ভাব জেগে উঠবে, না হয় মাঝামাঝি কতক ভাঙ্গানির কতক বাঁধুনির ভাব স্ফূর্ত্তি পাবে। তোমার দেহের অবস্থার গতিকে নূতন বন্ধুর সমাগমে এই ভাঙ্গুনি বাঁধুনির ইতর বিশেষ হয়। অমৃতও কখনও বিষ হয়, বিষও কখনও অমৃত হয়। সাপের গরল কখনও দেহ বাঁচায়, আবার অতি মধুর খাদ্যও কখনও মারে। এই ভাঙানি বাঁধুনির দোটানায় প'ড়ে জগতের মধ্যে কোন জীবের দেহই পূরন্ত প্রাণে জীবন যাত্রাটা চালিয়ে যেতে পারে না। জীবের প্রাণ ফুট্‌ছে আর শুকুচ্‌চে। চিরকাল ফুটে থাক্‌তে এ জগতে জীবদেহ পারে না। পারে কোথায় ? যেখানে ভাঙ্গানি বাঁধুনি নেই। যেখানে মরণের নামটি নেই। যেখানে প্রাণের আর দশটা জড়িয়ে নিজেকে জাহির ক'রতে হয় না। যেখানে প্রাণ শুধুই প্রাণ, শুধু প্রাণের সঙ্গেই সম্পর্ক করে, শুধু প্রাণের সঙ্গেই চলে ফেরে। সেখানে তাঁর আর জান্‌তে শুন্‌তে কিছু হয় না, সে প্রাণ নিজের সম্বন্ধে, আর ঠিক যারা আপনারই মতন, তাদের সম্বন্ধে সবজান্তা। এ জগতে মরণের ভিতর দিয়ে বাঁচন, সেখানে কেবলই বাঁচন। এ জগতে না জানার ভিতর দিয়ে জানা, সেখানে সবই জানা। এ জগতের দুঃখের ভিতর

দিয়ে সুখ, সেখানে শুধুই সুখ। খাঁটি ধারাগুলো, পূরাপূরি বাঁচা, পূরাপূরি জানা, পূরাপূরি সুখভোগ করা, সেই 'অমর' লোকে আপনা আপনিই আছে। এর জন্যে আর যত্ন চেষ্টা ক'রতে হ'বে না।

ঐ অমর লোকের সন্ধান যখন করবার তখন ক'র ভাই, এখন নিজের নিজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ব'লতে হবে যে মর লোকের সংবাদটা রাখাই আপাততঃ তোমার আসল কাজ। এখানে ঐ দলবদ্ধ' প্রাণের সঙ্গেই সবাইকের কারবার। যেখানে যে প্রাণ যে দলের সর্দ্দারি ক'রছে, সেখানে সেই প্রাণের সঙ্গে আলাপ ক'রতে গিয়ে, আগেই দলের ভাব গতিকটা বেশ করে ত'লিয়ে বোঝবার চেষ্টা ক'রতে হবে। বুঝ, তোমার সঙ্গে এদের ব্যবহারে ভাঙুনির ভাবটা, খুন করবার ভাবটা, কতটা জাগবে, আর গড়বার ভাবটা, বাঁচবার ভাবটাই বা কতটা ঠেলে উঠবে। মনে রেখ তোমার দেহও একটা দলের বাঁধন মাত্র। তোমার ঐ দলের মধ্যেই ভাঙবার গড়বার ভাব লুকান আছে। বাইরের যোগাযোগে তোমার দেহের ঐ দুটা ভাবের প্রকাশ হয়। যাই হোক, জীবনে যখনই কিছু ক'রতে যাবে, তখনই তোমার এই রকম নানান্ দলের সঙ্গে মিশতে হবে। কাজেই যতটা পার আগে থাকতে এদের সংবাদটা সংগ্রহ ক'রে রাখা তোমার পক্ষে ভাল। জগতের কাজ করবার জন্যে, জগতে নিজের প্রাণকে প্রকট করবার জন্যে, নিজের দেহের সমস্ত খবরটা, ভিতরের বাইরের সব রহস্যটা, আর অপর অপর দেহের, সারা ব্রহ্মাণ্ডটা জুড়ে সব দেহের, ভিতরের বাইরের সার কথাগুলা সব বুঝে নিতে পারলে তবে তুমি ঠিক কাজ ক'রতে পার্ব্বে। দেহের জ্ঞান, জড়ের জ্ঞান, মর জগতের জ্ঞান, বাঁচতে হলে বাঁচাতে হলে তোমার সঞ্চয় করার বড়ই দরকার। এ জ্ঞান খাঁটি প্রাণের খাঁটি জ্ঞান নয় বটে, কিন্তু প্রাণের বিশেষ বিশেষ ধারার জ্ঞান, কাজেই এর নাম 'বিজ্ঞান'। জীব জগতের সমস্তটা নিয়ে বিজ্ঞানের অধিকার। বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য জীবকে বাঁচাবে। বিজ্ঞানের নূতন নূতন 'তথ্য' খুঁজে বার করাই মানুষের জানবার শক্তির প্রধান

পরিচয়। যতই এই তথ্য বার হবে, ততই মানুষ, সারা জীবজগৎ, ভাল রকম বাঁচতে পারবে, সুখ ভোগের পথ খোলা দেখবে।

মনে ক'রনা ভাই খাঁটি প্রাণের খাঁটি জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের মজ্জাগত একটা বিরোধ আছে। জগতের প্রাণ, মরলোকের প্রাণ, বিশেষ নিয়ে, দেহ নিয়ে, প্রকাশ পায় ব'লে, জগতের জ্ঞানের বিজ্ঞানের মুখেই পরিচয় নিতে হয়। কিন্তু বিশেষও প্রাণ নিয়ে; প্রাণ ছাড়াত কিছুই নেই। মরণটাও প্রাণেরই একটা ধরণ বৈ আর কি ? খাঁটি প্রাণের খাঁটি জ্ঞানটাকে, শুধু জ্ঞানটাকে, আসল ব'লতে হয় বল, আর মর জগতের জ্ঞানটাকে সেই হিসাবে 'অবিদ্যা' বল তাতেও ক্ষতি নেই,—আর এটা অবিদ্যাই ত বটে, কেননা মরণ না থাকলেও প্রাণের মরণ ধ'রে এটা নিজের পরিচয় দেয়,—তবু কিন্তু এই বিজ্ঞান জ্ঞানেরই একটা বিশেষ ধারা বৈ অন্য কিছু নয়।

ভাঙনের বাঁধনের শাসনে সারা জগৎটা র'য়েছে, সারা জগতের মরণের ভিতর দিয়ে বাঁচনের ধারা এই 'বিজ্ঞানের' অধিকারে কাজেই না থেকে পারে না, কিন্তু সেটাও বাঁচনেরই যখন একটা রকম তখন বিজ্ঞান জ্ঞানেরই একটা আকার প্রকার ব'লব বৈ আর কি ? জ্ঞান অমরের, বিজ্ঞান মরের। জ্ঞান প্রাণের ভিতরে, বিজ্ঞান প্রাণের বাইরে। জ্ঞান প্রাণ, বিজ্ঞান প্রাণের আবরণ। জ্ঞান বদলায় না, বিজ্ঞান বদলায়। তা হ'লেও বিজ্ঞান ছাড়া হ'য়ে জ্ঞান এ জগতে থাকতে পারে না। জগতের প্রাণের ভিতর বার আছে, সে প্রাণ একবারে নির্ভাঁজ খোলা প্রাণ নয়। বিজ্ঞান ভাঙনের বাঁধনের ঝোঁকটা যতটা পারে রোধ করবার চেষ্টা করে, ম'রতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ভুল বুঝতে না দিয়ে ঠিক বোঝাতে চায়, দুঃখ পেতে না দিয়ে সুখ পাওয়াতে চায়। পুরপুরি পেরে ওঠে না বটে, যতটা সম্ভব সফলও হয়। কাজেই বিজ্ঞান খাঁটি প্রাণের, খাঁটি জ্ঞানের, খাঁটি আনন্দের পথে যে সবাইকে এগিয়ে দিতে চায়, খাঁটি সচ্চিদানন্দের আদর্শটা চোখের সামনে সামনেই রাখতে চায়, একথার অপলাপ ক'রবে কি ক'রে ? তা যদি না ক'রতে পার, তা

হলে তোমায় স্বীকার ক'রতেই হবে, বিজ্ঞান জ্ঞানেরই দোসর, শত্রু নয় পরম মিত্র।

জগৎকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞান নানান্ আকারে জগতে নিজেকে বিস্তার ক'রেছে। ক'রবে না কেন? ভাঙনের বাঁধনের অধিকারটা ত বড় ছোট খাট নয়। জগতের সম্বন্ধে তুমি যে ভেবে চিন্তে একটা ঠিক কর, জগতের সঙ্গে তুমি যে তোমার তোমার ব'লে সম্পর্ক পাতাও, জগতের বিষয়ে নানান্ রকম যা মনে মনে ভাব, চোখ কাণ নাক জিব চামড়া দিয়ে জগৎটাকে যে ভোগ কর, তোমার দেহের ভিতরের এই সমস্ত কাজের ধারাগুলা, বাইরের জগতের সম্বন্ধে, আর প্রাণের বাইরে স্ফূর্ত্তি পাবার সম্বন্ধে, দুয়ের সম্পর্কে সমস্ত কাণ্ড কারখানা, সবই বিজ্ঞানের ভিতরের ধারার অধিকারে। আবার বাইরে, জগতের, জীব-জগতের, ভৌতিক জগতের, নানান্ রকম যে পরিচয়, গ্রহ নক্ষত্র, গাছ-পালা, পাহাড় পর্ব্বত, কীট পতঙ্গ, পশুপক্ষী, গোরু মানুষ, জল বায়ু, আকাশ মাটী, যত রকমে যা কিছু 'মরণের' দেশে সাজান আছে, সবাইকের সংবাদ, তাদের আকার প্রকার, অস্থি মজ্জা, মন প্রাণের, সব খবরই বিজ্ঞানকে সংগ্রহ ক'রতে হয়। মোটের ওপর বিজ্ঞানের দুটা বড় ধারা, ভিতরের বিজ্ঞান আর বাহিরের বিজ্ঞান। দুটা থেকে ছোট ছোট ধারা অনেক বেরিয়েছে। এই সব তত্ত্বগুলা জানতে না পারলে প্রাণকে জগতে মুস্কিলে প'ড়তে হয়। পারে না ব'লে সদা সর্ব্বদা পড়েও মুস্কিলে। জগতের আদি থেকে চিরকাল ধ'রে মানুষ এই সব তত্ত্ব নিজের আয়ত্ত করবার জন্যে কত চেষ্টা যে ক'রেছে আর ক'রছে, তার সীমা নেই, কিন্তু ভাঙনের বাঁচনের অধিকারে সব রহস্যের ভেদ ক'রতে মানুষ পারেওনি পার্ব্বেও না, কেননা ভাঙনের বাঁধনের অগুণতি ধারা, অফুরন্ত ধারা। আবার ভাঙনের ভিতর বাঁধন, বাঁধনের ভিতর ভাঙন,এইরকম তার ভেতর, তার ভেতর, বরাবর চ'লেছে, বিরাম নেই। নাই থাক, মানুষের প্রাণ, তার নিজের বাঁচবার ঝোঁক, জানবার ঝোঁক, সুখে থাকবার ঝোঁক, চিরকাল তাকে এই 'গূঢ়' তত্ত্ব খুঁজে বের করবার

জন্যে ব্যস্ত রাখবেই রাখবে! মানুষ জীবের অন্তরের তত্ত্ব আর বাহিরের তত্ত্ব জানবার চেষ্টা না ক'রে থাকতেই পারবে না।

যাক্, এখন দেখা যাক বিজ্ঞানের, ভিতরের বিজ্ঞানের আর বাহিরের বিজ্ঞানের, আকার প্রকারটা কি? কোন্ কোন্ পথে মানুষ তত্ত্ব খুঁজতে চলে—ভাঙবার গড়বার ধরণ বুঝতে চেষ্টা করে? তুমি আমি যখন কিছু একটা ভাঙতে চাই, ভাঙন গড়নের কাজে হাত দিতে চাই, তখন কি করি ভাব দেখি। তা হলেই বুঝবে জগতের ভাঙন গড়ন যে করে সেই বা সেটা কি রকমে করে। একটা ক'রে তুলতে হবে ব'লে আগে ঠিক ক'রে নিই, সেটাকে আমার আপনার ব'লে তার সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ পাতাই, তারপর তাতেই মন দিই, সব ইন্দ্রিয়-গুলা দিয়ে সেটা নিয়েই থাকি। জগতের প্রাণ ভাঙন গড়নের কাজে হাত দিয়ে ঠিক এমনিটাই না ক'রে আর কি ক'রতে পারে? এই ধারাটা বোঝবার জন্যে,বোঝাবার জন্যে, মানুষের 'অন্তর্বিজ্ঞান'। 'বুদ্ধির' তত্ত্ব, মমতার বা 'অভিমানের' তত্ত্ব, 'মনের' তত্ত্ব, আর 'ইন্দ্রিয়ের' তত্ত্ব, নিয়ে এই 'অন্তর্বিজ্ঞান'। 'তর্কবিজ্ঞান', 'প্রবৃত্তি বিজ্ঞান', 'মনো-বিজ্ঞান', 'ইন্দ্রিয় বিজ্ঞান', আর এদের নিয়ে 'কর্ম্মনীতি', 'রাজনীতি', 'সমাজনীতি', এই রকম কত কি নীতি। খাঁটি নিভাঁজ প্রাণের খোঁজ এরা দেয় না, দেয় ভাঙ্গা গড়া প্রাণের। ভিতরের কাজ শেষ হ'লে বাইরে তুমি আমি পঞ্চভূতের উপকরণ নিয়ে কাজে এগুই। বাইরের আকারে এই উপকরণেই ব্রহ্মাণ্ডটা সাজান। জগতের প্রাণ কতরকম ক'রে এই উপকরণ নিয়ে কাজ ক'রেছে, তার পরিচয় পেতে হ'লে, আলাদা আলাদা 'জড় বিজ্ঞানের' কাছে খোঁজ নিতে হবে। 'ভূমিতত্ত্ব' 'অন্তরীক্ষ তত্ত্ব' 'পদার্থ তত্ত্ব' 'মিশ্রণ তত্ত্ব' 'প্রেত তত্ত্ব, 'জীব তত্ত্ব' 'জীবন তত্ত্ব', 'উদ্ভিজ্জ তত্ত্ব', 'মানব তত্ত্ব', এই এই রকম জড় বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখা।

এদের নিয়ে আবার কত কত যে প্রশাখা তার গণনাই হয় না। মনে রাখতে হবে কিন্তু যে 'জড়' প্রাণেরই একটা ধরণ মাত্র, কাজেই

'জড় বিজ্ঞান' নামেই 'জড় বিজ্ঞান, তার মধ্যে ভিতরের অবস্থার পরিচয় না থেকেই যাবে না। সমস্তকে নিয়ে মানুষের 'আয়ুর্ব্বেদ' শাস্ত্র, সব খবর সব জায়গা থেকে সংগ্রহ ক'রে, বাঁচাবার জন্যে, বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র সাধন করবার জন্যে এই শাস্ত্র। এক হিসাবে এই শাস্ত্রের শাসনে 'অন্তর্বিজ্ঞান' আর 'জড় বিজ্ঞানের' সমস্ত রহস্যই আছে ব'লে মনে করা যেতে পারে। কেবল জড়ের তত্ত্ব নিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র, জড়ের সঙ্গে জড়ের ভিতরের খবরও নেওয়ার দরকার। এই সোজা কথাটা অনেকেই অনেক সময়ে ভুলে যান।

বিজ্ঞান যে জগতের জীবের এক রকম সর্ব্বস্ব একথা আর বেশী ক'রে বিস্তার না ক'রলেও চলে। জগৎকে রাখবার জন্যেই বিজ্ঞানের সমস্ত প্রয়াস। মরণের হাত থেকে, ভুল বুঝবার হাত থেকে, দুঃখের হাত থেকে, বিজ্ঞান একেবারে নিষ্কৃতি দিতে কখনও পারে না, পারবার কথাও নয়, কিন্তু, সবাইকের আয়ুঃকাল বাড়িয়ে দিতে, সবাইকের কাছে সব জিনিষের আসল ভাবটি বুঝিয়ে দেবার জন্যে, সবাইকের সুখের মাত্রা বেশী ক'রে দিতে, বিজ্ঞানের চেষ্টার বিরাম নেই। যতই বিজ্ঞানের পরিসর বাড়ে ততই জগতের মঙ্গল। জগতের দিক্ দিয়ে দেখলে বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিতেই জগতের শ্রীবৃদ্ধি। 'বিশ্বপ্রাণ' বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে সদাই ব্যস্ত। জগৎ বাঁচুক, বুঝে শুঝে চলুক, সুখে থাকুক, 'বিশ্বপ্রাণের' এ ছাড়া আর চিন্তা হ'তে পারে না। বিশ্বে যে যেখানে আছে সবাইকের কষ্ট কিসে কমে এই উপায় ঠিক করবার জন্যেই 'বিশ্বপ্রাণের' জানবার তাড়া শত শত বিজ্ঞানের সৃষ্টি মানুষের হাত দিয়ে করাচ্ছে। মানুষই জগতের জীবনের প্রধান কেন্দ্র, তাই মানুষের বুদ্ধিতেই বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

কিন্তু, ভাই, বিজ্ঞান যতই করুক, ভাঙন গড়নে যতই বাধা দিক, একবারে কখনও জীবজগৎকে, জীবজগতের কোনও অংশটাকেই, আস্ত রাখতে পারে না। রাখবে কিসে? যা নিয়ে সে নিজে দাঁড়িয়ে তাকে সরাবে কি ক'রে? ভাঙন গড়নই হ'ল তার অস্থিমজ্জা, ভাঙন

গড়নের সঙ্গেই তার সম্পর্ক, সে ভাঙন গড়নের বাইরে যাবে কি করে? তা পারবে না। যদি ভাঙন গড়নের দেশ ছেড়ে যেতে চাও, ত প্রাণের নিজের দেশের খোঁজ কর। যদি মরণ ছেড়ে শুধুই বাঁচতে চাও ত সবাইকের মূল প্রাণ কোথায় আছে দেখ। যদি জানতে গিয়ে ভুল বোঝবার ভয় থেকে এড়ান পেতে চাও ত যে প্রাণ নিভাঁজ জ্ঞান তার কাছে এগিয়ে এস। যদি বিষাদ বা অবসাদ একবারেই না ভোগ ক'রতে চাও ত যে মূল প্রাণে পূরাপূরি আনন্দ সেই প্রাণের ভাবটা প্রাণে জাগিয়ে তোল। জগতে যতক্ষণ থাক, ততক্ষণ জগতের বিজ্ঞান সংগ্রহ কর ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে জগৎ ছাড়া জ্ঞানের খোঁজ নিতে ভুল না। জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানই মানাবে, নইলে বিজ্ঞান জোট ছাড়া হ'য়ে দিশেহারা হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানের মরণকে বাঁচাবে, মোহকে বোঝাবে, দুঃখকে সুখে দাঁড় করাবে।

(৬)

সুখ কিসে?

বিজ্ঞানের মুখে ভাই তুমি নিশ্চয় শুনেছ, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন জিনিষ নেই যে অপরকে টানে না। একটা জড় পদার্থের সঙ্গে আর একটা জড় পদার্থের টান সকল সময়েই আছে। গাছ থেকে আতা পড়ে এই টানের জোরে। পৃথিবী আতাটাকে টানছে, টানতে টানতে নিজের কাছে নিয়ে আসছে। আকাশ থেকে উল্কা প'ড়তে দেখেছ। এক এক দিন রাত্রে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখেছ ঘন ঘন কত উল্কাই প'ড়ছে। এরা পড়ে কেন? পড়ে ঐ পৃথিবীরই টানে। যতক্ষণ পৃথিবীর বাইরের কোন জিনিষ উল্টা টানে থাকে, থেকে আকাশে

ঘুরতে থাকে, ততক্ষণ, পৃথিবীর টানে খ'সে পড়ে না, কিন্তু টানের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এসে প'ড়লেই আর রক্ষা নেই, অমনি সজোরে পৃথিবীর কোলগত হয়।

ঢিল পাঠখেল উপরে ছুঁড়ে দাও, ঐ টানের চোটে পৃথিবীর বুকে এসেই প'ড়বে। পড়া দেখলে টানটা বুঝা যায় ব'লে পড়ার কথাই আগে বল্লাম। কিন্তু শুধু পড়ায় এ টানের পরিচয় নয়। গ্রহ উপগ্রহ ধূম-কেতু, রবি শশী তারা, সবই যে শূন্যপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে,তাও এই বিশ্ব-জুড়ে টানের জোরে। এ ওকে টানছে, ও তাকে টানছে, এই রকম দোটানা, পাঁচটানা, দশটানায় প'ড়ে, নানান্ টানের ফলে, সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টানের হাত হ'তে জড় জগতের কোন জিনিষটাই নিষ্কৃতি পায় না। এমন যে পৃথিবী, ইনিও 'অচলা' নন, এঁকেও টানে প'ড়ে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে। টানাটানি সর্ব্বত্রই।

শুধু বাইরেই এই টান নয়। ভিতরেও টানাটানি। একটা জিনিষ হাজার হাজার ছোট জিনিষের, এক রকম জিনিষের, মেলার মেশার ফলে এক হ'য়েছে। এ ছোট ছোট জিনিষগুলা টানাটানি ক'রে পদার্থটাকে এক ক'রে রেখেছে। বড় টানে প'ড়ে, উল্টা টানে প'ড়ে, যতক্ষণ না ঐ পদার্থটার অঙ্গ খ'সতে থাকে ততক্ষণ পদার্থটা মোটামুটি ঠিক থাকে। এক একটা জিনিষের ভিতরদিকেও এই রকম মস্ত একটা টানের খেলা চ'লেছে। কতকগুলা টানের 'সমন্বয়ে' তবে সেই জড় পদার্থটা।

যদি একটু সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়, তা হ'লে বেশ বোঝা যায় এই ভিতর বাইরের টান আলাদা আলাদা টান নয়। একটানেরই ধারার ইতর বিশেষ। জগতে একটা জিনিষ হ'তে আর একটা জিনিষ তফাতে থাকে ব'লে মনে হয় ঐ দুটা জিনিষের টান এক রকমের, আর একই জিনিষের ভিতরের ছোট ছোট অংশের টান আলাদা রকমের। কিন্তু জগতের দেহটা যদি একটা বিরাট্ দেহ ব'লে ভাব,—আর সত্যি সত্যিই এটা একটা বিরাট্ দেহ,' আর এর 'পরে একটা বড় প্রাণের,

বিশ্বপ্রাণের, অধিষ্ঠানই আছে,—তা হ'লে এর মধ্যে এক জিনিষের সঙ্গে অপর জিনিষের টান, এর এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের টান ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। কাছাকাছি আর দূরে দূরে, ছোটয় ছোটয়, আর বড়য় বড়য়, এই যা মোটামুটি তফাৎ।

যাই হ'ক, জড় জগতের এই টান সত্যি সত্যিই কি জড়েরই টান? টানা ত জীয়ন্তের কাজ। মরা কি টানে? যাকে বলছি মরা সে ত অসার, নিশ্চেষ্ট, সে আবার টানবে কি ক'রে? নিজে যে নড়ে না ব'লে ভাবছি সেই পরকে নড়াচ্ছে এ কি কথা? জড় জগতের মধ্যে 'মহাকর্ষণ', এ যেন বাঁঝার ছেলে হ'ল নয়? হ'ল বটে, কিন্তু আকর্ষণটা প্রত্যক্ষ, চোখের সামনে প্রতিক্ষণেই তার কাজ দেখছি। সেটা নেই বলিই বা কি ক'রে? সমস্যাটা তা হলে জটিল হ'য়ে উঠল নয়? বিজ্ঞান কি শেখালে? ভুল বোঝালে কি? বিজ্ঞানের ভুলও ত দেখতে পাইনে। অথচ একটু তর্ক ক'রতে গেলেই ত জড়ের 'মহাকর্ষণ' বুদ্ধিতেই আসে না। এ রহস্যের সমাধান কি? সমাধান আছে বৈ কি? সমস্যাটাকে জটিল তুমিই ক'রে তুলেছ, নিজে সমস্যাটা কিছুই জটিল নয়। কথার মারপেঁচে ফেলে, তুমি সোজা কথাটাকে বাঁকা ক'রে তুলেছ। ঐ যে 'জড়' 'জড়' ব'লছ, জড় কোথায় ভাই? জড় ত কোথাও নেই। বিশ্ব জুড়ে সবই যে প্রাণ, সর্ব্বত্রই যে প্রাণেরই খেলা। জড় পাবে কোথা? যেটাকে জড় ব'লে ধ'রে নিচ্ছ, সেটাকে জুড়ে, তার ওপরে, যদি একটা প্রাণ নাই থাকে, তবু তার অঙ্গে অঙ্গে ছোট ছোট অগুণতি জীবের লীলাখেলা। যে বিজ্ঞান তোমায় একটা জিনিষকে জড় ব'লে দেখিয়ে দেবে, সেই বিজ্ঞানই আবার তোমায় ঐ জড়ের ভিতর কোটি কোটি জীবের খোঁজ ব'লে দেবে। যেখানে দেখবে কতকগুলা জীব একত্র হ'য়েছে, অথচ তাদের মাথার ওপর একটা বড় প্রাণ এসে তাদের আপনার ক'রে নিয়ে, আপনার দেহর মতন ধ'রে চালায় না, সেইখানেই বিজ্ঞান জড় দেখিয়ে দেয়। এক হিসাবে বিজ্ঞান ভুল বলে না। এক হ'য়েও

এক প্রাণ না পেলে, একের হিসাবে জড় হ'ল বৈ কি? কিন্তু সেই জড়ের ভাবটা তোমার কল্পনায় মাত্র। এক দেখায় ব'লে সেটা এক নয়। এক জায়গায় 'জড়' করা কতকগুলা জীব, এক হওয়ার হিসাবে মাত্র জড়। আবার ওপরে প্রাণের অধিষ্ঠান থাকলেও তার দেহ হিসাবে 'জড়' করা জীবগুলাও জড়।

যখন বিজ্ঞান বলে জড় জড়কে টানছে, তখন বুঝবে জড় ঠিক জড়কে টানে নি, অগুণতি জীব এক হ'য়ে অগুণতি জীবকেই এক জায়গায় টানছে। না হয় তাদের ওপরের প্রাণে প্রাণে টানাটানি। প্রত্যেক টানটাই জীবে জীবে, অন্য কাউকে নিয়ে টান হ'তেই পারে না, অন্য কিছু নেইও। প্রাণই প্রাণকে টানে, টানা প্রাণেরই কাজ আর কারউ নয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে প্রাণটা আছে, সে টানছে তার চেয়ে ছোট ছোট প্রাণ, তারা আবার টানছে তাদের ছোটর ছোট, এই রকমে টান ওপর থেকে স্তরে স্তরে নামছে, আবার নীচে থেকে স্তরে স্তরে ওপরে উঠছে। প্রাণের বড় কেন্দ্রের টান বিশ্ব জুড়ে, তার দিকে সবাইকের প্রাণ এগিয়ে যেতে চায়, ছোটর ছোটগুলা নিজেদের ছোটর ছোট নিয়েই থাকে।

জীব জগতের যেখানে যে আছে তারা সকলেই প্রাণে প্রাণে অপর সবাইকে টানে, আর বড় প্রাণের দিকে, বড়র বড়র প্রাণের দিকে, টানা প'ড়তে থাকে। মহাকর্ষণের মহাকেন্দ্র মহাজীব, তিনি সব ব্যেপে আছেন, সবাইকেই তিনি টানেন। জড়ের দৃষ্টিতে, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এ টানে জগতের সব চ'লছে। প্রাণের দৃষ্টিতে এই টানে প্রাণের জগতে সকল রকম প্রকাশ। এই টান না থাকলে প্রাণ জগতে জীবনযাত্রা কিছুতেই চালিয়ে যেতে পারত না। তুমি আমি যা কিছু করি এই প্রাণের টানেই। আপনার ব'লে যা কিছু ভেবে নিই তা এই প্রাণের টানেই। আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার বন্ধু, সবই আমার আর তাদের প্রাণের টানে। আমার বাড়ী, আমার দেশ, তাও একরকম প্রাণেরই টানে। বাড়ীর প্রাণের, দেশের প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণ

টানা না প'ড়লে এ মমতা হয় না। বাড়ী বা দেশ প্রাণীর কাজ না করুক, তাদের অন্তরালে একটা প্রাণের অধিষ্ঠান না হ'লে এ মায়া বসে না। তোমার প্রাণের ভোগের জন্য সাক্ষাৎ না হ'ক আড়াল থেকে কারউ প্রাণ দেশ বাড়ী তোমার ভোগে আনবার জন্যে তোমায় টানতে থাকে। স্ত্রী পুত্র দেশ বাড়ী ছাড়া হ'লে, তাদের বিপদ্ ঘ'টলে বা একেবারে উচ্ছেদ ঘ'টলে, তোমার প্রাণের টানে ঘা পড়ে, আর তাতেই তুমি নিজেকে 'অবসন্ন' মনে কর।

প্রাণের টান আলগা হ'লে বা ছিঁড়ে গেলে মানুষ 'অবসন্ন' হয় কেন ? কেন সহজেই বোঝা যায়। প্রাণের বাঁধনে প্রাণ নিজেকে অপর প্রাণ নিয়ে 'পরিপুষ্ট' ক'রে, নিজেকে 'পরিপূর্ণ' ব'লে ভাবতে পারে, আর সেই অপর প্রাণ স'রে গেলেই নিজে ক্ষীণ হ'য়ে প'ড়বে এতে আর আশ্চর্য্য কি ? জগতে প্রাণের বাঁধন যতই বাড়তে থাকে, প্রাণ ততই পূর্ণ হ'তে থাকে। নিজের দিকে, নিজের কোলে, যে যত টেনে নিতে পারে, সে ত ততই নিজেকে পূরণ ক'রতে থাকবে। প্রাণের ইচ্ছা জীবন ভোর এই রকম পূরণ ক'রতে থাকে। সকল প্রাণের সঙ্গেই তার সত্যি সত্যি আপনার সম্পর্ক আছে। সবাইকের সঙ্গেই তার টান আছে। সবাইকে নিয়ে নিজে বেশী বেশী পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছা তার না হবে কেন ? একটার বিচ্ছেদেই বা নিজেকে সে অপূরন্ত ব'লেই ভাববে না কেন ? আমি সবাইকের হই, সবাই আমার হোক, এই ত প্রাণের চরম সংকল্প। যে যেখানে আছে, আমি সবাইকের কাজে লাগি, সবাই আমার কাজে লাগুক, প্রাণ এই চায়, আর কিছু চায় না। কাউকে আমি হারাতে চাইনে, কেউ যেন আমায় না হারায়। সব আমার কুটুম্ব, সব আমার আত্মীয়। আমি বিশ্ব জুড়ে থাকি, বিশ্ব আমায় নিয়ে থাকুক। আপনাকে পূরন্ত ক'রতে প্রাণ এই ভাবেই চায়। যাতে এর বিঘ্ন ঘটে, তাতেই প্রাণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। দুঃখ শোক যাতনা, পূরন্ত হ'তে পারার অভাবে, পূরন্ত হ'লে এ সব নেই।

পূরন্ত হ'তে না পারলে, পূরন্ত হ'য়ে না থাকতে পারলে, প্রাণের

যেমন 'দুঃখ', পূরন্ত হ'তে পারলে, পূরন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারলে, প্রাণের তেমনি 'সুখ'। পূরন্ত হওয়াই সুখী হওয়া, খালি হওয়াই দুঃখী হওয়া। প্রাণের টানে এই পূরন্ত হবার ভাবটা জাগে, কাজেই ব'লতে পারা যায় প্রাণের টানেই সুখ আসে। এই প্রাণের টানটাকে আমরা বলি 'প্রীতি'। সুতরাং প্রীতিতেই জীবনের সুখ, প্রীতির অভাব বা ব্যাঘাত হ'লেই দুঃখ। 'প্রীত' হওয়া, 'পূর্ণ' হওয়া, সুখী হওয়া, একই কথা। ভালবাসা দিয়ে, ভালবাসা পেয়ে, তবে মানুষের আনন্দ হয়। যে ভালবাসা দিতে জানে না সে সুখী নয়, যে ভালবাসা পায় না, সেও সুখী নয়। মানুষ মানুষকে ভালবেসে, তার কাছথেকে ভালবাসা পেয়ে, নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে ক'রে তৃপ্তিলাভ করে। অপরকে মানুষ সুখী ক'রতে চায় কেন না অপরে তাকে সুখী ক'রবে। একের প্রাণের সম্পর্কে অপরের প্রাণ পূর্ণ হয়, যদি সেই অপরের প্রাণ ঠিক তার আপনার হয়, নইলে নয়। আমার সে আপনার নয়, যে আমায় আপনার ব'লে নেয় না। ভালবাসার, জীবনকে পূরন্ত করবার, জীবনকে সুখ দেবার, এ নিয়মের কোথাও ওলট পালট হয় না। যে যখন বলে আমি ওকে ভালবাসি, ও আমায় ভাল বাসুক আর নাই বাসুক, সে প্রাণের কথা বলে না। ভালবাসা ফেরৎ না পেলে, মানুষ দুঃখী হবেই হবে। ভালবাসার দুটা মুখ, এক মুখে সে আপনাকে ভোগ ক'রতে জানে না। 'জড়'কে যখন ভালবাসি, 'জড়'কে নিয়ে যখন 'জীবন'কে পূর্ণ মনে করি, তখনও সুখের এই ধারা। যেটা আমার ক'রেছি, সেটা 'অর্দ্ধাঙ্গি' হ'য়ে, অখণ্ড হ'য়ে, আমার হ'য়েই থাকুক, আমায় ছেড়ে না যাক, এ ভাবটা প্রাণে ওঠেই ওঠে, আর যখন দেখি সে ছাড় ছাড় বা ছাড়লে তখন আমার জীবন খালি হ'য়ে যায়, আমি দুঃখ শোকের হাতে পড়ি। ফল কথা, জড়ই হোক, আর চেতনই হ'ক, তুমি আমার, আমি তোমার,- একের সম্পর্কে অপরে বাড়ব, এই ভাব নিয়ে জগতে ভালবাসা, আর সেই ভালবাসায় সুখ। এ রীতি লঙ্ঘন করবার উপায় নেই।

পূরন্ত প্রাণ খালি হয় কেন ? প্রাণে প্রাণ মিশলে, সে মিলনে, বিঘ্ন আসে কোথা থেকে ? আজ যে আমার কাল সে আমার থাকে না কেন ? আমি যাকে ভাল বাসছি সে আমায় ভাল বাসে না কেন ? যদি বাসে ত সে ভালবাসা আবার কমে কেন, চ'লেই বা যায় কেন ? আমি যাকে নিয়ে পূরন্ত হ'লাম, সেও ত আমায় নিয়ে পূরন্ত হ'ল, তবে ইচ্ছে ক'রে একজন খালি হয় কি জন্যে ? এ প্রশ্ন সহজেই উঠতে পারে, উঠেও থাকে। প্রাণের টান যখন জগৎ জুড়ে, প্রাণের টানে যখন একজন অপরকে টানে, তখন সে টান খ'সবে কেন ? টানাই যখন প্রাণের স্বভাব, তখন যে টান আছে সে টান ত থাকবেই থাকবে। এর অন্যথা হওয়া একটু আশ্চর্য্যের কথা ব'লেই মনে হয় বৈ কি। আশ্চর্য্য কিছুই নেই। যে টানে তুমি অপরকে টানছ, বিশ্বের সব প্রাণের সঙ্গে যে টান তোমার সব সময়ে র'য়েছে, সেই টানেই এই অনর্থ ঘটে। তুমি যাকে টেনে কোলগত ক'রেছ, সে যে আরও হাজার টানের মধ্যে প'ড়ে আছে, এটা ভুলে যেও না। তোমার টানের জোরে যতক্ষণ তোমার কোলগত হ'য়ে রইল, ততক্ষণই সে তোমার, অন্য টানে প'ড়ে অন্য দিকে ছুটলে আর তখন তোমার নয়। তোমার টানের বাঁধনে আর তাকে বাঁধা যায় না। উল্‌টা পালটা টানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব প্রাণই এমনই ব্যতিব্যস্ত। এতে আর কোনও হাত নেই। জীবের অখণ্ড ভালবাসা, জীবের সর্ব্বদা পূরন্ত হ'য়ে থাকা, জীবের অবাধে সুখ ভোগ করা, অদৃষ্টে ঘ'টে ওঠে না। টানাটানিতে জীবের সম্বন্ধ চারিদিকেই প্রতিক্ষণে ভাঙ্‌চে, চূরচে, আবর নূতন হ'য়ে গ'ড়ে উঠছে। ভাঙা গড়া, ব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায়, সকল সময়েই। দরকার বুঝে বিশ্বের প্রাণ, মস্ত বড় শক্তি, এই ভাঙা গড়ার খেলা খেলছে। তোমার আমার সাধ্য কি তাতে বাধা দিই ?

বিশ্বের প্রাণ কেন এ ভাঙা গড়ার খেলা খেলে ব'লতে পার কি ? কিসের জন্য ঐ প্রাণ একে ওখান থেকে স'রিয়ে নিয়ে আর একটা টানে

ফেলে দিচ্ছে, আবার তাকে ওখান থেকে স'রিয়ে এনে এর টানে ফেলছে, এটা বুঝতে পার কি ভাই ? বুঝলেই বুঝতে পার, এ আর বেশী কথা কি ? এ নাড়া চাড়া তোমার ভোগের জন্যেই হয়, এ কথা ব'ললে বিশ্বাস ক'রবে কি ? কর আর না কর কথাটা কিন্তু ঐ। তুমি এ জগতে ঘুরছ কেন ভাব দেখি ? ঘুরছ তোমারই কাজে, পরের কাজে, নয়। পরের কাজে কেউ ঘোরে না। তুমি যে দেহটা নিয়ে জ'ন্মেছ, যে দেহটার সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ক পাতিয়েছ, যে দেহটা ধ'রে আমার আমার ক'রে বেড়াও, সে দেহটা কেন অমন হ'য়েছে জান ত ? হ'য়েছে তোমারই আগের আগের দেহের ঝোঁকের ফলে, মানুষ হ'য়ে সে দেহে যা ক'রেছ তারই ফলে। দেহের ভিতর দিকে মনে প্রাণে যে যে বাসনা জাগিয়েছ, তাদের যাতে পূরণ হয়, অন্ততঃ তাদের কতকগুলার যাতে পূরণ হয়, সেই জন্যেই তোমার এই দেহ হ'য়েছে।

ঐ বাসনা যত পূর্ণ হবে তোমার জীবন ততই তুমি পূরন্ত ভাববে। তোমার পূরণের ঝোঁক অন্য দিকে নয়। যখন এগুলার একটা হেস্ত নেস্ত হবে, তুমি এগুলাকে পূরণ ক'রে তোলবার জন্যে যতটা যা করবার তা তা ক'রে ফেলবে, আর কিছু করবার থাকবে না বা ক'রে উঠতে পারবে না, তখন প্রাণের যে টানে দেহ হ'য়েছিল সে টান ছিঁড়ে যাবে। বেঁচে যতক্ষণ থাক, ততক্ষণও তোমার ভোগের ঝোঁক যখন যে ধারে গেলে ফুটন্ত হবে, সেই ধারেই ফুটবে, আর সে ঝোঁক গেলেই যা ভোগ কর তার সঙ্গে টান ছিঁড়ে যাবে। ভোগের জিনিষ এমনি এমনি ক'রে যতদিন ভোগের বল থাকবে ততদিন ভোগের বাঁধনে থাকবে, পরে খ'সে খ'সে প'ড়বে। বিশ্বের প্রাণের সঙ্গে তোমার প্রাণ এমনি সূতায় গাঁথা, যে তোমার প্রাণের ভোগের জন্যে ভোগের জিনিষ তোমার প্রাণের টান বুঝে সেই বড় প্রাণ এগিয়ে দেবে আবার স'রিয়ে নেবে। এগিয়ে দিলেই তোমার টানে, স'রিয়ে নিলেই অন্য টানে। আগের আগের সঞ্চিত বল বুঝে ভোগের বল, ভোগের কাল ; বল ভাঙলে, কাল ফুরুলে, ভোগেরও অবসান। একটা একটা ভোগের

সম্বন্ধেও যে কথা, সারা জীবনের ভোগের সম্বন্ধেও সেই কথা। একটা বল ভাঙলে একটা ভোগ ভাঙবে, জীবনের সব বল ভাঙলে, সব ভোগ ভাঙবে, দেহটাও ব'দলে যাবে।

জীবের ছোট খাট ভোগের টানেই জগতে তা হ'লে এই ভাঙা গড়া, অদল বদল। এই রকমটা ভোগ ক'রতে হবে, অন্য রকমটা নয়, প্রাণের এই বাসনার জন্যেই ভোগ ছোট হয়, আর অল্প সময় থাকে। এটা খাব ওটা খাবনা, এটা শুনব অন্য কিছু শুনব না, এটা দেখব অন্যটা দেখব না, এই গন্ধটা এখন নেবো, অন্য গন্ধের এখন দরকার নেই, এই রকম গায়ে দোব, অন্য রকম দোব না, এক একটা ভোগের এই রকম এক একটা ছোট ধারা প্রাণে বইতে থাকে ব'লেই ভোগের জগতে প্রাণের এই ভাঙা গড়ার বিপদে প'ড়তে হয়। তুমি চাও না একবারে সব, পাবে কেন একবারে সব ? তুমি চাও না কোনওটা চিরকাল, থাকবে কেন সেটা তোমার চিরকাল ? তুমি ছোট হ'য়ে থাকতে চাও, ছোট হ'য়েই থাকবে। তোমার ছোট দেহ ওই ছোট ভোগই তোমায় জুটিয়ে দেবে, ছোট দেহে বড় ভোগ জুটবে কোথা থেকে ? তোমার প্রাণ এমনি ঝোঁক নিয়ে এখন ফুটেছে, যে সে ছোট বৈ বড় ভোগ ক'রবে না, অল্পক্ষণ বৈ বেশীক্ষণ ভোগ ক'রবে না। তাহলে আর দোষ কার ভাই ? সব সময়ে যদি সব ভোগ ক'রতে না পাও, সব তোমার আপনার হ'য়ে যদি অখণ্ড হ'য়ে না থাকতে পার, সবাইকে নিয়ে নিজে পূর্ণ হ'তে যদি না পার, ত তার জন্যে তুমি নিজে দায়ী। যা ক'রেছ, যা ভেবে ক'রেছ, তারই ফল পাবে। অন্য ফল পাবে কেন ?

এখন বল দেখি ভাই, কোথায় পাবে তোমার পূর্ণ প্রাণ ? কোথায় ভাই তোমার প্রীতির টান চিরকাল অটুট থাকবে ? কোন্ দেশে তোমার সুখ, সুখই থাকবে, দুঃখের মুখও দেখবে না ? এ দেশ কোথায় আছে ? এ দেশের খোঁজ কি পাওয়া যায় ? যায় বৈ কি ভাই। নিজের প্রাণের দিকে তাকিয়ে দেখ, এখনি সব দেখতে পাবে। ছোট

ভোগে প'ড়ে, ছোট খাট বাসনা প্রাণের ভিতর পুষে, তুমি যখন ছোট হও, তখন আর ছোট খাট বাসনা পোষ কেন, ছোট ভোগই বা চাও কেন ? যে বাসনার ঝোঁকে তোমার প্রাণের প্রীতি একদিকে যায়, অন্যদিকে যায় না, সেটা তোমার পরম শত্রু। যার ছোট বলে তুমি কোনটাকে চিরকাল নিজের ক'রে নিয়ে সুখী হ'তে পার না, সেই ছোট বলটা যাতে প্রাণে জাগে তা ক'রতে দাও কেন ? প্রাণে খুব বড় হ'তে চাও, বিশ্বজুড়ে ব'সতে চাও, বিশ্বের সবটাকে যাতে ভালবাসতে পার সেই রকম ভাব মনে জাগাও, যাতে আর ছোট টান থাকবে না, এক আধটা জিনিষ আপনার হবে না, একটা বড় টানে সব আপনার হবে, সেই টানে প্রাণকে 'বাঁধতে' শেখ, আর ভাবনা থাকবে না। তখন তুমি প্রাণের নিজের দেশে এসে পৌঁছাবে। এখানে একবার আসতে পারলে দেখবে তোমার আর এটা ওটা ভোগের নয়, সবই তোমার ভোগের, তুমি এটা ওটা ভালবাস না, সবই ভালবাস, এটা ওটা তোমার আপনার নয়, সবই তোমার আপনার। এখানে সত্যি সত্যিই তুমি সবাইকের, সবাই তোমার। ছোট আশা, ছোট ইচ্ছা, এখানে তোমার বড় প্রাণে স্থান পাবে না। তুমি এখানে বড়র বড়, সকলের চেয়ে বড়। প্রাণ এখানে নিজেকে ঠিক ধ'রে নিয়েছে। পূরাপূরি ফুটে উঠে প্রাণ নিজেই নিজের পূর্ণ আনন্দ।

(৭)

প্রাণ কোথায় ?

প্রাণ জগতে ভোগ ক'রতে আসে, ভোগ ফুরুলেই ফিরে যায়, ফিরে গিয়ে আবার ঘুরে আসে। কাজের গতিকেই এমনি ঘুরে ফিরে আসে

যায়। যে সব কাজের ঝোঁকে প'ড়ে জীব ভোগের একটা ধারায় পড়ে, সে সব কাজের ঝোঁক মিটে গেলে ভোগের হাত থেকে তার একবারে নিষ্কৃতি পাবার কথা বটে, কিন্তু তা ঘ'টে ওঠে না। কত কাজের কত ঝোঁক যে ঘাড়ে চাপান আছে তার ত গণনাই হয় না। ভোগ ক'রতে ক'রতে, কাজের সঙ্গে সঙ্গে আবার কত কত নূতন ঝোঁক যে হয় সে ত সব সময়েই আমরা প্রাণে প্রাণে বুঝছি। কাজেই এক পালা শেষ হ'লেই আসর উঠে যায় না। আসর পাতাই থাকে, আবার পালা আরম্ভ হয়। প্রাণের এ অভিনয়ের আদিও নেই, মোটামুটি দেখলে বুঝি শেষও নেই। অভিনয় ক'রতে ব'সে, ভোগ ভুগতে গিয়ে, প্রাণ কিন্তু কখনও জগৎ জুড়ে আসর পাতাতে পারে না। যতই দৌড়াদৌড়ি করুক, লম্ফ ঝম্ফ করুক, জগতে প্রাণের দৌড় বড় বেশী নয়। দৌড় অল্পস্থান জুড়ে, আবার অল্প কালও জুড়ে। একদিন হোক, এক মুহূর্ত্ত হোক, বা একশ বৎসর হোক, একটা অভিনয় এক সময় শেষ হবেই হবে। ভোগের এই এক একটা অভিনয়ে চিরকাল প্রাণ বাঁচে না। এর খাতিরে জানা শুনা, আলাপ পরিচয়, সম্বন্ধ পাতান, যা কিছু তাও খুব বেশী নয়, সব কাজের জন্যে, সব স্থানের জন্য নয়। কাজেই এক একটা ভোগের গতিকে প্রাণ আপনার ব'লে জগতের কিছু কিছু নিয়ে আপনাকে যদিও পূর্ণ করে, অল্পস্বল্প 'পূর্ণ' করে, তা হ'লেও সেই ভাবে অখণ্ড সুখ পায় না, চির সুখও পায় না। ভোগে ভোগে প্রাণের জগতে বাঁচনের পরিসর, জানার পরিসর, সুখের পরিসর, সবই ছোট, খুবই ছোট।

এই ছোট ছোট ধারায় ভোগ করবার জন্যে প্রাণ ছোট ছোট উপকরণ নিয়েই আসরে নামে। ছোট উপকরণগুলা না নিয়ে প্রাণের ছোট হওয়াই হয় না। ছোট দেহটি নিয়ে প্রাণ ছোট হয়, ছোট ছোট ইন্দ্রিয়গুলা নিয়ে প্রাণ ছোট হয়, ছোট মন নিয়ে প্রাণ ছোট হয়, ছোট 'আমার আমার' ভাব নিয়ে প্রাণ ছোট হয়, ছোট ভাবে কাজ ক'র্ব্ব ভেবে প্রাণ ছোট হয়। অনেক সময় তাই আমরা ভুলে মনে করি,

প্রাণকে ছোট ভেবে ভুল বুঝি, যে দেহটি বুঝি প্রাণ, ইন্দ্রিয়গুলাই বুঝি প্রাণ, মনটাই বুঝি প্রাণ, মমতার ভাবটাই বুঝি প্রাণ, ক'রতে হবে এই বুদ্ধিটাই বুঝি প্রাণ। এরা প্রাণের বটে, জগতে এদের নিয়েই প্রাণ বটে, কিন্তু ভাই এরা কেউ প্রাণ নয়। নয় কেন, সহজেই বুঝতে পার।

এই যে তোমার দেহটা, দেহের আকারে সাজান পাঁচভূতগুলা যে দেহ গ'ড়িয়ে তুলেছে, ঐ যে পালে পালে দলবাঁধা 'অণু' 'পরমাণু' জীবগুলা, ওই সাজ সজ্জাটা তোমার প্রাণ ব'লে কেন তোমার সন্দেহ হবে বল ? সত্য বটে ঐ দেহেরই সব নিয়ে চ'লে ব'লে তোমায় সব কাজ ক'রতে হচ্ছে, আর কাজেই প্রাণের পরিচয় অন্য কিছুতে নয়। তা হ'লেও ভাই দেহ চলে বলে কতটুকু নিয়ে, আর কতক্ষণ ? প্রাণ সব জগৎ জুড়ে ব'সতে চায়, সব সময় নিজের শাসনে আনতে চায়। দেহ কতটকু জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ক'রতে পারে ? চ'লতে চ'লতে ব'লতে ব'লতে এরা অবশ হ'য়ে বা পড়ে কেন ? দেহই যদি প্রাণ হ'ত ত ঐ মরণের শাসন এর ওপর এসে পড়ে কোথা থেকে ? প্রাণ হ'লে কিছুতেই দেহ, প্রাণ ছাড়া হ'তে পারত না। তবেই ভাই, দেহ প্রাণ হ'তে পারে না। দেহকে প্রাণ চালায় বটে, কিন্তু দেহের ঘাড়ে চেপে, নিজে দেহ হ'য়ে নয়। দেহের চলা বলায় প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দেহকে প্রাণ ভাবা মস্ত ভুল। তুমি হয়ত এখনি ব'লবে যে দেহেরই একটা ভাব প্রাণ, সে ভাবটা না থাকলেই প্রাণ থাকে না। তা ব'লতে পারনা। যাকে ব'লছ প্রাণ, যাকে ভাবছ প্রাণ, বাঁচাই যার একমাত্র ধর্ম্ম, সে আবার একেবারে নষ্ট হবে কি ক'রে ? 'আছে'টার নেই ভাব কোন রকমে কল্পনাতেই আনতে পারা যায় না। ভাবনার নিজের ভাব ছেড়ে দিতে বলা পাগলের কথা। প্রাণকে ভাব প্রাণ, সে থাকবেই প্রাণ। দেহ তা হ'তে পারে না। দেহ মরে, কেন না দেহ নিজে মরা, প্রাণের আবেশেই জীয়ন্ত হয়। সারা জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় না, সে পূর্ণ হ'তে পারে না, প্রাণ নিয়ে

প্রাণের ভরে সম্পর্ক ক'রতে যায়, পূর্ণ হ'তে চায়। তার নিজের জ্ঞান, নিজের সুখ থাকলে, সে জ্ঞান, সে সুখ, যাবে কেন ?

দেহের সম্বন্ধে যে কথা, ইন্দ্রিয়গুলার সম্বন্ধেও সেই কথা। পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতে ভোগের পাঁচটা যে বিষয়, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সেগুলা ভোগ কর বটে, ভোগের জন্যই এই ইন্দ্রিয় গুলা এ কথাও ঠিক, কিন্তু এদের ভোগের শক্তিই বা কতটুকু, অধিকারই বা কতটুকু ? খোলা প্রাণ, যা জগতের সমস্ত দিক্, দেশ, কাল নিয়ে ব'সে থাক্‌তে চায়, সে এদের নিয়ে কতটা খর্ব্ব হ'য়ে চলে বল দেখি ? কতটুকু রূপ তোমার চোখে পড়ে ? কতটা শব্দ তুমি শুনতে পাও ? এইরকম কোন্ ভোগটা,ইন্দ্রিয়ের কোন্ বিষয়টা,তোমার ব্রহ্মাণ্ড ভোরে, তোমার প্রাণ ভোরে, চিরকালের জন্য তোমার হয় ? প্রাণের হ'লে এমন হ'তে পারত কি ? প্রাণের সীমানা কে ক'রবে ? প্রাণের পরিসর কখনও কি ছোট হ'তে পারে ? প্রাণ যে এরা নয় তা পদে পদেই চারিদিকে দেখছ, পলে পলেই প্রত্যক্ষ ক'রছ। মরার চোখ দেখে না, কাণ শোণে না। কাজেই প্রাণ চোখ কাণের ওপরে, ভোগের জন্যে চোখ কাণ নিয়ে থাকে, ভোগের শেষে চোখ কাণ ছেড়ে দেয়। যতক্ষণ এরা ভোগ করে, ততক্ষণ প্রাণের ঝোঁক পেয়ে এটা ওটা দেখতে শুনতে চায়, এটা ওটাকে আপনাদের দিকে টানতে চায়। প্রাণের ছাড়া পেলেই সে সব লীলা খেলা ফুরিয়ে যায়।

ভাবতে পার ছোট খাট ইন্দ্রিয় গুলা প্রাণ না হয় নাই হোক, মনটা প্রাণ হ'তে বাধা কি ? বাধা আছে বৈ কি। একথা সত্যি বটে, মনে যে ভাব, যে ভাবনা, একবার ওঠে,সেটা একরকমে মরে না ব'ল্লেই হয়। আজ যাতে মন দিলে সেটা মনে থেকে যাবেই যাবে। মনের সংকল্প মনের ভিতরেই লুকিয়ে থাকে, আবার জো পেলেই জেগে ওঠে। যে রূপে, যে রসে, যে গন্ধে, যে স্পর্শে, যে শব্দে, মন একবার প'ড়েছে, সে রূপের, সে রসের, সে গন্ধের, সে স্পর্শের, সে শব্দের ভোগের আস্বাদটা মন থেকে ঘুচে যাবে না। মন তা হলে মরার দেশ ছেড়ে

অমরের দেশে ব'লেই বোধ হয় না কি ? অমরের দেশের যদি হ'ল তা হলে মনই ত প্রাণ হ'ল। না ভাই, মন অমরের দেশের কাছাকাছি হ'লেও একটু তফাতে। যে অমর,তার সকল সময়ে সব জায়গায় অবাধ গতি। তার খেলা কেউ রুকতে পারে না, সে 'দেবতা'। দেশ কাল কখনই তাকে আটকাতে পারে না। কিন্তু মন দেশে কালে বাঁধা প'ড়ে যায় না ত কি হয় ? একটায় মন দিলে আর একটায় মন দিতে পার কৈ ? এক সময়ে এক জিনিষে যে মন সে মন সেই সময়ে অন্য জিনিষে যায় কৈ ? তা যদি না গেল, তবে তার দেশ কাল জুড়ে বসবার শক্তি কোথা ? যখন দেখবে, খুব মন দিয়ে দেখবে, তখন দেখবেই, তখন আর আর ইন্দ্রিয় দিয়ে ভোগ ক'রতে এক রকম পার্বে না বল্লেই হয়, যদিই পার ত পূরাপূরি ত নয়ই। মন দিয়ে যা দেখবে, তাই দেখবে,অন্যটা দেখেও দেখতে পাবেনা। মন এখানে বসে, ওখানে বসে, সেখানে বসে, কিন্তু অল্প আয়তন নিয়েই বসে। এখন এখানে, তখন সেখানে, অন্য সময়ে আর এক খানে। মনের যখন এই গতিক তখন তার সব সময়েই হাত পা বাঁধা। জগতের মাঝে একবারে সে খোলা পায় কোথা থেকে ? এ জিনিষ সুতরাং সকল সময়ে সব জায়গায় সজাগ যে প্রাণ তা নয়। সবজান্তা হয় না, হ'তে পারে না। কোন রকমেই ভোরপুর হ'য়ে জগতের সম্পর্কে পূর্ণ হওয়া মনের পক্ষে অসম্ভব। এর সম্পর্ক আসে যায়। এর সুখ কাজেই কখনই অখণ্ড হ'তে পায় না। মনের সুখের সঙ্গে দুঃখও জড়ান। এমন মন চির-কাল জীবন্ত থাকবার জিনিষ নয়।

ভাল, মন যদি প্রাণ নাই হ'ল, সবাইকে আপনার ক'রতে পারে না ব'লে যদি প্রাণের নীচেয় প'ড়ল, তবে যাতে আপনার ভাবা যায়, সেই 'আমার' 'আমার' বুদ্ধিটাকে প্রাণ ব'লে মানা যেতে পারে ত। এ বুদ্ধিটে ত জগতের সমস্তটার ওপর ছড়িয়ে প'ড়তে চায়। তবে এ প্রাণ হবে না কেন ? চাইলে হবে কি ভাই, আমার আমার ব'ল্লেই কি সব আমার হয়। আমি ত চাই জগৎটাকে সব আমার ক'রে নিয়ে ভোগ

ক'রতে, পারি কি ? আমার আমার ক'রে কতটুকু আমার ক'রে তুলতে পারি ভাই ? খুব অল্প, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পরিসর ধর'লে অতি সামান্য। যাও আমার করি তাও কত ক্ষণের জন্য কত কালের জন্যই বা আমার ক'রতে পারি। কাল ফুরুলেই যে আমার সে আমার থাকে না। আজ যা আমার ভোগে কাল ত আমার ভোগে থাকে না। ভোগের জিনিষ নিয়তই হাত বদলাচ্চে, এতে বাধা দিতে কেউ পারে না! তবে আর কি ক'রে ব'লতে পারি আমার আমার বুদ্ধি, 'মমতা বা অভিমান', প্রাণই বটে। প্রাণের তাড়ায় 'আমার' 'আমার' বুদ্ধি চলে বটে, কিন্তু নিজে প্রাণ নয়। হ'লে অল্প পরিসরের মধ্যে বাঁধা প'ড়ত না। আজ যেখানে আমার আমার বুদ্ধি কাল সেখান থেকে সেটা লোপ পেত' না। আজকের মিত্র কালকের শত্রু হ'ত না। আজকের প্রীতি কালকের বিদ্বেষে দাঁড়াত না। মরণের স্রোতে যে পড়ে সে প্রাণ নয় একথা বলাই বেশীর ভাগ। সুখের সঙ্গে, সুখের পর, যার সম্পর্কে দুঃখ ঘটে, সে 'সুখের' প্রাণ কিসে হবে ? সব জায়গায় এক সময়ে যে আপনার সাড়া দিতে না পারে, সাড়া দেওয়া, সাড়া নেওয়াই, তার জগৎ জুড়ে স্বভাব ব'লব কেন ? আমার আমার বুদ্ধি যতক্ষণ এইরকম থাকবে ততক্ষণ তাকে অমর ব'লতে পার না। জগতের সম্বন্ধে 'আমার' বুদ্ধি মরণের হাতে প'ড়েই আছে। প্রাণ সুতরাং এরও ওপরে।

সব সময়ে সব জায়গায় সাড়া দিতে না পারায় 'মমতা' প্রাণ ছাড়া হ'ল, তবে এইবার বলি ভোগ ক'রছি বা ক'রব এই সাড়া দেওয়ার শক্তিটেই প্রাণ। না তাও বলা চলেনা। জগতে ভোগের ধারাটা বোঝ দেখি ভাই, তা হ'লেই বুঝবে, সাড়া দেওয়ার শক্তিটে ভোগের মাথার ওপর বসে থাকলেও সেও প্রাণ থেকে একটু দূরে প'ড়ে আছে। যা ভোগ কর, যা নিয়ে তোমার জীবনের কাজ কর, বাঁচবার পরিচয় দাও, নীচের দিক্ থেকে দেখলে দেখা যায়, যে 'ইন্দ্রিয়' দিয়ে সেটা প্রথমে একটু নাড়া চাড়া যায়, তার একটু 'আলোচনা' হয়, কি যেন কি একটা ভোগে যেন এল অমনি ভাবটা জেগে ওঠে, তার

পর মনে সেটা কেমন ধারা কি রকম এই ভাবে তার আকার প্রকারের 'কল্পনাটা' দেখা দেয়, পরের ধাপে সেই ভোগটায় 'আমার' এই এই হ'ল এই বুদ্ধিটে এসে দাঁড়ায়, সকলের শেষে হাঁ আমার ভোগ হ'ল বটে ভোগের এই স্থির বুদ্ধিটে বেশ প্রকাশ পায়। ওপরের দিক্ দিয়ে ভাব, আমায় ভোগের কাজ ক'রতে হবে, আমার সেটা নিজের এমনি ভোগে লাগবে,কাজেই আমায় সে দিকেই মন দিতে হবে, চোখ কাণ হাত পা দিয়ে এমনি এমনি ক'রে ভোগের কাজটার সমাধান ক'রব, ধাপে ধাপে প্রাণের ভোগ এই রকমে নামে। যাই হোক ভোগ করা হ'ল, বা ভোগ ক'রতে হবে, এই যে বুদ্ধি এটা যে প্রাণ ঘেঁসে তা বেশ বোঝা যায়। গেলেও কিন্তু মরণের দায় থেকে এ বুদ্ধি নিষ্কৃতি পায় না। ভোগ ক'রে সুখ পেতে গিয়ে দুঃখও পাব, পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে খালিও হ'তে থাকব, সব ভোগ ক'রতে পারব না, ভোগে বাঁচতে গিয়ে ম'রতে হবে, এ বুদ্ধিগুলা, এই মরণের বুদ্ধিগুলা, ভোগের ঝোঁকের সঙ্গে, ভোগের বুদ্ধির সঙ্গে, না থেকেই পারে না। কর্ম্মের বুদ্ধি ভোগের বুদ্ধি দিয়েই প্রাণ মরণের স্রোতে গা ঢালে, নিজে কিন্তু নিজেকে বাঁচিয়ে যায়।

মন, অভিমান, বুদ্ধি, প্রাণ নয় বটে, কিন্তু জগতের ভোগে প্রাণের সঙ্গে এদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এটা সহজেই বোঝা যায়। এই কটা প্রাণের যেন ভিতরের দরজা। এইগুলা খুলেই প্রাণ যেন বাইরে আসে। যখনই যে দিকে যাক না এ দরজা কটা না খুলে আসবার উপায় নেই। জগতে ভোগের জীব হ'য়ে এই কটা প্রাণ নিজের সঙ্গে সাজিয়ে রেখে দেয়। এই কটা দেখে, এই কটা ধ'রে, এক একটা প্রাণ এক একটা জীব ব'লে বোঝা যায়। একটা খাঁটি প্রাণের সঙ্গে আর একটা খাঁটি প্রাণের তফাৎ কি বল? এও প্রাণ, সেও প্রাণ। তফাৎ হয়, জগতে যখন ঘোরে ফেরে, তখন ঐ ভিতরের ভোগের দরজা দেখে। তোমার আমার প্রাণে প্রাণে কিছুই ইতর বিশেষ নেই ভাই। ইতর বিশেষ পাব প্রাণে জড়ান ঐ ভোগের ভিতরের 'ইন্দ্রিয়'গুলার পরিচয়

পেলে। আমার ভোগের ধারা আর তোমার ভোগের ধারার তফাৎ হয় ঐ ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলার ঝোঁকের তফাতে। তোমার বুদ্ধি, তোমার মমতা, তোমার মন, যে পথে যায়, আমার সে পথে যায় না। ভোগে ভোগে তোমার ভিতরে যে ভাব জ'ন্মেছে, আমার সে ভাব জন্মায় নি, অন্য ভাব জ'ন্মেছে। তুমি ভোগে যে সুখ দুঃখ ভাব, তুমি যে ভোগ আপনার ক'রতে চাও, তুমি যাতে মন বসাতে চাও, আমি সে রকম ক'রিনে, ক'রতে পারিনে। প্রাণের সঙ্গে বাঁধা এই ইন্দ্রিয়গুলা জগতের সম্বন্ধে একটা মরণের প্রাণ যেন তৈয়ারি ক'রে তোলে। জগতে যত বারই ঘোর ফের মরণের এই প্রাণটাই তোমার ভোগের প্রাণ হ'য়ে থাকবে। একটা ভোগের দেহ ছেড়ে তুমি আর একটা ভোগের দেহে ঢুকবে, আর মরণের ঐ প্রাণ, ভোগের প্রাণ, তোমার সঙ্গে যাবে। ওটাও যতদিন, সংসারের ভোগও ততদিন। যখন বলি প্রাণ ম'রেছে তখন এই প্রাণটা স'রেছে, স'রে আর একটা দেহ ধ'রে, মানুষ হ'ক, জন্তু হ'ক, গাছ পালা হ'ক, হ'য়ে জগতে ঘুরে আসতে যাচ্চে।

খাঁটি প্রাণটাত অমর বটেই, এই মরণের প্রাণটাও তাহ'লে যখন ম'ল ব'লে ভাবি তখনও ঠিক মরে না, দেহের অদল বদল করে এই মাত্র। কোন সময়ে যদি খাঁটি প্রাণ,নিজের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে, তখন এই মিথ্যা ছোট প্রাণটা খ'সে যাবে বটে। যতক্ষণ তা না হবে ততক্ষণ কিন্তু এটা প্রাণের দোসর। জগতের হিসাবে এইটাই প্রাণ। এটার একবারে মরণ যবে হয় হোক, সোজাসুজি দেহের ফেরে যে মরণটা, সেটা যখন এর ঘটে, তখন সেটা কেন ঘটে, আর কেমন ক'রেই বা ঘটে ? কেন ঘটে ? ভোগ ফুরলেই ঘটে একথা আর বলবার দরকার হয় কি ? কিন্তু কেমন ক'রে ঘটে এই কথাটা নিয়েই বড় গোল। যতই গোল হ'ক একটা কথা বেশ বলা চলে। মিথ্যে প্রাণ, ছোট প্রাণটাকে, যেটা বয়, যাকে ধ'রে জগতে ঐ প্রাণ চলাচল করে, সেই প্রাণবায়ুটা জগতের প্রাণবায়ুর কোলে মিশিয়ে যায়, যে স্রোতে ধ'রে রেখেছিল,

সেই খণ্ড স্রোত ভেঙে গিয়ে আপনহারা হয়। যারা এই বায়ুকে বাঁধতে পারে তারা ইচ্ছে না হ'লে মরে না। যোগীরে নাকি এটা পারে, তাই তাদের মরণ তাদের ইচ্ছেয়, তাদের ভোগ আর ভোগের দেহ তাদের মত নিয়েই থাকে যায়।

জগতের প্রাণবায়ুর বড় স্রোত, জগতের প্রাণকে যে মহাবায়ু ধ'রে রেখেছে তার ' সেই স্রোত, এদিকে ওদিকে অগুণতি ছোট ছোট ঢেউ তুলে অগুণতি জীবকে তুলছে আর নামাচ্চে। একটা ঢেউয়ের ওপর থেকে খ'সে এসে জীব আর একটা ছোট ঢেউয়ের ওপর এসে ভাসছে। এ ঢেউ চারিদিকে, এর বুঝি বিরামও নেই। ছোট ছোট প্রাণগুলা, নকল প্রাণগুলা, ভাঙানি গড়ানির ঢেউয়ে প'ড়ে বোধ হয় যেন অনন্ত স্রোতেই ভাসতে থাকে। আসল প্রাণ সমস্তই কিন্তু এ স্রোতের জলে ডুবতে উঠতে আসেনা। এ স্রোত আসল প্রাণকে ছুঁতেই পারে না। যে সব জুড়ে থাকে তাকে বইবে কে? তাকে আবার এখানে ওখানে নিয়ে যাবে কে?

নকল নিয়ে জগতে এসে খেলা ধূলা ক'ল্লেও প্রাণ জগতের বাইরেও আছে, জগৎ ছেড়েও আছে। জগৎ জুড়ে আছে, জগৎ ছাড়া যা তাও সব জুড়ে আছে। জগৎ জুড়ে আছে ব'লে নকল প্রাণ সব জগৎটাকে আপনার ক'রতে প্রাণে প্রাণে চায়। মরণের হিড়িকে পেরে ওঠেনা। মরণের হাত এড়াতে পারলে, মরণের দেশের ওপরে নিজেকে একবার বসাতে পারলে, সে আর সব প্রাণকেই আপনার ক'রে নেবে। তখন আর তাকে বাধা দেওয়া যায় না, যাবে না। মরণের ওদিকে সব প্রাণই 'পরিপূর্ণ', 'পূর্ণ' 'পুরুষেরই' এক একটা ভাব। সব পূর্ণ হ'লেও সবাইকের থাকবার বাধা হয় না। প্রাণের ভাবের আয়তন নেই, আপনাআপনিই 'অসীম'। সব প্রাণই সব প্রাণকে নিয়ে পূর্ণ। খাঁটি প্রাণ খণ্ড খণ্ড হয় না। দেশ কাল খাঁটি প্রাণের নকল করবার ধারা, খাঁটি প্রাণকে ধ'রতে তারা পারে না। জগতের লীলা খেলার বিশেষের স্রোতে দেশ কাল ভেসে ওঠে। জগৎ ছাড়িয়ে ও স্রোত বয় না।

অমর পুরুষের অধিকারে কেউ কারও অজানা নেই, সবাই সবাইকের জানা, কেননা সব প্রাণই সব প্রাণের কাছে। সাজান গোজানর হেরফের সেখানে হয় না, হ'তে পারে না। কেন না একটাও অপরটা থেকে দূরে নেই। জগতে যা নিয়ে বিচ্ছেদ ঘটে তা সেখানে হ'তে পায় না। দুঃখ শোক সেখানে থাকবে কি ক'রে? এইটা আমার হ'ল এভাব আর সেখানে প্রাণে ওঠবার দরকার হয় না,' সবাই সবাইয়েতে আছে, সবাইকের হ'য়েই আছে। এদিকে মন দিই ওদিকে মন দোব না, এ আর প্রাণের দেশে হবার জো নেই, সবাইকের মন সবাইকের ওপর প'ড়েই আছে। এ ক'রব ও ক'রব তাও বলবার এখানে অবসর নেই, কেন না নূতন করবার কিছু নেই। সুখ না পেয়ে সুখ খুঁজতে এখানে হয় না, কেন না প্রাণের যে প্রীতিতে সুখ, অপরকে নিয়ে পূর্ণ হ'তে পেরেছি ভেবে সুখ, সে সুখ সেখানে অখণ্ড ভাবেই থাকবে। অমর লোকে অমর পুরুষের বুদ্ধি মমতা মন ইন্দ্রিয় দেহ, সবই প্রাণ দিয়েই গড়া, প্রাণেই সে বোঝে, প্রাণেই সে আমার আমার বলে, প্রাণেই সে ঝোঁকে, প্রাণেই সে করে, তার ভোগটা সবই প্রাণ নিয়ে।' তার ভোগের কিছুই ছোট নয়, কিছুই দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। তার সব ভোগ সকল অবস্থাতেই। তার অবস্থার ফেরফারও তার প্রাণেরই রকম বদলান মাত্র। ভাই সব কর্ম্ম ফেলে এই প্রাণের খোঁজ আগে লও। বেশী খুঁজে একে বের ক'রতে হবে না। তোমার কাছেই আছে, তুমি চিনে নিতে পারলেই হ'ল। তুমি দেখেও দেখছ না ব'লে তোমায় সংসারের বিড়ম্বনা ভোগ ক'রতে হয়। একবার দেখলে আর ছাড়বে না। দেখবে কি ?

মানুষের প্রাণ

আসল প্রাণ, নকল প্রাণের ওপরে খাঁটি প্রাণ, যেখানেই থাকুক যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাকে কোনও দিকে, কোনও রকমে আটকান যায় না। সে যা ক'রতে যায়, তার সে কাজে বাধা দেবে কে? তার জানবার যা তা সে জানবেই জানবে। তার সুখের পথে কেউ কাঁটা দিতে পারবে না। সে যা ঠিক ক'রবে তা ঠিক ক'রবেই। সে যাকে আপনার ক'রবে, সে তার আপনার হবেই হবে। তার যে দিকে মন যাবে, তার সে সংকল্পে কোন বিঘ্নই হয় না, হবার কোন সম্ভবই নেই। ফল সে স্বাধীন, সে 'ইচ্ছাময়'। খোলা প্রাণে সব রকম খেলাই সে খেলতে পারে, খেলেও থাকে। ইচ্ছা ক'রে নিজেকে যদি সে বাঁধতে চায় ত বাঁধবেই, আর সে বাঁধনে তার যাবে আসবেই বা কি? নূতন নূতন সাজ সজ্জার দিকে তার মন যদি যায় ত গেল গেলই। নূতন নূতন ভাবে নানা রকম ঢঙে নিজেকে জাহির ক'রতে তার ঝোঁক হ'লে, সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঢঙের কাজ আরম্ভ হবে। যা নিয়ে সাজ গোজ, যা নিয়ে বাঁধা গোঁধা, যা নিয়ে ভাঙা গড়া, সে সব তাকে খুঁজে আনতে হবে না। তার কাছেই সব, তার হাতেই সব। যত কিছু লীলা খেলা সবই ত প্রাণ নিয়ে, প্রাণ প্রাণেরই, একথা কি আর বোঝাতে হবে? লীলা খেলা ক'রতে গিয়ে লীলা খেলার যে সব ধারা সে সব ধারা আপনাআপনিই বাইতে থাকবে। জীব নিয়েই প্রাণের ঢঙ্, ঢাঙ্, সাজ গোজ, যত কিছু অভিনয়। যাত্রার নটের মত প্রাণ জীব হ'য়ে হাজার হাজার জীবের সঙ্গে দল বেঁধে, খেলা খেলতে, খেলা দেখাবার জন্যে, আসরে নাবে। এক একটা খেলার বায়না মত খেলা খেলে, আবার খেলার বায়না নিয়ে খেলতে যায়। প্রাণের এ 'যাত্রা' কবে থেকে আরম্ভ হয় তার খবর নেবার বড় দরকার হয় না।

যখন যে প্রাণে এ যাত্রা আরম্ভ হয় তখনই তার স্বাধীন ইচ্ছেতেই হয়। ভাঙ্গাগড়ার ভোগে তার যা কিছু দুর্ভোগ ঘটে সে সব তার সাধের কাজল। ইচ্ছে ক'রে নাচতে গাইতে সেজে গুজে বেরিয়েছে, তার হিড়িকে যা হবার, যা হওয়া উচিত, সে সব না হবে কেন?

হঠাৎ তোমার ভাই মনে উঠতে পারে এ ত বড় আশ্চর্য্যের কথা, ইচ্ছে ক'রে প্রাণ ফাঁস গলায় দেয়? নিজের সুখ ছেড়ে দুঃখ সে ডেকে আনবে? যার সব জানা সে আপনা আপনি মোহে প'ড়ে এটা জানতে হবে, ওটা জানতে হবে, ব'লে ছুটে বেড়াবে? যার অমনিই মরণ নেই, যে শুধুই জীবন, সে মরণের স্রোতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়বে, প'ড়ে হাবু ডুবু খাবে, খেয়ে বাঁচাও বাঁচাও ব'লে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে? সংসারের যাত্রায় ঢুকলে এসব বিড়ম্বনার হাত থেকে কিছুতেই ত ছিনিয়ে যেতে কেউ পারে ব'লে দেখা যায় না। কাজেই ব'লতে হবে যে ইচ্ছে ক'রে প্রাণ বিড়ম্বনাতে প'ড়বে। কথাটা সত্যি বটে, কিন্তু যে টুকু ভাবছ, সেই টুকুই ভাই এ বিড়ম্বনার পূরাপূরি রহস্য নয়। ভিতরের কথাটা ভাবলেএ বিড়ম্বনা ত আর বিড়ম্বনা ব'লে মনেই হবে না। কথাটা কি ভাববে ভাই? ঐ যে ভাই প্রাণের যাত্রার সাজে দুঃখের কান্না, সে কান্নাটা কি প্রাণের আসল কান্না? ঐ যে জানিনে জানিনে ব'লে নেকা সাজছে, সত্যিই কি সে জানেনা? ঐ যে আজ ম'রছে, কাল আবার আর একটা দেহ নিয়ে বেঁচে উঠছে, ও মরণটা কি সত্যিকেরের মরণ? ও সবই ভাই অভিনয়ের খেলার সাজা কান্না, সাজা বোকামি, সাজা মরণ। সুখের খেলাতেই ভাই দুঃখের ভান, জানার খেলাতেই না জানার ছল, বাঁচনের খেলাতেই কপট মরণ। নট যখন কেঁদে রোয়ারুয়ি করে তখন কি ভাই বুঝনা যে সে দুঃখেরই আমোদটা ভোগ করে? রঙ্গেতে যখন যে বোকচাঁদের মত হাবা গোবা হয়, ভিতরে কি তার জ্ঞান তখন টনটনে নয়? প্রাণ গেল ব'লে যখন যে ধড়াস ক'রে পড়ে, তখন বেঁচে বেঁচেই সে মরণ দেখায় না ত কি সত্যিই ম'রেছে ব'লে মনে কর? জগতের মজাটাই এই, জীবলীলার ঢঙ্‌টাই এই, যে দুঃখের ধারায় সুখ

পেতে হবে, ম'রে ম'রে প্রাণযাত্রা চালিয়ে যেতে হবে। নকল প্রাণের সবই নকল, আসল কোনটাই নয়। আসলই কিন্তু সব রকম নকল করে এটাও যেন ভুলনা ভাই। এটা মনে প্রাণে গেঁথে রাখলে আর প্রাণের 'জীবলীলা' 'মর্ত্ত্যলীলা' বিড়ম্বনা ব'লে ভাবলেও, গূঢ় রহস্য বুঝতে তোমার দেরী হবে না।

প্রাণ এ সব নকল করে কি রকম ক'রে জানত ভাই? করে ইচ্ছে ক'রে খেলা খেলতে এসে নিজেকে সকল রকমে ছোট ক'রে আসলের ছোট নকল ক'রে তুলে। যে এক সময়ে সব বোঝে, সে একটা বুঝে খেলা করে। যার এক সময়ে সব, 'আপনার' খেলায় তার এক সময়ে 'আপনার' পরিসর খুব ছোট ক'রে নেয়। এক সময়ে সব দিকেই যার মন যাবার কথা,তার মন খেলতে গিয়ে একদিকে বৈ অন্য দিকে যায় না। 'বুদ্ধি' 'মমতা' 'মনের' আকার খর্ব্ব ক'রে নিয়ে প্রাণ ছোট প্রাণ সেজে ঐ ছোট 'অন্তঃকরণ' বা ছোট 'জীবের প্রাণ'কে আপনি ব'লে প্রকাশ ক'রে, বিড়ম্বনার বাঁধনে নিজেকে বাঁধে। দুর্ভোগগুলার কাজেই এই নকল প্রাণের ওপর দিয়েই ভোগ হ'য়ে যায়। আসল প্রাণের দিক্ দিয়েও এরা ঘেঁসে না। সে যেমন পূর্ণ তেমনিই থাকে। দুঃখের ছলাটাকে সে ছলনা ব'লেই নেয়। অজ্ঞানের ভাণ ভাণ ব'লেই দেখে। মিথ্যে মরণ তার কাছে মিথ্যেই থাকে। নকল ভোগের মধ্যে, সুখের জন্যেই দুঃখ, জ্ঞানের জন্যেই মোহ, বাঁচার জন্যেই মরা। জীব জগতের যা কিছু ভাঙা গড়া অবিরাম চলছে, সে সবই নকল প্রাণের নকল ভোগে। ঐ ভাঙা গড়াতেই জন্মমৃত্যু, জ্ঞান, মোহ, সুখ, দুঃখ। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা গড়ার আড়ালে, জন্মমৃত্যুর ভিতরে অখণ্ড জীবন, জ্ঞান মোহের ভিতরে অখণ্ড জ্ঞান, সুখ দুঃখের ভিতরে অখণ্ড সুখ। দুর্ভোগের জগতে উল্টা পথেই সব ভোগ হয়। বাঁচতে বাঁচতে, ম'লাম, ম'রে গেলাম শব্দ সকলেরই মুখে। জান্‌তে গিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম এ দাবী কেউ করে না। সুখের তল্লাসে বেরিয়ে সুখসংগ্রহ করবার কণ্টকটা কে না মানবে? যা থাকে না তাই হয় ব'লে মনে হয়, যা জানা

নেই তাই জানবার চেষ্টা হয়, সুখের অভাব অনুভব ক'রে সুখ পেতেই সবাই চায়। সোজা পথে তাহলে আর এখানে প্রাণের ধারাগুলা বয় কৈ? যা আছে তাই থাকে, তাই থাকবে, এটা হ'ল আসল প্রাণের আসল নিয়ম, নকলে যা নেই তাই হয়, যা হয় তা থাকে না। বিড়ম্বনার গতিকই এই।

জীবজগতে নকলের এ দুর্ভোগ কাকে নিয়ে আরম্ভ হয় আর কেমন ক'রেই বা হয়, এ কৌতূহলটা মনে সহজেই ওঠে, ওঠবারই কথা। কাকে নিয়ে আরম্ভ হয় এ কথাটার উত্তর দিতে বড় কষ্ট হয় না, কেননা দেখতেই পাওয়া যায় 'মানুষ'কেই এই দুর্ভোগের বোঝা মাথায় ক'রে ঘুরতে হয়। ভোগের ইচ্ছে মনে জেগে উঠলে, প্রাণ ভোগে মন দিলে, প্রাণ তখন আমি ভোগ ক'রব বলে মেনে নিলে, মনের প্রাণ, ভোগের কাজে মন দেবার প্রাণ হ'য়ে দাঁড়ায়, তারপর তার কাজের ধারা, ভোগের ধারা ব'ইতে সুরু হয়, এই অবস্থায় সেই প্রাণকেই 'মানুষ' বলা হয়। ঐ যে বলে মনুর সন্তান মানুষ, সে এই অর্থ ধ'রে নিয়েই। মননের প্রাণই মনু, আর কেউ নয়।

বুদ্ধি নিয়ে, মমতা নিয়ে, নিজের ইচ্ছেয় ভোগে মন দিতে যে জীব পারে সে মানুষই। অন্য জীব ভোগ করে করুক, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় স্বাধীন প্রাণে কিছু ক'রছি ব'লে ভাববার অধিকার আর কারুরই নেই। ছোট হ'য়ে গিয়ে যা ইচ্ছে ক'রতে মানুষ পারে না বটে, যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারি আর ক'রব এ ভাবটা মানুষের মনে সদাই জাগে। আমি যদি না ইচ্ছে করি ত ভোগ হবে না, এটা আর কেউ প্রাণে প্রাণে ব'লতে পারে না। ইচ্ছে হ'লে তবে ক'রব এটা খোলাখোলি ভাবে মানুষের জীবনেই আছে, অন্য কারুর জীবনে নেই। ভোগের কাজের জন্য পূরাপূরি দায়ী জীবজগতে এক মানুষই বৈ কেউ নয়। একবার তার ভোগের কাজ সুরু হ'লেই দুর্ভোগেরও আরম্ভ হয়। কাজের ফল, প্রতি কাজের সুখ দুঃখ, তার নকল প্রাণে গেঁথে যায়। ঐ সুখদুঃখের তাড়নায় আবার কাজ, আবার সুখ দুঃখ, এই রকম ভোগ থেকে

ভোগ, আবার ভোগ, তারপর ভোগ, তার পর ভোগ, এই অবিরাম ভোগের খেলা। কাজের ফল সুখ দুঃখই তার মনের 'বাসনায়', মনের 'ইচ্ছেয়' দাঁড়িয়ে যায়। ইচ্ছের আগেকার স্বাধীন ভাবের সঙ্গে এই এক পরাধীন ভাব জোটে। প্রাণের শুধু খেয়ালে না ক'রে ঐ সুখ দুঃখের বাসনার তাড়ায় কাজে ছুটতে হয়। তখনও কিন্তু নিজের ইচ্ছেতেই ক'রছি এ ভাবটা, প্রাণের এই নিজের ভাবটা, ঐ পরাধীন ইচ্ছের আড়ালেই থাকে। নকল প্রাণের নকল ভোগে পরাধীন ইচ্ছেরই প্রায় পূরাপূরি প্রভাব হ'লেও নকলের মাথার ওপর আসলের অধিকারটাও ঘুচে যায় না। নকলটা যদি নকল ব'লে আবার ধ'রতে কখন চায় ত তখন ঐ নকলের পরাধীন ভাবটাও খ'সে যাবে, স্বাধীন প্রাণ তখন আবার স্বাধীন হবে। ফল, মোটের উপর ভোগের আরম্ভ হ'লেই মানুষ কাজের ফলের হাতে প'ড়ল। ভোগের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ কাজের ফলই মানুষকে ভোগাবে। নকল প্রাণে যেমন বাসনা উঠবে তেমনি ভোগের মত দেহ নিতে হবে। মানুষ হ'তেই অন্য জীব হয়। চিরকাল যে লোকের হিংসায় জীবন-যাত্রা চালিয়েছে, সে দেহ ব'দলে খুনে জীব ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে কি? যে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার কাজ জীবনে করেনি, সে 'জড়' গাছ পালাই হবে বৈ আর কি হবে? সকলের সুখ যে খুঁজেছে, সবাইকের ভাল ক'রতে ক'রতে যার জীবন গেছে, সে সুখের দেহ, দেবতার দেহ পাবেই ত। মানুষের এক জীবনের ভোগের বাসনাগুলা নিজেরা রকমে রকমে ভাগ হ'য়ে এক মানুষ থেকে, সেই মানুষের নকল প্রাণ নিয়ে, কত কত জীবের পরে পরে জন্মের কারণ হ'তে পারে। এক রকম মোটামুটি অন্ধ ভাবে, বুদ্ধি মমতা মনের স্বাধীন পরিচয় না দিয়ে ঐ সব জীবনগুলা কাটিয়ে, আবার মানুষ মানুষই হবে। এই রকম জীবজগতে এক মানুষের কত যাতায়াত যে হ'তে থাকে তা কে ব'লতে পারে? ইতিমধ্যে প্রাণ যদি নিজেকে চিনে নিতে পারে তবেই মঙ্গল, নইলে নকল কষ্টের আর অবসান হবে না। কাজের ফলে মানুষ যদি

সুখের ফলের অধিকারী হয়, ভাল ভোগের দেহ পেতে পারে, তবে মানুষ সুখের ভোগের রাজ্যে যেতে পারে যাক, তবু কিন্তু ভোগের শেষে তাকে প্রায় ফিরতেই হয়। দেবতার খেলা খেলতে পেলেও মানুষ স্বাধীন ভাব ফিরে পায় না। মানুষ হ'লে স্বাধীন ভাবের আভাস পাবে, নকল ছাড়তে পারলে, নকলকে নকল বুঝে আসলে প্রাণ তুললে, তখন অধীনতার হাত হ'তে পূরো 'মুক্তি' পাবে। যতদিন জগতে ছোট ক'রে নিজেকে ঘুরবে, ততদিন 'মানুষ' সকল অবস্থাতেই ভিতরে মানুষ থেকে মানুষের ভোগই ভুগবে। গাছ পালাতেও মানুষ, দেবতাতেও মানুষ। মানুষ ছাড়া এই হিসাবে কিছুই নেই। নকলের অধিকার যতটা, মানুষের অধিকারও ততটা। গোড়ায় নকলের ভেদে সব ভেদ।

জীব জগতের, ভোগের জগতের, নকল প্রাণের অধিকারের মানুষই তা হলে কেন্দ্র, মানুষকে ধ'রেই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। আমার ইচ্ছে হ'য়েছে ভোগ ক'রব, এই সিদ্ধান্ত ক'রে প্রাণ মানুষ হয়, হ'য়ে নকল হ'য়ে প'ড়লেও ঐ ইচ্ছামত করবার অধিকারটা মানুষেতেই থেকে যায়। ভোগের সঙ্গে নানা রকম সুখ দুঃখের পরিচয় হ'লে, কি ক'রলে সুখ পাব, কি করলে দুঃখ পাব, এই রকম ক'রে বিচার ক'রে, বিবেচনা ক'রে, মানুষকে ইচ্ছেমত কাজ ক'র্ত্তে হয়। ভোগের বিষয়ে নিজের ইচ্ছেয় বিচার বিবেচনা ক'রে সিদ্ধান্ত করবার অধিকার মানুষ ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে পারে না, থাকবার দরকার হয় না। মানুষের কর্ম্মফল নিয়েই যাদের জন্ম আর জীবন, সেই ভোগটা ছাড়া নিজের কর্ম্মের ফল যাদের নেই, তাদের আর স্বইচ্ছেয় বিচার বিবেচনা সিদ্ধান্ত ক'রতে হবে কেন? আগেকার কাজের ফলের তাড়নায় সেই সেই বাসনার মাত্র বাঁধনে আর আর সব জীব কাজ করে, ভোগ করে; নিজের নিজের কাজের ফলে নূতন নূতন বাসনা তাদের নেই, কাজেই আর তার তাড়ায় নূতন কাজ নূতন ভোগ তাদের ক'রতে বা ভুগতে হয় না। জীব জগৎটা এই রকম ভাবেই সাজান। যখন শুনি অমুক জীব অমুক বুঝে অমুক ফল পাওয়ার জন্যে অমুক কাজে মন দিয়েছে,

তখন সেটা ভোগের ধারাটা মানুষের প্রাণে যেমন সেই রকম বোঝাবার জন্যেই বলা হয়। আপনার মনেই আমরা জগৎ দেখি। আসল স্বাধীন বিচার, পূরাপূরি বিচার, আর তার সঙ্গে 'কর্ম্মফলের' মমতায় কাজে মন দেওয়া, এ রকম ভোগ, নিজের ইচ্ছেমত ভোগ, ছোট বড় আর কোন জীবেই থাকতে পারে না। আপনিই ভোগের বাসনা জেগে ওঠায়, এই রকম কিছু ক'রতে হবে, ঠিক ক'রে অন্য জীব কাজ করে। বুদ্ধির সঙ্গে মমতা, মনের অভিনিবেশ, যেমন হবার কথা তেমনই হয়। মানুষে আর অন্য জীবে আসল ফারাক হ'চ্ছে স্বাধীন ইচ্ছে নিয়ে। মানুষের চেয়ে বড় জীব যারা, তাদেরও স্বাধীন ইচ্ছেটুকু নেই, আগের কাজের ফলে কাজের ফলের বাসনাই তাদের সর্ব্বস্ব, সেই ইচ্ছেই ইচ্ছে। ভোগে প'ড়ে মানুষেরও বাসনাই প্রায় সর্ব্বস্ব হ'য়ে দাঁড়ালেও তার ওপর তার স্বাধীন ভাবটা জেগে থাকেই থাকে। স্বাধীন ইচ্ছের ভোগে ঢুকে প্রাণ মানুষ, মানুষের সঞ্চিত বাসনার ভোগে ঢুকে প্রাণ অন্য জীব। গোড়ায় অন্য জীব 'মানুষের' খেয়ালে।

জীবজগতের প্রাণে প্রাণে এমনি সব জায়গায় মানুষ থাকলেও, স্বাধীন হিসাবে মানুষ ভোগের জগতে বড় হ'লেও, ভোগের শক্তিতে, সুখ ভোগের কমী বেশী হিসাবে, মানুষকে সকলের বড় বলা যায় না। নিজের কাজের ফলে নকল প্রাণে যে সব নকল ইচ্ছে বা বাসনা জন্মায়, সে গুলা যতটা বেশী সুখের ভোগের হবে, জীবজগতে মানুষ ততটা উঠবে, আর যতটা কম সুখের ভোগের হবে ততটা নামবে। অবশ্য এই কম বেশী ভাব দুঃখ মেশান বুঝে। সুখের সঙ্গে দুঃখের ভোগ ভাঙা-গড়ার জগতে, ভোগের জগতে, আছেই। দুঃখের ভোগের মাত্রা যার যত বেশী, তার দেহ ততটা নীচের জীবের ; যার যতটা কম তার ততটা উপরের জীবের। যে দেহে যে রকম সুখ দুঃখ ভোগ হওয়া উচিত, সে দেহ সেই রকমেই গড়া হয়। সুখ ভোগের অধিকারটা, সেই শক্তিটা, কম আছে, যেখানে ভাঙ্গাগড়ার শক্তির প্রভাব বেশী, আর সেই শক্তিটে বেশী আছে, যেখানে ভাঙ্গা গড়ার শক্তির প্রভাব কম।

যত ভাঙন গড়নের হাঙ্গাম ততই দুঃখের উৎপাত, যতই তার দৌরাত্ম্য কম ততই সুখের ভোগ। কাজেই বলা যেতে পারে, বাঁচবার শক্তি, প্রাণের ভোগের শক্তি, যার বড় সে বড় জীব, যার ছোট সে ছোট জীব। বাঁচাই সুখ, মরণই দুঃখ। বোঝবার শক্তিও বাঁচনের শক্তিরই যখন একটা ধারা মাত্র, তখন এমন কথাও বলা যায় যে যে যত বেশী বোঝে সে তত বড়, যে যত কম বোঝে সে তত ছোট। এই রকমে প্রাণের শক্তি, জীব শক্তি ধ'রে জীব জগতে বড় বা ছোট। "যেগুলার প্রাণ নেই ব'লে মনে হয়, সেগুলার এই জীব-শক্তির অধিকার খুবই কম, গাছ পালায়, অচল জীবগুলায়, তার চেয়ে একটু বেশী, হিলি বিলি ক'রে বেড়ায় যেসব সাপ টিকটিকি গিরগিটে, তাদের ভিতর তার চেয়েও একটু, উড়ে বেড়ায় ফরিঙ্‌গুলা কি কাগ চিলগুলা, তাদের আরও একটু, ক্রমে মৃগ পশু, মানুষ, ওপরে নাগ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ আর আর দেবতা এই সবে বেশী বেশী মাত্রা"। মানুষের প্রাণ ভোগের অধিকারে এসে এই রকমে সারা ব্রহ্মাণ্ডটা নিজের চেয়ে ছোটয় আর বড়য় সাজিয়ে তোলে। মানুষের প্রাণই কিন্তু সব জুড়ে থাকে। জীবজগৎকে যে আপনার ব'লে না ভাবে সে মস্ত ভুল করে। জীব জগতের যেখানে যাকে মারবে সেই খানেই নরহত্যা হবে। এই সোজা কথাটা মনে ক'রে না রাখতে পারলে প্রাণের মায়া মমতা পরিসর বাড়াতে পারা যায় না। এটা যতই জাগিয়ে তোলা যায় প্রাণ ততই বড় হ'তে থাকে।

বড় হবার প্রবৃত্তিটে জীব জগতের যে সবটা জুড়ে, এটা একবার জীব জগতের গড়নটা ভাবলেই বেশ বোঝা যায়। সারা ব্রহ্মাণ্ডটা যার দেহ সেই একটা মস্ত জীব। বলতে পার সেটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ দেবতা, কি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণমানুষ। যত জীব, জীবদেহ, সবই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সব নিয়ে মস্ত বড় সেই ভোগের মানুষ, ব্রহ্মাণ্ডমানুষ, ব্রহ্মাণ্ডের ভোগ ভোগ করে। তার মধ্যে তার দেহের প্রতিজীবে এই রকম এক একটা ছোট ছোট ব্রহ্মাণ্ড। এই রকম সারা জগতে ছোট, ছোটর

ভিতরে ছোট, তার ভিতরে ছোট, ক্রমে ক্রমে ছোটর ছোট ব্রহ্মাণ্ডই সাজান। এমন জীব দেখা যায় না যে নিজে একটা ছোট খাট 'ব্রহ্মাণ্ড' জুড়ে নিয়ে তার মধ্যে খেলা ধূলা ক'রছে না। মানুষের দেহের এক একটা রক্তের কণায় কত কত জীব, আর সেই সেই জীবে তাদের নিজের মত 'ব্রহ্মাণ্ড দেহ'। এ যেন ব্রহ্মাণ্ডের ওপর ওপর ধারা ধ'রে ক্রমে বড় ব্রহ্মাণ্ড। সবই ব্রহ্ম, কাজেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ড না থাকবে কেন? বড় না হ'য়ে কেউ থাকতে চায় না, বুঝি পারেও না। বড়র বড় থাক, নিজের কাছে নিজে সবাই বড়। শুধু তাই নয়। সবাই প্রাণে মহাপ্রাণের ধারা। সবাই বড়র বড়র ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্ম হ'তে আশা রাখে। আজ যে অতি ছোট কীটমাত্র, কালের পরিপাকে, সে মানুষ হ'য়ে, জ্ঞানের পরিপাকে আপনাকে খাঁটি বুঝতে পেয়ে, সে একদিন বড় ব্রহ্মাণ্ডের হ'লেও হতে পারে। মরণের জগতে কেউ ত চিরকাল এক থাকে না। আজকের জগৎ একদিন ম'রবে। আজকের ব্রহ্ম আর এক দিন বদলাবে। আর একটা জীবের ভোগের প্রাণ নিয়ে তখন বড়ব্রহ্মাণ্ডের বড় ব্রহ্মের ভোগ আরম্ভ হবে। আসল কথা মহাপ্রাণই খাঁটি ব্রহ্ম, তাতেই খাঁটি ব্রহ্মশক্তি। তার সঙ্গে তফাৎ করবার জন্যে বড়ব্রহ্মাণ্ডের ভোগের বড় ব্রহ্মকে 'ব্রহ্মা' বলা হয়। জীবের প্রাণের প্রাণ ধ'রে কিন্তু সবই ব্রহ্ম। যেখানে ব্রহ্ম, সেই খানেই বিষ্ণু, সেই খানেই শিব।

জীবকে শুধু মানুষ ব'লে আপনার ভাবতেই বা বলি কেন? ভাল ক'রে দেখলে জীব মানুষেরও ওপরে। ভোগে ঢুকে নকল প্রাণেই না সে ছোট হ'য়ে থাকে। আসল প্রাণটাও তার সঙ্গে সঙ্গেই ত অতর্কিত ভাবে র'য়েছে। মানুষ হ'য়ে ইচ্ছে ক'রে অধীনতার ফাঁস গলায় দিয়ে, নকল প্রাণ তৈয়ারী ক'রে নিয়ে, শেষে ঐ নকল প্রাণকে পূরাদস্তুর পরাধীন ক'রে ছাড়ে। যাই করুক খেলাটা নিজেই প্রাণ খেলে, আর আপনি আপনার ভিতরে বোঝে যে খেলছে বৈ আর কিছু ক'রছে না। ছোটর ওপরে সে অতি বড় 'ব্রহ্ম'। জীবের দেহে আজ এখানে কাল সেখানে, আজ আছে কাল নেই, হ'লেও আপনার আসল

অবস্থায় দেশ কালের ওপরে, সব দেশকাল জুড়ে সে 'বিষ্ণু'। ভাঙা-গড়ার শাসনে প'ড়ে মরে বেঁচে মর জগতে এ জীব ওজীব হ'য়ে যতই ঘুরুক ফিরুক না কেন, নিজে সে 'মৃতুঞ্জয়,' মরা বাঁচার অমঙ্গলের অতীত 'শিব'। মানুষ হ'য়েও মানুষ নিজের আসল তত্ত্বে 'পরব্রহ্ম' 'বিষ্ণু' ও 'শিব'। জীব হ'য়েও মানুষ ঐ চরম দেবতা। মানুষকে, জীবকে, ভাই, তাহ'লে পরম আত্মীয় অথচ প্রাণের পূজার জিনিষ ভাববে না কেন ? যদি না ভাব তোমার সেটা বিবেচনার দোষ। এই ভেবে জগতে যদি কাজ ক'রতে পার ত সুবুদ্ধির কাজ ক'রবে। নইলে যা ক'রবে তা নির্ব্বোধের মত করা হবে। কেউ কোথাও তোমার পর নয়, কেউ কোথাও তোমার অন্য জাত নয়, কেউ কোথাও তুচ্ছ অবজ্ঞার পাত্র নয়। সব মানুষ, সব দেবতা। আসলের না খোঁজ পেলেই তুমি জীব জগতের উপর অত্যাচার অবিচার ক'রবে। আসল বুঝলে সতর্ক না হ'য়ে পারবে না। দেবতার মাথায় বাড়ী দিতে তোমার হাত কখনই এগুবে না। আপনার জনকে কখনই কষ্ট দিতে যাবে না। বুঝতে না পেরেই এসব অন্যায় অসংগত কাজ কর, নইলে কি করবার ইচ্ছে হ'তে পারে ?

প্রাণে প্রাণে জীবের প্রাণ, মানুষের প্রাণ, 'পরব্রহ্ম' 'বিষ্ণু' আর 'শিব' ব'লেই নকলেও দেবতার ছায়া এসে পড়ে। 'ব্রহ্মশক্তির' তাড়ায় বড় হবার দিকে ঝোঁক জীবের সকল অবস্থাতেই থাকে। 'বিষ্ণুশক্তির' ভাবে সমস্ত জগৎটাকে আপনার কোলগত ক'রতেই জীবের প্রাণ ব্যস্ত হয়। 'শিবশক্তিতে' ম'রতে জীব কখনই চায় না, কেবল বেঁচেই থাকতে চায়। মানুষ হ'য়ে ইচ্ছেমত কাজ করবার সুযোগ পেলেই এ সব শক্তির প্রভাবটা বেশ টের পায়, পেয়ে নিজেকে বড় ক'রতে, নিজের কাজের পরিসর বাড়াতে, নিজেকে মরণের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিতে, প্রাণে প্রাণে চায় ; কাজের গতিকে, ভোগের গতিকে, ছোট ছোট কামনার গতিকে, প্রাণের ইচ্ছেটাকে চোখের আড়াল ক'রে ফেলে, ফেলে বিড়ম্বনা ভোগ করে। যতই করুক, যাই

করুক, যত দুর্ভোগই ভোগ করুক, যখনই হাজার দেহ ঘুরে এসে আবার মানুষ হয়, আবার প্রাণে ঐ ঐ দেবতার ভাব তার স্পষ্ট জেগে ওঠে। ওলট পালটের ভিতর দিয়ে ঐ ভাবটা বজায় থাকে ব'লেই মানুষ বড় প্রাণ হবার আশা কখনও ছাড়ে না। নিজের বুদ্ধির দোষে কর্ম্মের পাকে প'ড়লেও একবারে মানুষ কখনও হতাশ হয় না। আজ যা হয় হোক কাল আমি নিজেকে শুধরে নিতে পারব, বড় ক'রতে পারব, এ বিশ্বাস কখনই মানুষের ঘুচে যায় না। একবার অধঃপাত হ'লে চিরকালের মত জাহান্নমে গেলাম মানুষ কখনই এমন ধারণা করে না। প্রাণের দেবতার আলো যতই মিট মিট করুক না, তার রেখা মানুষের চোখের সামনে থাকেই থাকে। ও আলো একবারে নেববার নয়। 'অমরের' জ্যোতি সব সময়েই, সব অবস্থাতেই, 'অমর'। একদিন তুমি বড় হবে, সবাইকে আপনার ক'রবে, ম'রতে তোমার আর তখন হবে না, এ অভয় বাণী মানুষের প্রাণের কাণে সকল সময়েই বাজছে। এ আশ্বাস, এ বিশ্বাস না থাকলে, হতাশ প্রাণে করবার ইচ্ছে, বাঁচবার ইচ্ছে, মোটেই স্থান পেত না। আশায় মানুষ বাঁচে, অন্য কিছুতেই বাঁচে না।

(৯)

প্রাণে ভক্তি

আসলের বা'র দিকে নকল রেখে, সত্যির ধারে মিথ্যে সাজিয়ে, খোলার সঙ্গে বাঁধা নিয়ে, বড়কে ধ'রে বড়র কাছে ছোট হ'য়ে, মানুষের প্রাণ ভোগের ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরতে বেড়োয়। যেখানে যখন ঘুরুক না কেন, বড় তার কাছ ছাড়া হয় না, বড় সব সময়েই তার অন্তরে লুকিয়ে

আছে। ভিতর দিকে না তাকালে তাকে দেখতে কেউ পায় না। ভাবতে পার বড় কি ক'রে ছোটর অন্তরে থাকতে পারে। যে সব জোড়া 'বিষ্ণু' সে ছোট মানুষের হৃদয়ে কেমন ক'রে গুটিয়ে সুটিয়ে এসে বসে ? একটা দৃষ্টান্ত দিলেই এটা অনেকটা বুঝবে। দেখবার গতিকে প্রকাণ্ড সূর্য্যটীকে চোখের সামনে ছোটই দেখ, বড় ত দেখ না। অন্তরের দৃষ্টিতে বড় প্রাণ অন্তরের সামনে তেমনি ছোটই দেখায়। তুমি তাকে যদি দেখ ত তোমার অন্তরের আকাশেই সে র'য়েছে ব'লে ছোটমত বোধ হবে, সে কিন্তু নিজে অনন্ত আকাশে, তোমার অন্তর দেখবার সময় নিজের ভাবে খাট ক'রে নেয়। আরও একটু ভাব। এই যে সৌর জগৎটা সবই সূর্য্যের প্রাণের ওপরেই নাকি আছে। গ্রহ উপগ্রহ যেখানে যা কিছু সূর্য্যেরই অঙ্গ, সূর্য্যেই ছিল, সৌর জগৎ সাজিয়ে সূর্য্য নিজে সব হ'য়েও তার কেন্দ্রে মূর্ত্তিমান হ'য়েই যেন ব'সে আছে। প্রাণ তেমনি নিজেকে ছ'ড়িয়ে, আবার তারই কেন্দ্র হ'য়ে, ছোটর মত আপনাকে বোঝায়। যে তার মহিমা বুঝতে পারে সে ঠিক কিন্তু ধরে যে বড়রই ঐ ছোট মূর্ত্তি। আসল কথা বিশ্বজোড়া প্রাণ নকল প্রাণের সামনেই ছোটভাবে নিজেকে ভাববার অবকাশ দিয়েও বিশ্ব-জোড়া হ'য়েই অধিষ্ঠান করে। সেই অন্তর্যামী একদিক্ দিয়ে জীব, অপর দিক্ দিয়ে ব্রহ্ম। সেই জীবব্রহ্ম নকল প্রাণের প্রাণ হ'য়ে নকলকে মরণে বাঁচিয়ে রাখে, দুঃখে সুখী রাখে, ভুল ভ্রান্তির মাঝেও সজ্ঞান রাখে। ভোগের জন্য যখন মানুষ বিচার করে, আমার আমার ব'লে ভোগের ফলে লালায়িত হয়, ভোগের দিকে মন লাগায়, ইন্দ্রিয়-গুলা দিয়ে দস্যুর মত ভোগ করে, তখন অন্তরের ঐ অন্তর্য্যামী 'হৃষীকেশ' হ'য়ে তার ঐ সব ভোগের যন্ত্র গুলা চালিয়ে দেবার শক্তি নকল প্রাণকে দেয়। নকলের সাধ্য কি যে আসলের চালনা না পেলে আপনি চলে ? সত্যের প্রাণ হৃষীকেশ মানুষের অন্তরে থেকে অন্তঃকরণকে জীবন্ত করে, তবে জীবের জীবন চ'লতে থাকে। জাজ্বল্যমান বাঁচাটাকে ত ভুল ব'লতে পারবে না, তখন বাঁচনের মূল

তোমায় মেনে নিতেই হবে। হৃষীকেশই ঐ মূল, এতে আর ভুলটি নেই।

এই অন্তর্য্যামী হৃষীকেশ সকল জীবের হৃদয়েই র'য়েছে, সকল ঘটে থেকেও আবার এক একটাতেই বিশ্বজোড়া। এটা হেঁয়ালী ব'লেই মনে হয়, কিন্তু এর ভিতর কঠিন কথা বড় নেই। যে বিশ্বজোড়া, যে ব্রহ্মাণ্ডজীবের, ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের, প্রাণ, তারই এক একটা দিক্, এক একটা ভাগ, এক একটা ধারা, এক একটা রকম, এক একটা জীবের আসল প্রাণ। এক হ'য়েও একটাই অগুণতি, অগুণতি হ'য়েও সবগুলা এক। মনে ক'রনা এটা ভুল ভ্রান্তি। এতে ভুল ভ্রান্তি কিছু নেই। এক সূর্য্য ভুলের বশে অনেক হয় বটে, কিন্তু এই এক ব্রহ্ম ভুলের বশে অনেক হয় না। এ বড় সোজা বড় ত নয়, একবারে 'অনন্ত' 'অসীম'। যা অনন্ত অসীম তাকে ভাগ ক'রলেও সে অনন্ত অসীমই থাকবে। গণিত বিদ্যা যে জানে সে একথা সহজেই বুঝবে। অনন্ত ব্রহ্ম হওয়াই 'অনন্ত' ব্রহ্মের স্বভাব। নইলে তার অনন্ত ভাব, সকলকে ছাড়িয়ে বড় হওয়ার ভাব দাঁড়াতেই পারে না। সে ভাগে ভাগে অনন্ত, সকলের যেন একটা কেন্দ্র হ'য়েও অনন্ত। অনন্ত অমর জীবনের জগতে, অনন্ত প্রাণের অধিষ্ঠান থেকে, মর-জগতের ভোগের নকল অগুণতি প্রাণ, জীবনের শক্তি নিয়ে, বাঁচা মরার খেলায়, বেঁচে থাকছে। খাঁটি জীব অনন্ত প্রাণের অংশ হ'লেও অনন্ত। প্রাণের এক ধারা হ'লেও চিরকাল থাকে। খণ্ড খণ্ড হ'লেও এর 'ব্রহ্মভাব' 'বিষ্ণুভাব' 'শিবভাব' ঘুচে যায় না। শুদ্ধ প্রাণের মহিমাই এই, রহস্যই এই। জড় জগতের নিয়ম শুদ্ধ প্রাণের জগতে খাটেনা। জড় যত বড়ই হোক না, তাকে কুচি কুচি ক'রলেই সে ছোট ছোট হ'য়ে প'ড়বে, তার আয়তন কম কম হবেই হবে। শুদ্ধ প্রাণ সদাই পূর্ণ, খণ্ডে খণ্ডেও পূর্ণ। তার এক এক অংশ, তার এক এক খণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন দিক্ দিয়ে তাকে দেখবারই এক একটা ভাব। ভাই, প্রাণের হৃষীকেশকে তাহ'লে তোমার আর একটু ছোট খাট প্রাণের দেবতা

ব'লে ভাবলে চ'লবে না। এই আসল তথ্যটুকু বুঝলে ত? এই তথ্য-টুকু বুঝে "হৃষীকেশ"কে ধ'রেই তোমায় কাজ ক'রতে হবে। না বোঝ, তোমারই বিড়ম্বনার ভোগ। বুঝলে তুমিই ধন্য হবে।

প্রাণের ভিতর লুকান এই জগৎজোড়া হৃষীকেশ, তোমার প্রাণকে প্রাণ দিয়ে, তোমায় তোমার বাঁচবার পরিচয় দেবার শক্তি দিয়েছে। তুমি সুকাজ কর, তোমার ইচ্ছেয় তুমি ঐ শক্তির ভাল ব্যবহার ক'রলে। তুমি যদি কুকাজ কর, তা হ'লেও তোমার ইচ্ছেতেই ঐ শক্তির মন্দ ব্যবহার ক'রলে। 'সু,' 'কু' তোমার হাতে, তোমার প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছের ওপর। কাজের তাড়াটা, কাজের বলটা, আর একজনার। কাজের সীমা ছোট কর, তোমার কাজ মন্দ। কাজের সীমা বড় কর ত তোমার কাজ ভাল। প্রণের জগৎ জোড়া ভাব প্রাণে পূরো জাগিয়ে সেই ভাবে কাজ ক'রলে তুমি অবশ্যই বড় হবে। বিশ্বময় প্রাণ সমস্ত বিশ্বের জন্যই তোমায় কাজ ক'রতে, বাঁচতে, ঝোঁকাবে। সেই বিশ্বময় ভাবই তোমার মঙ্গলের। সেভাব প্রাণের সকল ধারারই পক্ষে শুভ। বিশ্বময়ের ঝোঁকে কাজ আজকেও ভাল, কালকেও ভাল, চিরকালের জন্যই ভাল। সেই কাজ এরও ভাল ওরও ভাল তারও ভাল, এমন কেউ নেই যে তার ভাল না হ'য়ে মন্দ হবে। প্রাণের বিষ্ণু তোমার প্রাণের কাণে কাণে সর্ব্বদাই ব'লে দেবে, তুমি এইরকম কর, তাহ'লেই তোমার বিশ্বের প্রাণ মেনে বাঁচা হবে। বিশ্বের প্রাণ মানবার নিয়ম জানতে তোমার অন্য কোথাও যেতে হবে না, প্রাণের নিয়ম প্রাণেরই কাছে। প্রাণ সব জুড়ে, সে নিয়মও সব জুড়ে। প্রাণ 'শিব', সে নিয়মও 'শিব'। প্রাণ মরণের অতীত, সে নিয়মও মরণের অতীত। যে নিয়মে জগতের প্রাণ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জীবের প্রাণ, সেই নিয়মই প্রাণের নিয়ম। সেই নিয়মের লঙ্ঘন হ'লেই, প্রাণের লঙ্ঘন। যেখানে লঙ্ঘন, সেইখানেই প্রাণের মরণ। এক কথায় প্রাণই প্রাণের নিয়ম। প্রাণই প্রাণের কাজের আসল রীতি। বাঁচনের মন্ত্রই সমস্ত জীবের জন্য কাজের মন্ত্র। মরণের মন্ত্রই

অকাজের মন্ত্র। সমস্ত জগতের জন্য এই মন্ত্র পড়, এই মন্ত্র জপ, এই মন্ত্রই সার কর। আর সব মন্ত্র মিছে মন্ত্র। ইষ্ট মন্ত্র এই 'অমর' মন্ত্র ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। যোগ যাগ তপের মন্ত্র এই অমর মন্ত্রেরই এক একটা ভাব। এই মন্ত্রে সব কাজের আহুতি দিতে পারাই কাজ করা। এ ছাড়া বিশ্বপ্রাণকে ধ'রে রাখতে পারে, এমন 'ধর্ম্ম' নেই।

যদি ভেবে থাক নকল প্রাণ, মিছে প্রাণ, কেমন ক'রে এই অমরের ভাব ধারণ ক'রবে, তা হলে তুমি বোঝনি যে নকলও আসলেরই ঢঙ্, মিছে সত্যিরই ছায়া, মরণের জিনিষ বাঁচনেরই পথে। বাঁচবার জন্যেই জীবের মরণ দশা, হবার জন্যেই ঘুচে যাওয়া, ঠিক হ'তে গিয়েই বেঠিক হওয়া। ম'রে কে কোথায় না বেঁচেছে ? অস্থায়ী যা তা একবারে কোথায় নষ্ট হ'য়েছে ? ভোল ফিরুলেও বহুরূপী কি বহুরূপাই নয় ? মর আর বাঁচ তুমি অমরই। তোমার প্রাণ প্রাণই। তোমার প্রাণের বিষ্ণু হৃষীকেশই তোমার মূল আসল, আর তোমার ইচ্ছেয় তোমার ছোট বুদ্ধি মমতা মন জড়িয়ে হ'য়েছে এক নকল। আসল ছেড়ে ঐ নকলটা থাকতে পারে না। বুঝে আপনার ব'লে যেখানেই মন দিতে যাবে, সেইখানেই তখন প্রাণের শক্তি জেগে উঠবে। মরা বোঝেও না, আপনারও বলে না, কিছুতে মনও দেয় না। প্রাণ সব বোঝে, সব আপনার বলে, সবেতে মন দেয়। ইচ্ছে ক'রে, ছোট ক'রতে গিয়ে তুমি একটু বোঝ, একটু আপনার ভাব, একটুতে মন দাও। যাই হোক, তবু তুমি আসল ছাড়িয়ে যাও নি, যাবার শক্তিও তোমার নেই। নকলেও তুমি আসলই। আসল ব'লেই ছোট হয়েও ছোট হ'য়ে থাকতে তুমি চাও না, থাকতে তুমি পার না। এটা ওটা কতই ভাব, একে ওকে কতকেই আপনার কর, এদিকে ওদিকে কত দিকেই মন দাও। এক জীবনে পেরে ওঠ না, আবার জীবনে ওই ক'রতে থাক। পরের পর জীবনে ঐ বড় প্রাণের বড় ভাবটা জেগে থেকে, তোমায় ক্রমে ক্রমে সব প্রাণ আপনার বুঝিয়ে,

আপনার ক'রে, তুলতে চায়। তোমার কাজে অকাজে ঠিকে বেঠিকে এ ভাব কখনও যাবার নয়। এইটুকু আগে থাকতে বুঝে নাও না কেন ভাই ? গোড়া থেকেই, এখন থেকেই, নকল আসলের ধারেই র'য়েছে দেখলেই ত' ভাল হয়। তা হ'লে আর বিড়ম্বনার ভোগ হয় না। মরণের খেলা, বাঁচনেরই নকল, বুঝলে তোমার দুঃখ শোক মোহ আর থাকবে কোথায় ? নকল প্রাণ আসলের অধিকারে তুললেই সেই আসল হবে। তোমার বুদ্ধি মমতা মন সবই প্রাণ হবে। ছোট বড়র পাশে দাঁড়িয়ে বড়র আলোয় নিজের সবটা দেখতে পাবে। একটু একটু আর তাকে দেখতে হবে না।

নকল যখন আসলে এসে ঢুকবে, নকল যখন আসলে মিশে যাবে, নকল যখন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধটা পূরো মাত্রায় একবারে বুঝবে, তখন আসলের বড়ভাবটা,বিশ্বজোড়া বড়ভাবটা, আরও বড় না হ'য়ে পারবে না। যতই হোক বিশ্বের প্রাণের খেলা মরণের সঙ্গে। খাঁটি প্রাণ মরণ ছাড়িয়ে। জীবের আসল প্রাণ একবার আপনাতে ফিরে এলে আর কি শুধু মরণের দিকেই তাকিয়ে থাকবে ? তা কখনই না। প্রাণের অমর ধাম, অমর লীলা, সে তখন খুঁজবে। যে ভাবে সেই অমরভাব আছে, সেই ভাবটা বোঝবার জন্যে প্রাণ তখন তার আপনাআপনিই ঝুঁকে প'ড়বে। প্রাণ ব্রহ্ম, বড় হতেই চাবে,। বড়র ভাবে আপনাকে মেশাতেই চাবে। যে শুদ্ধ অমর প্রাণের একটী ধারা বিশ্বপ্রাণ, সেই প্রাণের অক্ষয় 'অকুণ্ঠ' ধারার ভাব নিজের প্রাণের ভিতর না জাগিয়ে, জাগন্ত প্রাণ, খোলা প্রাণ, সহজে থাকতে চাবে না। প্রাণ প্রাণের দিকে টানে পড়ে। খোলা প্রাণ আপনা হ'তেই সেই অতি বড় প্রাণের দিকে, সমস্ত শুদ্ধ প্রাণের কেন্দ্রের দিকে, টানা প'ড়তে থাকবে। ইচ্ছে ক'রে যদি প্রাণের চোক না বোজে ত সামনেই সেই পূর্ণ প্রাণ দেখতে পাবে। নিজের ছাড়া প্রাণ সেই প্রাণের দিকে আপনিই ছেড়ে দেবে। তার কি লীলা, সেই মহাপ্রাণ কি মহাভাবে বিভোর, সেইটে প্রাণের শুদ্ধ হৃদয়ে ধ'রে নেবার জন্যে তার চারিদিকে

ঘুরে বেড়াবে, তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে, সে সঙ্গ কখনও ছাড়তে চাবে না। তোমার খোলা প্রাণ সেই মহাপ্রাণেরই একটা 'বিকাশ' মাত্র, কাজেই তোমার পক্ষে এই মহাপ্রাণের ভাগ নেওয়া অতি সহজ। এ ভাগ তোমার আপনিই আছে, কেবল তোমার বুঝে নেওয়ার দরকার। খোলা প্রাণে মহাপ্রাণের এই ভাগ নেওয়ার নামই 'ভক্তি'।

এই খাঁটি ভক্তির ভাব যখনই জীবের জেগে উঠবে তখনি জীব শ্রেষ্ঠ জীবন পাবে। তখন সে ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের নিয়ম শুধু বোঝে না, তার ওপরের প্রাণের নিয়মও বোঝে। শুধু ব্রহ্মাণ্ডের জীবই তার আপনার নয়, ব্রহ্মাণ্ডের বাঁধন ছাড়া প্রাণও তার আপনার। ব্রহ্মাণ্ডের কাজেই সে মন দেয় না, মহাপ্রাণের কাজেও তার মন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের জীব, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল ব্রহ্মাণ্ডের জীব, তখন তার স্নেহ মায়ার পাত্র। আবার অমর 'বৈকুণ্ঠ' ধামের সমস্ত শুদ্ধ 'ভক্ত'ও তার সেই সঙ্গে খেলার জুঠী। মরণকে বাঁচন বুঝে, মরণের ভিতর দিয়ে বাঁচন দেখে, দুঃখকে সুখ বুঝে, দুঃখের ওপর দিকে সুখের খোঁজ পেয়ে, ভুল ভ্রান্তি জানবারই রকম বুঝে, ভুল ভ্রান্তির আড়ালে জানা হ'য়ে থাকে ভেবে, ভক্তকে আর নিজেকে আর সব প্রাণীকে অমর সুখী আর বিজ্ঞ মনে ক'রতে হয় না, খাঁটি বাঁচনের দেখা পেয়ে, খাঁটি প্রাণের সুখের পরিচয় পেয়ে, খাঁটী প্রাণের সব সন্ধান জানতে পেয়ে, ভক্ত 'সনাতন' 'নিত্যানন্দ' 'পূর্ণজ্ঞান'। প্রাণ ছেড়ে কিছু হয়নি, হবেনা, হয় না। প্রাণের রাজ্যে ব'সে প্রাণে প্রাণে শুদ্ধ প্রাণের দলে মিশে, ভক্তের কোথাও কিছু জানবারও নেই পাবারও নেই। প্রাণ সকল অবস্থায় প্রাণই জানতে চায়, প্রাণই আপনার ব'লে পেতে চায়। তাই যখন আপনা আপনি হয়, তখন আর চাই কি? পূর্ণ হ'তে হ'লে প্রাণের সঙ্গ ছাড়া আর কিসের দরকার? কিছুরই নয়। প্রাণের প্রাণেই আকর্ষণ,প্রাণেই অনুরাগ, প্রাণেই প্রীতি, প্রাণ নিয়েই পূরন্ত হওয়া, প্রাণ নিয়েই বাঁচা, প্রাণ নিয়েই জানা, প্রাণ নিয়েই সুখ পাওয়া। ভক্তির ভাগে এ সবই সব রকমে জোটে।

ভক্তির ভাবে জীবের স্বাধীন ইচ্ছের প্রাণ, ব্রহ্মশক্তি, বিষ্ণুশক্তি, শিব শক্তিতে শক্তিমন্ত প্রাণ, ব্রহ্মাণ্ডের কাজে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানে, ব্রহ্মাণ্ডের আনন্দে যখন নিজেকে সঁপে দেয়, তখন নকল প্রাণকে আসলে তুলে, আসলে মিশিয়ে, নিজেরই অন্তরের অন্তর্য্যামী ব্রহ্মশক্তি, শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তির অধিষ্ঠান, হৃষীকেশের শরণ নেয়, তাঁরই ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ডের জীবন ভোগ ক'রেও অমর জ্ঞানী ও সুখী ব'লে নিজেকে বুঝে ধন্য হয়। এই হৃষীকেশ তার প্রাণেরই এক ধারে, ঐ হৃষীকেশের এক ধারাই, এক ভাবই, এক ভাগই, তার তখন আসল প্রাণ, কাজেই তাঁর ইঙ্গিত বুঝতে ভক্তির ভাব জাগন্ত হ'লে আর তার কষ্ট পেতে হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের জীবের ভাবে 'ভক্ত' কিন্তু যাই করুক, যাই ভাবুক, অমর প্রাণের ভাবে, মহাপ্রাণের, ব্রহ্মাণ্ডের অতীত 'বৈকুণ্ঠ' প্রাণের, ভাগী-দার হিসাবে, সে ঐ হৃষীকেশকে মহাপ্রাণেরই ভাব বুঝে, প্রাণে প্রাণে তাঁরই সঙ্গ নিয়ে, পূর্ণ প্রাণে, পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ সুখে জীবন কাটায়। জীবজগতে যতদিন থাকবে ততদিন তার জীবের দেহ, পঞ্চভূতের জড় দেহ, নকল প্রাণের দেহ, তার একটা খোলসের মত থাকবে বটে, প্রাণে তার শুদ্ধ প্রাণের দেহই স্ফূর্ত্তি পাবে, পঞ্চত্ব পেলে, পাঁচভূত পাঁচ ভূতে মিশে গেলে, সেই শুদ্ধ ব্রহ্মদেহ, বিষ্ণুদেহ, শিবদেহই তার পূরা সম্বল হবে। জীবজগতে স্বইচ্ছায় যাতায়াতে ভক্তের তার পর কিছুই যাবে আসবে না। সকল অবস্থাতেই সহস্র সহস্র জীবের যোনিতে ঘুরে বেড়ালেও, মহাপ্রাণের ভাগীদার ভক্ত, হৃষীকেশ মহাপ্রাণের সামনে ছাড়া অন্য কোথাও নিজেকে দেখবে না। মানুষ, পশু, গাছ পালা, পোকা মাকড় যাই হোক না কেন, ভক্তের ভোগ মহাপ্রাণের কাজে লাগা, হৃষীকেশের সেবা। তাঁর নকল ভোগ নিজের নকল প্রাণ দিয়ে ভোগ ক'রে, তাঁরই কাজে আছি ভেবে কৃত কৃতার্থ হওয়াই ভক্তির চিহ্ন। যে কাজেই থাকি, যে ভাবেই থাকি, আমি তাঁরই, তাঁর ইঙ্গিতে ছাড়া অপরের শাসনে নেই, এইটি যখন প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারব, মেনে নিতে পারব, তখন মহাপ্রাণের ভাগের ভাগ

আমার হিস্যেয় আমি ঠিক পাব। এটা না পেলেই, মহাপ্রাণের ভাগীদার না হ'লেই, মরার দায়, যম যন্ত্রণা, আমায় পেতেই হবে। ভক্তি ছাড়া ভাই মুক্তি নেই। ভক্তিই মুক্তি, শুধু মুক্তি নয়, মুক্তির ওপর পূর্ণ জীবন,পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ।

একবার যদি প্রাণে ভক্তির স্বাদ পাও, তবে আর এ স্বাদ ভুলতে পারবে না, ছাড়তে পারবে না ভাই। প্রাণ পেয়ে প্রাণ ছাড়ে কে? ভক্তি আসে যায় না, শুদ্ধ ভক্তি একবার প্রাণে উঠলে থেকেই যাবে। তখন যে নিয়ম, যে রীতি, যে কাজ, প্রাণ ধ'রে রাখতে পারে, সেই ধর্ম্ম ছেড়ে অধর্ম্মে প্রাণ কখনই ঝুঁকবে না। অধর্ম্মের ভোগ, পাপের ভোগ, ভক্তকে কোন কালেই ভোগ ক'রতে হবে না। প্রাণ নেবার বুদ্ধি যে করে, প্রাণে আঘাত দেবার বুদ্ধি যার হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রাণে মেরেছে, নিজের প্রাণে আঘাত দিয়েছে, কেননা মরণ যে হবার জিনিষ, ঘটাবার জিনিষ, এ ধারণা হ'লে, ইষ্ট বুদ্ধি হ'লে, মরণের হাতে নিজেকে তুলেই দিতে হয়। তুমি মারতে পারলে, তোমাকেও মারতে পারবে, এ ভয় তোমার তখন যাবে কোথা ভাই? মারণে মরণের ভয় আপনা আপনি সিদ্ধ। ভক্তের এ মারণে বুদ্ধি নেই, মরণের ভয়ও তার নেই। প্রাণ ধরবার বুদ্ধি মহাপ্রাণের সেবক ভক্তের ভক্তির সঙ্গে এক সূতায় গাঁথা, তার হৃদয়ে তাই কেবল ধর্ম্ম, আর সেই ধর্ম্মের প্রাণে তার চিরশান্তি। ভক্তির নাশ নেই, ভক্তেরও নাশ নেই। ভক্তির প্রাণ অধর্ম্মের সম্পর্ক থেকে একবারে মুক্ত ব'লে ভক্তের এই সৌভাগ্য। ভক্তির প্রাণে হৃষীকেশের সেবা নির্ম্মল প্রাণে তাঁর সেবা বৈ কিছুই নয়। সুরূপের দৃষ্টিতে, সুরসের স্বাদে, সুগন্ধের ঘ্রাণে, সুখের স্পর্শে, মধুর শব্দে; জগতের মানুষ প্রায় মরণের ধারায় প্রাণ দেয়, কিন্তু যে ভক্তিতে প্রাণের প্রাণের সন্ধান পেয়েছে, তাঁর শরণ নিয়েছে, তাঁর ভোগে সেই সব ভোগ লাগাতে শিখেছে, তার সেই সেবার ভোগ অধর্ম্মের হাত ছাড়িয়ে, মরণের হাত ছাড়িয়ে, শুদ্ধ প্রাণের 'আহুতি' 'তর্পণ' ছাড়া আর কিছুতে দাঁড়ায় না। ভক্তি নির্ম্মল, ভক্তির ভোগও নির্ম্মল।

পাপ চিন্তা, পাপ সুখ, পাপ জীবন, ভক্তিকে কখনও ছুঁতে পারে না। অধর্ম্ম ভক্তিকে দেখলেই দূরে পালাবে, ভক্তির প্রাণের ত্রিসীমানায় অধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারবে না।

মনে মনে ভাই ভাবতে পার ভক্তি যদি জীবের আপনার প্রাণের ভাবই হবে তখন আপনিই এভাব প্রাণে ওঠে না কেন ? এর জন্যে চেষ্টা যত্ন বিধি নিয়ম কিসের ? মহাপ্রাণের ধারায় মানুষের প্রাণ। মহাপ্রাণের সুখময়, জ্ঞানময়, নিত্য মূর্ত্তি, মানুষের প্রাণেরই চোখের ওপর। তবে কেন মানুষ মহাপ্রাণের ভাগ নিতে, সেই ভাগ নিয়ে সুখে জ্ঞানে অনন্ত জীবন ভোগ ক'রতে পায় না ? পায় না মানুষ স্বাধীন প্রাণের নিজের ইচ্ছেতেই। ভাগ থাকলেই ভাগ লোক পায় না। বাপের সম্পত্তির ভাগও ছেলেকে অনেক সময় চেষ্টা যত্ন ক'রে পেতে হয়। বাধা বিঘ্ন থাকলে অনেক সময় চেষ্টা যত্নেও ফল হয় না। ভক্তিও এমনি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি বটে। কিন্তু ভাগের গণ্ডা তোমার হাতে কেউ তুলে দেবে না। উপরন্তু ভাগ বুঝে নিতে বাধা দেবার অনেকেই আছে। প্রাণের ঝোঁকে স্ব ইচ্ছায় বিষয়ের মিথ্যে ভোগে একবারে সমস্ত মন প্রাণ সঁপে ফেললে আর তুমি তোমার আসল সম্পত্তির দিকে নজর করবার অবসর পাওনা। যদি অবসর ক'রতে পার তা হ'লেই রক্ষা। নইলে তোমারও তোমার হয় না। অবসর ক'রে বুঝে নিতে পারলে, নকলকে নকল ব'লে চিনে নিয়ে আসলের খোঁজ ক'রলে, আসল সম্পত্তি পেতে আর তোমার কষ্ট হবে না। ভাগ করাই আছে, বুঝে নিলেই হ'ল। ভাগ করবার যিনি মালিক তিনি তোমার কাছে হাতে ক'রে তোমার ভাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তুমি তাঁর কাছে যদি না ঘেঁসতে চাও ত পাবে কি ক'রে ? প্রাণের দেবতা তোমার প্রাণকে বোঝাতে কখনই কসুর করেন না যে তুমি মর না, দুঃখে পড় না, মোহও তোমার আপনার নয়। তবু যদি তুমি প্রাণের দেবতার ইঙ্গিত না বোঝ, না বুঝে আপনার নিত্য সুখ, নিত্য জ্ঞান, নিত্য জীবন হারাও, ত দোষ কারুরই নয়, তোমারই দোষ।

পদে পদে যে ভাব তোমার প্রাণে জাগছে, সে ভাব ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিড়ম্বিত হও কেন ? বাঁচবার ভাব, জানবার ভাব, সুখের ভাব, কোনও অবস্থাতেই কি তোমার প্রাণ থেকে স'রে যায় ? তা যখন যায় না, তখন তুমি মহাপ্রাণের, শুদ্ধ প্রাণেরই, যে একটা ভাব, একটা ভাগ, এ ত তোমার জানা কথা। জানা কথাও তুমি ইচ্ছে ক'রে না জানতে চাইতে পার, কেননা ইচ্ছেও তোমার প্রাণের সম্পত্তি।

ফল কথা ভক্তিই জীবের প্রকৃত শুদ্ধ অবস্থা। নকলের মোহ ঘুচে গেলেই এই খাঁটি ভাব প্রাণে আপনিই দেখা দেয়। সেই নকলের মোহ পূরা পূরি ঘোচাবার জন্যেই ভক্তির সহজ বিধি নিয়ম, ভক্তির সহজ শাসন। বিধি নিয়মে ভক্তি হয় না, ভক্তির বাধা ঘুচে যায়। যখন প্রাণের দেবতা ভগবানের কথা শোন, যখন সেই দেবতার মহিমা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি কর, যখন তাঁর সব লীলা স্মরণ ক'রতে থাক, যখন চোখের সামনে তাঁর প্রাণ মাতান মূর্ত্তি রেখে তাঁর সেবা কর, যখন মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে তাঁর পূজা কর, যখন নিজের ছোট ভাব বুঝে তাঁর অনন্ত শক্তির কাছে মাথা নীচু কর, যখন সেই ভাবে তাঁর আজ্ঞা পেতে চাও, পেয়ে সেই মত জীবন কাটাতে চাও, যখন তাঁর সঙ্গ ছাড়া প্রাণে অন্য সঙ্গ ক'রতে চাও না, যখন নিজেকে, নিজের সমস্ত কাজই, তাঁর হাতে তুলে দাও, তখন শিক্ষা দীক্ষা মত এসব ক'রতে গিয়ে, আপনা হ'তে এই রীতি যে তোমায় প্রাণের নিজের কাজের সহজ রীতি তা বুঝতে তোমার বাকী থাকে না।

আপনার প্রাণের জিনিষ হারিয়ে গেলেও একবার কোনও রকমে হাতে প'ড়লে কেনা নিজের ব'লে সেটা চিনতে পারে ? শিক্ষা দীক্ষা নূতন কিছু বোঝায় না, নূতন কোনও ভাব প্রাণে আনে না। প্রাণের যা নিজের নয় তাকি প্রাণে কখনও আসতে পারে ? ভক্তি নিজের জিনিষ, শিক্ষায় দীক্ষায় এ ভক্তির প্রাণে প্রাণে পরিচয় হয় মাত্র। ভক্তির শিক্ষা প্রাণের নিজের অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, তাই ভক্তির শিক্ষা প্রথম থেকেই প্রাণে মিষ্ট লাগে। আনন্দময়ের ভক্তি মিষ্ট লাগবে না ত আর কি মিষ্ট লাগবে ?

ভক্তির শিক্ষায় প্রাণ স্ফূর্ত্তি পায় কেননা ভক্তি প্রাণময়ের ভক্তি। ভক্তির শিক্ষায় মন দিব্য জ্ঞানে জগৎ দেখে, কেননা ভক্তি জ্ঞানময়ের ভক্তি! ভক্তির কর্ম্ম, ভক্তির জ্ঞান, ভক্তির আনন্দ, সবই পূর্ণ, সবই প্রাণের, এ শিক্ষা প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে ঢুকিবে না ত কি ?

(১০)

ভক্তির কাজ।

শুদ্ধ প্রাণ কাজ করবার অনন্ত ইচ্ছা অনন্ত শক্তি প্রাণের ভিতর নিয়ে থাকে। স্বাধীন ভাবে ইচ্ছেমত যখন যা তাই ক'র্ব্বে, তা না হ'লে আর প্রাণে প্রাণ হবে কিসে ? করবার ইচ্ছেয় যার বাধা প'ড়ল সে ত তখনি 'মরণের' হাতে প'ড়ল। প্রাণ যেখানে নিজের শক্তি বিস্তার ক'রতে চায়, সেখানে যদি তা না পারে, তখনি ত তাকে নিজেকে গুটিয়ে আনতে হল। গুটিয়ে আনলেই সে অবসন্ন হবে। অবসন্ন হ'লেই বুঝতে হবে, যে ভাবে নিজের বাঁচবার পরিচয় দিতে গিয়েছিল সেটা পারেনি, সেটায় তার না বাঁচাই হ'য়েছে, সেই হিসাবে সে ম'রেছে। আবার অন্য রকমে, অন্য কাজের ইচ্ছে ক'রে, বাঁচতে পারে বাঁচুক, কিন্তু যে কাজে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, সে কাজে সে মৃত্যুর যাতনা পেয়েছে। শুদ্ধ প্রাণ যখন মরণের ওপরে, তখন শুদ্ধ প্রাণের ইচ্ছেয় বাধা প'ড়তে পারে না। কিন্তু প্রাণ ইচ্ছে ক'রেই যখন মরণের ভিতর ঢোকে, তখন তার ইচ্ছেমত কাজে বাধা পদে পদেই। নইলে মরণের লীলাই যে হবেনা। মরণের মধ্য দিয়ে বাঁচা, অবুঝ হ'য়ে বোঝা, শোকের অন্তরালে সুখ পাওয়া, যে লীলার মুলমন্ত্র, সে লীলায় স্বাধীন

ইচ্ছার প্রতিক্ষণে বাধা বিঘ্নেতেই অন্তরের ইচ্ছার স্বাধীন ভাব ফুটবে না ত আর কি ? ইচ্ছেমত ক'রতে পারছিনে এইটে ব'লতে পারাই খেলার প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছার ও স্বাধীন শক্তির পরিচয় দেয়। যে রাজ্যে প্রাণ সব খাঁটি প্রাণ নিয়েই বসবাস করে, খাঁটি প্রাণের প্রাণের টানে, মহাপ্রাণের আকর্ষণে, ঘোরে ফেরে, সে রাজ্যে প্রাণে প্রাণভরা ইচ্ছে প্রাণের ইচ্ছেমত কাজেই পূর্ণ হয়। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডে ম'রতে এসে মরণের উল্টাটানে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে, লক্ষ যোনি বেড়িয়ে, প্রাণ কখনই ইচ্ছেমত কাজ ক'রে উঠতে পারে না, পারবার কথাও নয়। বৈকুণ্ঠের প্রাণ স্বেচ্ছা মত কাজে, কোনও কাজেই তার কুণ্ঠা হ'তে পারে না। মর্ত্ত্যলোকের প্রাণ বেঘোরে প'ড়ে ম'রবে ব'লেই, শোক মোহ পাবে ব'লেই, কখনই কাজের ইচ্ছে পূরো সফল হ'তে দেখে না।

কেন এমন ধারাটি হয় বুঝতে পার কি ভাই ? পারবে না আর কেন, আসল কথা ত প'ড়েই র'য়েছে। মর্ত্ত্যলোকে এসে প্রাণ বড় হ'য়েও যে ভাই ছোট হ'য়ে পড়ে। সব তার আপনার, চারিদিকে সবই প্রাণ, তা হ'লেও সবাইকে আপনার ক'রে একবারে ত সে পূর্ণ হ'তে পারে না। একে একে অনন্ত জীবন ধ'রে তাকে সবাইকের সঙ্গে পরিচয় ক'রতে হয়। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের টান থাকলেও, সে টানের ফল সে পায় না মরণের উল্টাটানেরই পাকে। কাজেই গরজে তাকে ছোট হ'য়ে ব'সতে হয়। বড় হ'তে হবার ঝোঁকে সে ভিতরে বড়, কিন্তু বড় হ'তে না পেরে, মরণের আকাট বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে, সে ছোট। মর্ত্ত্যলোকে তাই ছোট প্রাণের কাজ করবার ইচ্ছে আর শক্তিও ছোট হ'য়ে যায়। সব ক'রব, সব ক'রতে পারব, এ ভরসা মরণের হাতে প'ড়ে আর থাকেনা। এখানে ছোট আশা, ছোট ইচ্ছে, ছোট কাজে। কিন্তু গতিকে প'ড়ে ছোট হ'লে হবে কি ভাই, ভিতরে ত সবই বড়। সেই বড় ভাবটা প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে যে গাঁথা আছে, তাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে কি ক'রে ? ছোট আশা নিয়েও সে বড় আশা ধ'রবে, ছোট কাজ ক'রতে গিয়েও সে বড় কাজের ঝোঁক

ছাড়বে না। অথচ যা ধ'রে বড় আশা পূর্ণ ক'রবে, বড় কাজ, বিশ্বের প্রাণজোড়া কাজ, ক'রবে, সে ত তা আয়ত্ত ক'রতে পারে না, সব প্রাণকে ত আপনার কোলে টানতে পারে না। কাজেই সে চারিদিকে নিজেকে ছড়াতে না পেয়ে এক দিক দিয়ে লম্বা হ'তে চায়। আজ নয় কাল, এ জীবনে না হয় পরের জীবনে, সে একে একে সব আপনার ক'রে, মস্ত বড় আশাকে, ইচ্ছেকে, খণ্ড খণ্ড ক'রে ছোট ক'রে তাই পূর্ণ ক'রতে যায়। কখনই তার অপূর্ণ প্রাণে ইচ্ছার পূরণ হয় না। এক একটা ইচ্ছাও তার অনন্ত ধারায় ব'ইতে থাকে। মর্ত্ত্যলোকে প্রাণ যতই ঘুরুক ফিরুক, অপূরন্ত ইচ্ছেগুলা তার মরণের প্রাণকে নিয়ে থাকে। সেইগুলা হয় তার নকল প্রাণের 'বাসনা'। কোটি কোটি জন্মে এসব বাসনার ভোগে কখনও নিবৃত্তি হয় না, হ'তে পারে না। যার অপূর্ণ প্রাণের গতিকে তৃপ্তি নেই, তার নিবৃত্তি সহজে সম্ভবেনা।

এই বাসনায় ফলে কি হয় বুঝতেই ত পারছ ভাই। প্রাণের বাইরে সাজান এই কামনাগুলাকেই যেন পূরন্ত প্রাণের পূরন্ত ইচ্ছার ধারা ক'রে তুলেই, জীব সেই মত কাজ করবার জন্যে এ দেহ ও দেহ কত দেহই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তার ঘোরাই সার হয়। স্বাধীন ইচ্ছার স্বাধীন ভোগ আকষ্টবদ্ধ প্রাণে তার কখনই ঘ'টে ওঠে না। ছোট বাসনার নকল নিয়ে যখন প্রাণের ভোগ, তখন প্রাণভরা বড় ইচ্ছের ভোগ হয় না। প্রাণ যখন প্রাণেই ঠিক ক'রবে না, প্রাণেই আপনার ক'রতে পারবে না, প্রাণই কাজে ঢেলে দিতে পেরে উঠবে না, তখন তার নিজের সব প্রাণ টেনে নেবার ইচ্ছে, সব প্রাণ আপনার করবার ইচ্ছে, পূরা প্রাণে কাজ করবার ইচ্ছে, যে ইচ্ছে তার সত্যি সত্যিই নিজস্ব, সে ইচ্ছে চালাতে পারে না। ছোট বিবেচনা নিয়ে, ছোট মমতা নিয়ে, ছোট মন নিয়ে, তার জগতের কাজ, নিজস্ব প্রকাণ্ড ইচ্ছে সে মন অভিমান বুদ্ধিতে খাপ খেতে পারে না। না পারলেও কিন্তু জগতের ছোট ইচ্ছে, জগতের মিথ্যে প্রাণের ইচ্ছে, তার স্বাধীন

ইচ্ছেরই যে নকল, স্বাধীন ইচ্ছেরই যে আকার ভেদ, সেটাও সে একবারে ভুলতে পারে না ব'লে, স্বাধীন ভাব তার প্রাণে সদাই জাগে ব'লে, সেই নকলের বাসনাতেও স্বাধীনতার ইচ্ছে চালায়। নকল প্রাণে বাসনার ফলে কতকগুলা ছাড়া নকল প্রাণ অন্য কিছু ক'রবে না এটা স্থির, কিন্তু অন্তরের স্বাধীন ইচ্ছে তার মধ্যে থেকেই বাছাই ক'রে নিজের শক্তির পরিচয় দেয়। নকল ঝোঁকত এদিকে ওদিকে সে দিকে তোমার প্রাণ চালাতে চায়, স্বাধীন ইচ্ছে খর্ব্ব হ'য়েও কোন্ দিকে কোন্ সময়ে সেই প্রাণ চালাবে তা ঠিক ক'রে দেয়। বুদ্ধির ওপরে, বিবেচনার ওপরে, স্বাধীন প্রাণের যৎ কিঞ্চিৎ শক্তির আবেশ এই রকমে ধরা যায়। জগতের বাসনা নিয়ে স্বাধীন প্রাণের খেলা এই ধারাতেই হয়। বিবেচনার পরিসর অল্প, খুবই অল্প, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খুব ছোট একটা কোণ নিয়ে হয়ত বিবেচনার কাজ, তা হ'লে কি হয়, তবু সেই অল্প অধিকারের ভিতরেই, প্রাণের স্বাধীন ভাবের রাজত্ব ঠিক বজায় থাকে। সে রাজত্ব প্রাণের কেউ কেড়ে নিতে পারে না। খোঁড়া হ'লেও তার পরাক্রম বেশ প্রকাশ পায়।

ছোট ছোট কামনা নিয়ে কাজ ক'র্ত্তে ব'সেই কি মানুষ ইচ্ছেমত ফল পায়? তাত পায় না। পায় না কেন? সবাই জানে ফল পায় না মানুষ 'অদৃষ্টে'র দোষে। কথাটা যত সহজে বলা যায় তত সহজে কিন্তু বোঝা যায় না। অদৃষ্টটা কি? মানুষের কামনার বাধা দেবার শক্তি এর কোথা থেকে হয়? কি ক'রে সে বাধা এ দেয়, কেনই বা দেয়? এই প্রশ্নগুলার উত্তর না পেলে 'অদৃষ্টের' দোষ বোঝা যেতে পারে না। অদৃষ্টটা বুঝলেই সব কটা প্রশ্নের একবারে সমাধান হয়। অদৃষ্টটা ভাই বোঝ আগে। মানুষের একটা জীবনের ভোগ, জীবনের কাজের ধারা, বেশ ক'রে যদি ভাব ত দেখবে, সুখ পাবার জন্যেই মানুষ সব কাজ ক'রেছে। কিন্তু সেই সুখ পেতে গিয়ে কত প্রাণের 'অসুখ'ও ঘ'টিয়েছে। প্রাণের অসুখ প্রাণের বাঁধা সম্বন্ধের উচ্ছেদ বৈ আর কিছুই নয়। প্রাণ প্রাণের এই রকম বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে

সুখের সঙ্গে নিজেও অসুখ টের পেয়েছে। সব প্রাণই যখন এক সূতায় গাঁথা তখন এটা হবে না কেন? পরকে মেরে যে যত সুখ পেয়েছে, তার সেই সব সুখে মরণের ভাব তত জড়িয়ে ধ'রেছে। অন্য জন্মে সুখ ভোগ ক'রতে গিয়ে, কাজ ক'রতে গিয়ে, প্রাণের সেই সব মরণের ভাবগুলার বল তাকে অসুখের ভোগে ফেলবেই ফেলবে। আসল প্রাণের যে বলে সে সুখের কাজ ক'রতে যাবে, সেই আসল প্রাণের আর একধারে, বিশ্বের প্রাণের একদিকে, তার অসুখের ভাগ ঠিক ক'রে সাজান আছে। সেই ভাগটাই তার 'ভাগ্য', সেটা দেখা যায় না, তাই অ'দৃষ্ট। জন্ম জন্মের কাজের ফলে বিশ্বের প্রাণের অধিকারে, তার অন্তরালে, সেটা লুকিয়ে থাকে। তুমি বিশ্বপ্রাণের ওপর যা ক'রবে বিশ্বপ্রাণও তোমার ওপর তাই ক'রবে। সুখ ভোগের সঙ্গে যে দুঃখগুলা তোমার ভোগ ক'রতে হবে, সেগুলা ভোগ করবার জন্যে বিশ্বপ্রাণের বড় শাসনে তোমার সুখের বাধা জুটবে। সবাইকে সুখী ক'রব ব'লে যে কাজ ক'রতে পারে, তার অসুখের 'ভাগ' আর ভোগ ক'রতে হয় না। মানুষ তা প্রায় পারে না, কাজেই অসুখের 'ভাগ্য' তার এড়াবার উপায় নেই। কামনার কাজে বিশ্বপ্রাণের বাঁধা নিয়মে সুখের বাধা পদে পদে।

এই সব বাধা সরাতে হ'লে মানুষকে কার আশ্রয় নিতে হবে ভেবে বল দেখি একবার? নেবে আর কার, যার প্রাণে ঘা দিয়ে বাধা তারই শরণ নিতে হবে। যেখানে ঘা সেইখানেই ওষুধ দিতে হবে। বিশ্বের প্রাণে যে ভাবে 'বিরক্তি' হ'য়েছে, যে ভাবে তার তোমার প্রাণের দিকে 'বিদ্বেষ' হ'য়েছে, যে ভাবে তুমি তার 'মমতা' আকর্ষণ ছিঁ'ড়েছ, হারিয়েছ, সেই ভাবে আবার তাকে তোমার দিকে অনুরক্ত কর, প্রসন্ন কর, আপানার ক'রে টান এবং টানতে দাও। বিশ্বের প্রাণকে আলাদা আলাদা ভাবে এই রকমে সন্তুষ্ট করবার জন্যে, তার সঙ্গে কোন রকমে নষ্ট সম্বন্ধ উদ্ধার করবার জন্যে, সেই প্রাণের নানা রকম 'অনুগ্রহের' জীবন্ত 'মূর্ত্তির', অনুগ্রহের সমস্ত ভাব জাগান

'মূর্ত্তি'র, পূজা না ক'রলে আর হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের নানা শক্তির ওপরেই এই সব 'দেবতা' খেলা ক'রছে, আর নিজের নিজের অনুগ্রহের শক্তি দেখাচ্চে। তোমার কামনা মত কামনার সিদ্ধির জন্যে, কামনার বাধা বিঘ্ন সরাবার জন্যে, এক একটা দেবতার কাছে, প্রাণের এক একটা বিশ্বময় ভাবের কাছে, তোমার প্রাণ এগিয়ে দাও, সেই টানে তাকে সটান হ'য়ে প'ড়তে দাও, দিয়ে তার কোল গত ক'রে তার শক্তির ভাগ নাও, নিলে সেই ভক্তির জোড়ে তুমি কাজ উদ্ধার ক'রতে পারবে। কামনার কর্ম্মে দেবতার পূজার, দেবতার ভক্তির, এই জন্যেই উপদেশ দেওয়া আছে।

কিন্তুই যতই হোক ভাই এ সব ছোট দেবতা। এদের অধিকার বড়ই ছোট। ছোট ছোট বাসনার পূরণ করবার শক্তিই এরা রাখে। এদের শক্তিতে যা হয় তাতেও মানুষ ছোটই থাকে। ছোট কামনার তৃপ্তি হ'লেই ছোট কামনা ছোট ভাবেই মানুষকে ব্রহ্মাণ্ডের ছোট কাজে বেঁধে রাখবে। জগতের কামনা যত বড়ই হোক ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব'সতে জানেনা। ছোটয় যার প্রাণ সে কি বড় হয়? রূপ দাও, ধন দাও, যশ দাও, সহায় দাও, ব'লে যে যে দেবতার কাছেই কামনা কর, ক'রে সফল হও, সেই সেই দেবতার কেউই তোমায় কোন কালে অতি বড় ক'রতে পারবে না। তাদের পূজা ক'রে, তাদের ভক্তি ক'রে, তাদের তুষ্টি ক'রে, তোমার বড় লাভ, বড় প্রাণ লাভ, হবে না। ছোটর ভক্তিতে ছোট ভাগই তুমি পাবে। সংসারে, ছোট কাজের বাঁধনে, তুমি যেমন বাঁধা তেমনি বাঁধাই থাকবে। বাঁধন থেকে মুক্তি ছোট দেবতাকে ধ'রে পেতে পারবে না।

এই জন্যেই কেউ কেউ তোমায় উপদেশ দেয় কামনার কর্ম্ম ক'র না, কামনায় ব্রত, কামনায় উপবাস, কামনায় পূজা, কিছুতেই ক'র না; এ কাজ প্রাণের আসল কাজ নয় কেন না একাজে প্রাণ আপনাকে পায় না, বড় প্রাণকে পায় না। কামনার পূজায় যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নকলকেই ধরে, আসলকে ধরে না। ছোট দেবতাকে ধ'রে যে

'ধর্ম্ম,' প্রাণের যে বল, তুমি সংগ্রহ কর, সে বলে তোমার ছোট ফল হাতে আসতে পারে, কিন্তু মহাফল মহাপ্রাণ, তোমার সে ধর্ম্মের বলে, সে ধর্ম্মের টানে, তোমার প্রাণের ওপর প'ড়বে না। 'ধর্ম্ম' হ'লেও কামনার ধর্ম্মে 'অধর্ম্ম' আছে। মরণের ভয়, শোকের ভয়, মোহের ভয়, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে ছোট সম্বন্ধে, যত কিছু ভয় হ'তে পারে, সব রকম ভয় কামনার ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। অভয় পেতে হ'লে এ ধর্ম্মের আশ্রয় নেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এই রকম উপদেশ অনেকেই দেন বটে, কিন্তু কামনা ছাড়া কোনও কাজ করা ত মানুষের পক্ষে সম্ভব ব'লে সহজে বোধ হয় না। বিনা কামনায় কোনও কাজ হ'তে ত দেখা যায় না। কাজ না ক'রলেও ত প্রাণ প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে। কাজ সুতরাং ক'রতেই হবে, কামনা নিয়েও চলতে হবে। তা হ'লে কামনার ধর্ম্মই বা ছাড়া কি ক'রে হয়? কামনার দেবতার পূজাই বা কি ক'রে উচ্ছেদ করা যায়? জগতের সারা জীবনটাই কামনার কর্ম্মেই পূর্ণ, অথচ বল কামনা ছাড়। এ যে বড় অসঙ্গত কথা ব'লেই মনে হয়। কামনা ছাড় বলাও যা, কাজ ছাড় বলাও তাই, আর প্রাণ ছাড় বলাও সেই একই কথা। প্রাণ ছাড়তে ত বলনা, আর ব'ল্লেই বা হবে কি, ছাড়া ত যাবেনা, প্রাণ থাকবেই থাকবে, তখন কামনার কর্ম্ম ছাড় একথা বলে ধাঁদা দাও কেন? কামনা ছেড়ে যদি কাজ করা যায় ত তবে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে অমন উপদেশ দাও।

সমস্যাটা তা হ'লে এখন দাঁড়াচ্চে যে কামনার কাজে প্রাণের নিজের ভাব হারিয়ে যায়, অথচ কামনার কাজ না ক'রেও প্রাণ জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। এ সমস্যার সমাধান কিসে হয়? হয়, যদি ছোট বাসনাকে প্রাণের কামনায় তুলতে পারা যায়। যে কাজ ক'রতে যাবে সেই কাজের কামনা যদি বড় প্রাণের জগৎ বাঁচান কাজের কামনার এক ধারায় দাঁড় করাতে পার, সেই ভাব প্রাণে প্রাণে জাগিয়ে তুল্‌তে পার, তা হ'লেই আর ছোট কামনাও ভাই ছোট

থাকবে না। ধন চেয়ে ধন যদি জগতের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে খরচ করবার বাসনা প্রাণে ধর ত ধনের কামনা ছোট হ'য়েও বড় হ'য়ে যাবে। নিজের প্রাণের সুখ পাবার জন্যে যা করতে চাও তাই জগতের প্রাণের সুখের দিকে তাকিয়ে কর। এ রকম কামনায় ধর্ম্মে অধর্ম্মের ভাগ্য সঞ্চয় করা হবেনা, নিজের সুখে জগতের কোন সুখের কোথাও আঘাত লাগবে না। এ কামনা সকল অবস্থাতে প্রাণের পূর্ণ কামনা, সকল প্রাণ জোড়া কামনা। এ কামনা তোমায় বাঁধবেনা, তোমার ছোট কামনার গিঁট খুলেই দেবে। জগতের সব জীব, সব প্রাণ, আপনার ক'রে এ কামনা জাজ্বল্যমান হবে। এ কি আর তোমায় কোন রকমে ছোট ক'রতে পারে ভাই?

বল দেখি ভাই এ কামনায় ফলের জন্যে কোন দেবতার মুখ পানে চাবে? এতে যখন বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, এতে যখন মরণ নেই, শোক নেই, মোহ নেই, তখন এ কামনার দেবতা যে কে তাত সহজেই বুঝছ। সেই দেবতা তোমার প্রাণের যাতে প্রাণ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের যাতে প্রাণ। তোমার জীবব্রহ্ম, জীবশিব, জীববিষ্ণু, যে দেবতার বড় বড় ভাব, সেই দেবতাই তোমার এই বিশ্বজোড়া কামনায় পূজার দেবতা, ভক্তির দেবতা। এ পূজায় এ ভক্তিতে আসল দেবতার ছোট ভাব তোমার হৃদয়ের আসনে বসাতে হবে না। জগতের সব প্রাণ যেখানে টেনে বাঁধা, সেই জগৎ ছাড়া, জগৎ জোড়া প্রাণ টানা দেবতা, সেই বিষ্ণু, 'সেই কৃষ্ণ,' তোমার মহাকামনার সিদ্ধিদাতা সকল কামনার পূরণ কর্ত্তা 'পুরুষ'। তাঁর ভক্তিই তোমার আসল ভক্তি। ছোট দেবতার ভক্তি তোমার নকল প্রাণের নকল ভক্তি। এই ভক্তিতে তুমি প্রাণের বড় টানে প'ড়ে পরিপূর্ণ। এই ভক্তির অনুরাগ কাজেই তোমার পূর্ণ অনুরাগ, পূর্ণ প্রীতি। এক কথায় এই ভক্তি তোমার 'কৃষ্ণপ্রীতি' বা 'বিষ্ণুপ্রাতি'। বিষ্ণুপ্রীতির বশে যে কাজই কর সেই কাজই নির্দ্দোষ, সেই কাজই শুদ্ধ 'ধর্ম্ম'। কামনার কর্ম্মও বিষ্ণুপ্রীতির বশে একবারেই পাপ তাপের বাঁধন ছাড়ায়। হয়ত অজ্ঞ

লোকের, সাধারণ সমাজের, খাতিরে তুমি কামনার ছোট ভাবটার মত ছোট দেবতার পূজায় বা ভক্তিতে মন দিলে, কিন্তু তখনও তোমার কামনা বড়, দেবতাও বড়। তোমার কাছে, তোমার বিষ্ণু ভক্তির প্রাণে, ছোট তখন বড়রই রূপ হয়ে দাঁড়াবে, ছোটর ছোট ভাবটা আপনা আপনিই তোমার চোখ থেকে স'রে যাবে। জগতের কাছে জগতের কাজ ক'রতে ব'সে শুদ্ধ ভক্তকেও এ রীতি মেনে নিঁতে হয়, আর নেয়ায় দোষও কিছু হয় না। ভক্তির কর্ম্ম, ভক্তের কর্ম্ম, সকল অবস্থাতেই জগৎ জোড়া। ভক্তির দেবতা শুদ্ধ অবস্থায় পূর্ণ প্রাণ বিষ্ণু বৈ আর কেউ নয়।

বিষ্ণু-ভক্তি যার প্রাণে উঠেছে, সে সকল অবস্থাতেই সাবধানে থাকতে চায় যেন ঐ ভাব তার প্রাণ থেকে না যায়। জগতের সঙ্গে সে যেমন যেমন কামনার কাজই করুক না, এ বিষ্ণুভক্তি জাগিয়ে রাখবার জন্যে সে শুধু ভক্তির কামনায় কাজ, সেই কামনার মত ধ্যান ধারণা পূজা, ক'রতে কোনদিন ভোলে না। বিষ্ণু প্রাতির কামনায় সেই কাজ গুলিই তার প্রাণের 'নিত্য' কাজ। জগতে সে থাকুক আর নাই থাকুক, তার প্রাণ শুদ্ধই হউক, আর বদ্ধই হউক, সকল অবস্থাতেই অবস্থার মত, শুদ্ধ প্রাণে, সে ঐ প্রাণের আসল কাজ ক'রতে চাবে।

তার সন্ধ্যা বন্দনা ধ্যান জপ, তার প্রাণের আসল ভাবের, তার 'বিষ্ণু-প্রীতি'রই, পরিচয় দিয়া থাকে। এই নিত্য কর্ম্মে মানুষ পদে পদে মহাপ্রাণের বন্ধনে মহাপ্রাণের আকর্ষণে, নিজের প্রাণের পূরন্ত ভাব বুঝতে পারে। নিত্য সুখের নিত্য জ্ঞানের নিত্য জীবনের সন্ধান এই নিত্য কর্ম্মেই মানুষ পায়, কেননা প্রাণের পূরন্ত ভাবের সঙ্গেই সুখ জ্ঞান জীবন জড়ান। নিত্য কর্ম্মের শাসন প্রাণের তাই আপনার শাসন। এ যে না করে সে নিজের ইচ্ছায় প্রাণের শাসন ছেড়ে মরণের হাতে পড়ে। প্রাণ ধরবার ধর্ম্ম ছেড়ে সে অধর্ম্মের পথে পা দেয়। নিত্য বিধি মানুষের স্বাধীনতারই বিধি। এর বাঁধন জগৎ

জোড়া, কাজেই খোলা বাঁধন, মুক্তির বাঁধন। এ বাঁধন একবারেই 'কঠোর' নয়। নিত্য কর্ম্মই ভক্তির, মহাপ্রাণের প্রাণের ভাগ বুঝে নেওয়ার, প্রধান সম্বল। জগতের কাজের মাঝে এই নিত্য কর্ম্মই মানুষকে নিজের অমর ভাব বুঝিয়ে দেয়। জগৎ ছেড়ে শুদ্ধ অমর লোকে এই নিত্য কর্ম্ম প্রাণের পরিপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখে। এই কর্ম্ম জীবের কখনই ছাড়বার নয়। এ কর্ম্মের বিপুল ধারা। যাঁর নিত্য লীলা অনন্ত, মহিমা অনন্ত, তাঁর ভজনের নিত্যরীতিও কাজে কাজেই অনন্ত।

জগতের বন্ধনে প'ড়ে মানুষ কামনা না করেও অনেক সময়ে গতিকে প'ড়ে জগতের প্রাণে ঘা দিতে বাধ্য হয়, মহাপ্রাণের অনুরাগের, বিষ্ণু-ভক্তির বিপরীত আচরণ ক'রে ফেলে। বাঁচবার আর বাঁচাবার জন্যে কাজ ক'রতে চাইলেও অনিচ্ছাতেও মানুষকে মারতে হয়। ধর্ম্মের খাতিরেও অধর্ম্ম অনেক সময় না ক'রলে ধর্ম্ম বজায় থাকে না। প্রাণ রাখতে গিয়ে প্রাণের হানি না ক'রে পারা যায় না। এসবের দৃষ্টান্ত সকল সময়েই চারিদিকে দেখতে পাওয়া যায়। জেনে শুনেই এ সব অধর্ম্ম ক'রতে হয়, কাজেই বিশ্বপ্রাণের কাছে এ সব 'হিংসার' এ সব 'অপরাধের' 'ক্ষমা' চাইতে হয়, এ সব 'ঘায়ে' বিশ্বপ্রাণের আকর্ষণ, প্রাণের সঙ্গে টান, যাতে ঢিলে না পড়ে, সেই জন্যে বিশেষ ভাবে মহাপ্রাণের কাছে এগিয়ে এসে মহাপ্রাণের উপাসনা ক'রতে হয়, মহাপ্রাণের বাঁধন জোড় ক'রে বাঁধতে হয়, মহাপ্রাণের কোলে নিজের প্রাণ ফেলে দিতে হয়। বড় ধর্ম্মের, আসল ধর্ম্মের কাছে তখন নকল অধর্ম্ম আপনিই লোপ পায়। খাঁটি প্রাণ ধ'রে রাখতে পারলে 'অধর্ম্ম' থাকবে কোথায়? নিত্য অপরাধের জন্যে ভক্তির নিত্য কর্ম্মের মধ্যে এই উপাসনা, এই ক্ষমা প্রার্থনা, অবশ্যই থাকে। শরীর-যাত্রা চালাবার জন্যে এ নিত্য অপরাধের সংবাদ সকলেই রাখে, সুতরাং সে কথা আর বলবার দরকার নেই। সংসার-যাত্রায় সময়ে সময়ে যখন গুরুতর ভাবে এ রকম অপরাধ ক'রতে হয় তখম গুরুতর ভাবে ক্ষমা ভিক্ষাও ক'রতে

হয়। 'নৈমিত্তিক' ভজনে এ অপরাধের প্রতিকার হয়। ভক্তের সকল অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই বিষ্ণুভক্তি। প্রায়শ্চিত্তের মূল মন্ত্রই 'বিষ্ণুভক্তি'। যে আকারেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান হ'ক না কেন, যে পূজা, যে জপ, যে ধ্যান, যে মন্ত্রই হ'ক না কেন, বিষ্ণুভক্তিতেই' ভক্তির দোষ ক্ষালন হয়, অন্য কিছুতে নয়। ভক্তের কাছে বিষ্ণুই সকল আরাধনার এক দেবতা। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শিব।

কাম্য কর্ম্ম বল, নিত্য কর্ম্ম বল, নৈমিত্তিক কর্ম্ম বল, ভগবান্‌কে যে ভক্তির ডোরে বেঁধেছে, তার মোটের ওপর একই কর্ম্ম। সে কর্ম্ম তার ভগবানে নিত্য ভক্তি। তার সব কর্ম্ম সেই নিত্য ভক্তিরই ধারা। ভক্তির ধারা ব'লে কোন কর্ম্মই তার, ছোট আশার পরিচয় দেয় না, ছোট প্রাণের পরিচয় দেয় না। সকলের প্রাণকে সে সব কর্ম্মের মূলে বাঁধে,বেঁধে তবে কাজ করে। জগতের কাছে ভক্ত বিশ্বপ্রেমিক, ভগবানের কাছে ভক্ত শুদ্ধ প্রেমিক। জগতে তার শুদ্ধ প্রেম আর বিশ্বপ্রেম মিলে মিশে কাজ করে। 'বৈকুণ্ঠে' সে শুধুই প্রেমের ভোগ ভোগ করে। মর্ত্ত্যলোকে ভক্তির কাজ মরণের মাঝেও অমর, শোকের মাঝেও সুখময়, অজ্ঞানের ফেরেও জ্ঞানময়। অমর লোকে সে কাজে শুধুই প্রাণ, শুধুই সুখ, শুধুই জ্ঞান। ভক্তি ছাড়লে, প্রাণ প্রাণের ভাগ না বুঝে নিলে, সঙ্গে সঙ্গে শোক মোহ মৃত্যুর কবলে প'ড়বে। ভক্তি প্রাণের পূর্ণ ভাব, ভক্তি প্রাণের মুক্ত ভাব। ভক্তির কাজেই আসল ভোগ, আসলমুক্তি। বড় প্রাণে, সকল প্রাণে, আপনাকে সঁপে দিয়ে, যে কাজ করা যায়, সেই ভক্তির কাজের কোন রকমেই মার নেই। সেই কাজই সত্য কাজ। আর কাজ সব মিথ্যে।

ভক্তির জ্ঞান

সোজাসুজি মানুষ যখন জানতে চায় তখন কি রকম ক'রে জানবে এটা আর বড় বেশী ক'রে খুলে বোঝাবার দরকার হয় না। চোখ দিয়ে, কাণ দিয়ে, নাক দিয়ে, জিভ দিয়ে, ত্বক্ দিয়ে, দেখে, শুনে, গন্ধ সুঁকে, সোয়াদ নিয়ে, ছুঁয়ে, মানুষের জ্ঞান হয়। শুধু কিন্তু কি ঐ ইন্দ্রিয়-গুলার কাজেই জ্ঞান হয়? তা হয় না। অন্যমনস্ক থাকলে মানুষ দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা, সুঁকেও সোঁকেনা, সোয়াদ পেয়েও পায়না, ছুঁয়েও ছোঁয়না। মন লাগলে বিষয়টার একটা কল্পনা মনে মনে ওঠে বিষয়টা এ রকম বা ঐ রকম। কিন্তু মন লাগালেই বিষয়টা প্রাণের কাছে পৌঁছায় না। জ্ঞান প্রাণেরই জিনিষ। আমার হ'য়ে বিষয়টা যখন আরও এগিয়ে আমার প্রাণের কাছে আসবে তখন আমার জ্ঞানটা আমারই হবে। আমি জানছি এ ভাবটা না জাগলে জ্ঞান জ্ঞানই হবে না। আমার জ্ঞান হ'য়েও আরও একটু দরকার। যা জানলাম তা কি জানলাম? যেটা ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে এনে প্রাণের কাছে ধ'রলাম, সেটা কোন ভাবের জিনিষ, কোন শ্রেণীর জিনিষ? পাপড়ি দেখলাম, সাদা রঙ দেখলাম, গোল মত আকার দেখলাম, বেশ একটু মোলায়েম গন্ধ পেলাম, এই সব ক'রে সবগুলা এক করে যেটা হ'ল সেটা কি হ'ল? 'বিবেচনা' ক'রে, অন্য সব জিনিষের যে সব ছোট ছোট ধারার জ্ঞান প্রাণে লুকান আছে, সেগুলার সঙ্গে তফাৎ বুঝে, আগে যে জিনিষের ঐ রকম সব জ্ঞান পেয়েছি তার সঙ্গে মিলিয়ে, ঠিক ক'রলাম ওটা পদ্মফুল। বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা ক'রে তবে এখন জ্ঞান কাজের মত হ'ল। তবেই ইন্দ্রিয়ের আবছায়া গোছের জ্ঞান, ক্রমে মনের, মমতার আর বুদ্ধির, কোল গত হ'লে, তবে সেই জ্ঞান পূরন্ত জ্ঞান হয়। মানুষের প্রধান জ্ঞান,

বাহিরের জগৎ জানবার আসল জ্ঞান, এই একই। এইটাই মূল, এর ওপর গাঁথুনি ক'রে আর আর যত রকমের জ্ঞানই বল সবই সাজান হয়। ধোঁয়া দেখলে আগুন আছে ব'লে যখন বুঝছ, তখন ধোঁয়াও আগে দেখেছ, আর আগুনও আগে দেখেছ; সব জায়গায় ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দেখেছ, তবে ধোঁয়া থেকে আগুন এঁচে নিতে পারছ, নইলে পারতে না। এঁচে নিয়ে যা জ্ঞান ব'লে ভাব, তার গোড়ায় ঐ মূল জ্ঞান না থাকলে হয় না। যখন কোনও ভদ্র লোক তুমি গঙ্গার ঘাটে স্নান ক'রতে যাচ্ছ দেখে তোমায় ব'ল্লে যেওনা ভাই আজ ঘাটে কুমীর দেখা গেছে, তখন তুমি কথাটা শুনেই বুঝে নাও, যেন চোখের ওপরেই ঘাটে কুমীর ভাসছে। এটা হয় কেন? হয় তোমার আগেকার সংস্কারেই, আগেকার জ্ঞানের ফলেই। ভদ্রলোক যখনই ব'লেছে যে অমুক জায়গায় অমুক আছে, তখনই কতবার সেই সেই জায়গায় গিয়ে দেখেছ, যে হাঁ তাই বটে। কথামত জ্ঞান, আসল জ্ঞান, তোমার এমনি অনেক বার হ'য়েছে ব'লেই তুমি কথায় প্রত্যয় কর, কথায় তোমার জ্ঞান হয়। জুয়াচোর মিথ্যেবাদী ব'লে যাকে জান তার কথায় এরকম প্রত্যয় হয় না, কেননা তার কথামত জ্ঞান কতবার পাওনি। ফল বাহিরের বিষয়ে মূল জ্ঞান মোটের উপর এক বই দুই নয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই মন মমতা বুদ্ধি জ'ড়িয়ে, অন্তরিন্দ্রিয় জ'ড়িয়ে, ঐ জ্ঞান হয় ব'লে, এ জ্ঞানকে ব'লে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বাহিরের ইন্দ্রিয় আর ভিতরের ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে জগতের জিনিষ যেন প্রাণের ঘরে এসে ঢোকে।

একটু ভাল ক'রে দেখলেই বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে এই জ্ঞানে মানুষের খাঁটি প্রাণ বাহিরের বস্তু চিনে নেয় না। বাহিরের বস্তু চিনে নেয় নকল প্রাণ। নকল প্রাণের মন দিয়েই জিনিষের কল্পনাটি হ'য়েছে, নকল প্রাণের কাছেই জিনিষ আপনার হ'য়েছে, নকল প্রাণই বুঝে সুঝে তাকে কি রকমের জিনিষ তা ঠিক ক'রে নিয়েছে। আসল প্রাণ সকল রকমেই নকল ঢাকায় ঢাকা দিয়ে জিনিষটে যে জানা তা

বুঝেছে। মনে যদি ভুল কল্পনা হ'য়ে থাকে ত সে ভুলটা ওতে র'য়ে গেছে। এমন ভুল প্রায়ই হয়। হঠাৎ দেখে যেটা দেখেছি ব'লে ভাবা যায়, যে রঙ জিনিষের গায়ে মাখান আছে ব'লে মনে হয়, সে রঙ তার আদৌ না হ'তে পারে। "স্বচ্ছ" সাদা জিনিষও লাল রঙের জিনিষের কাছে থাকলে লাল দেখাতে পারে। মনের ঐ রঙের কল্পনাটা কাজেই সেখানে মনগড়া ভুল রঙ ছাড়া ঠিক রঙ নয়। আমি দেখেছি বলে নিজে যা ভাবি অনেক সময়ে নিজে তা ঠিক দেখিনি। দেখলাম হয়ত চাঁদের আলোয় কলা গাছের পাছে কলা গাছের ছায়াটা মাত্র, তাতে চাপালাম হাত পা না কাণ চোক ফরসা ধপ ধ'পে একখানা কাপড়, এই রকম ক'রে তাকে মানুষের সব সাজে সাজিয়ে ভাবলাম দেখেছি ঠিক মানুষ। যেগুলার জোড়ে ওটাকে মানুষ ক'রলাম সেগুলা কিন্তু ও দেখায় আমার দেখা হয়নি, ওই হাত পা দেখাগুলা আদৌ আমার তখনকার দেখা নয়। আমার ক'রে তোলবার সময় এমনি ভাবে ইন্দ্রিয়ের মনের জ্ঞানে ভুলভ্রান্তি জুটে যায়। তার ওপর আছে আবার বুদ্ধির ভুল। নিজের বিবেচনার দোষে, অন্য থেকে তফাৎ ক'রে বোঝবার দোষে, যেটা যে জেতের সেটাকে সে জেতের জিনিষ বলে ভাবতে অনেক সময়েই গোল হ'য়ে পড়ে। জ্ঞান যখন ঠিক হ'ল, তখনও ঠিকে বেঠিক কত দেখা যায়। নকল প্রাণের জ্ঞান, অন্তঃকরণের জ্ঞান, এমনি ভাবে প্রায়ই অল্পবিস্তর ভুল ভ্রান্তি জড়ান। একেবারে ভুল ভ্রান্তির হাত থেকে নকল প্রাণের নিস্তার পাওয়া বড় দায়, আদৌ ঘ'টে ওঠে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করবারও যথেষ্ট হেতু আছে।

যে প্রাণ জিনিষ চিনে নিতে যায় তার ত এই দুর্দ্দশা। এর ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোড়া আছে। যে জিনিষ জানতে যাওয়া যায়, তারও ঘাড়ে নানা রকমের 'বিড়ম্বনার' চাপ। মনে কর মানুষ একটা মাটীর আতাফল তৈরী ক'রলে। ভাব দেখি সে কি ক'রলে। তাতে আতার রঙ দিলে, আকার দিলে,' আতার যা কিছু ভাব তার 'নিজের'

জানা আছে, সে ভাবগুলা সব জুটিয়ে দিলে, দিয়ে ঠিক তাকে আতার জাতে তুলে দিলে। কল্পনা, মমতা, আর বুদ্ধির বলে এমনি ক'রে মানুষই নয়কে হয় ক'রতে পারে। মানুষ যখন স্বষ্টি করে, তখন এই রকমই স্বষ্টি করে। জগৎ সাজিয়ে রেখেছে যে জগতের প্রাণের মানুষ সে কি ক'রছে এমনি ক'রেই বুঝে নাও দেখি। যেটা ঠিক যেমনটি প্রাণে প্রাণে, সেটা কি ঠিক সে সেই রকমেই গ'ড়ে তুলেছে? ঠিক গ'ড়ে তুলতে যে পারেনি তার প্রমাণ চারিদিকেই। ঠিক হ'লে এক জাতের জিনিষ একই হ'ত। এক জাতের দুটা জিনিষও জগতে এক দেখা যায় না। তা ছাড়া ঠিক হ'লে কি কেউ ভেঙে আবার গ'ড়তে যায়? জগতের মানুষটি কিন্তু কেবল ভাঙছে আর গ'ড়ছে। তাতেই বোঝ যে তার গড়া ঠিক হয়নি, কখনই ঠিক হয় না, হ'তে পারে না। তুমি এই রকম ভুল ভ্রান্তিতে ভরা জিনিষ 'প্রত্যক্ষ' ক'রে ভাব যে ঠিক জিনিষটি 'প্রত্যক্ষ' ক'রছ। গোড়ায় গলদ তা একবার ভাব কি? জগতের যেখানে খাঁটি মানুষের দেহ দেখছ ম'নে কর, সেখানে 'পূর্ণ' মানুষের দেহ দেখতে পাও না, পাবার জো নেই।

আসল কথা এই জগতে আমার তোমার নকল প্রাণের সঙ্গে জগতেরও নকল প্রাণেরই দেখা শুনা হয় মাত্র। আমার তোমার আসল প্রাণও আড়ালে, জগতের আসল প্রাণও আড়ালে। প্রাণ কিন্তু জানতে চায় আসল প্রাণ, আর নিজেও আসল হ'য়েই জানতে চায়। জগতের জ্ঞানে দু ধারেই বাধা, দু ধারেই মস্ত আবরণ। এ পর্দ্দা কোন রকমে দু ধার থেকে স'রিয়ে ফেলতে না পারলে প্রাণের জানাই হবেনা, হ'তে পারে না। যদি বল ভাল নকলই ত জানতে চায় দেখি, জানায় তাহ'লে নকলেরই ত অধিকার, আসলের জানা হ'ক না হ'ক তাতে কি এসে যায়? অনধিকার চর্চ্চা আসল ক'রতেই বা যাবে কেন? না ভাই ওটা কথাই নয়। আসলই জানতে চায়,

আসলকেই জানতে চায়। জানতে চাও কার তাড়ায়? প্রাণ গেলে কে জানতে ব্যস্ত হয় ভাই? মরা কখনও জানতে চায় না, মরা কখনও নিজেকেও জানাবার জন্যে জগতে নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে বের করে না। প্রাণই জানে, প্রাণই জানায়। আমার প্রাণ জানতে চায়, জগতের প্রাণ জানাতে চায়। মাঝে দুধারে পর্দ্দা পড়ায় যত গোল এসে দাঁড়ায়। তবেই এখন দেখতে হবে আসল জানা জানতে হ'লে এ পর্দ্দা তুলে ফেলে দেওয়া যাবে কি উপায়ে? উপায় সোজাই। পর্দ্দার ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা ক'রেই তোমার বিড়ম্বনা, পর্দ্দার ওপরে ওঠ, সব তোমার নজর হবে। প্রাণকে নকল প্রাণের ওপরে টেনে তোল দেখি, তা হ'লে তোমার আর আসল জানবার জন্যে ভাবনায় প'ড়তে হবে না। নকলের ওপর আসল দু ধারেই 'বিশ্বজোড়া। নকলের মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ালেই তোমার 'বিশ্বজোড়া' প্রাণ 'বিশ্বজোড়া' প্রাণের আসল দেখা পাবে। বিশ্বপ্রাণের ভক্তিতে, তাঁর জীবনের ভাগীদার ক'রে নিজের জীবনকে তুলতে পারলে, প্রাণে প্রাণে এই খাঁটি পরিচয় আপনাআপনিই হবে, অন্য রকমে এ পরিচয় হবার একবারেই সম্ভাবনা নেই। তবেই ভাই ভক্তিই আসল জ্ঞানের একমাত্র উপায়। ভক্তির জ্ঞানই প্রাণের প্রাণের জ্ঞান। ভক্তির জ্ঞানে যে জানতে চায় তার ও নকল জ্ঞানের পর্দ্দা প্রাণের চোখের সামনে থাকেনা। যাকে জানতে চায় তার দেহের পর্দ্দাও প্রাণের দেখা আটকাতে পারে না। ভক্তিতে আসল জ্ঞান আপনিই ফোটে, কেননা ভক্তিতে প্রাণ প্রাণেরই সামনে, প্রাণেরই টানে, অন্য কোথাও নয়। মহাপ্রাণের জীবনের টানে নিজেকে ফেলে যে নিজের প্রাণ 'পূর্ণ' ক'রেছে, মহাপ্রাণ 'বিষ্ণুর' প্রীতিতেই যার জীবন পরিপূর্ণ, তাঁর 'সহচর হ'য়ে যে মহাপ্রাণের মহামণ্ডলে চ'লে ফিরে বেড়াচ্চে, তার আর জানবার কিছুই নেই। প্রাণের সব নমুনাই সেখানে। সেখানকার মানুষ, সেখানকার পশু, সেখানকার পক্ষী,

সেখানকার সবই, অজর, অমর। তাদের ভেঙে চূরে কখনও ফিরে গ'ড়তে হয় না। জগতের জন্যে জগতের প্রাণের মানুষ ঐ নমুনা গ'ড়ে তুলতে গিয়ে পদে পদে নিজের ছোট শক্তিরই পরিচয় দেয়, কেবল ভাঙা গড়া নিয়েই থাকে। যে সব জানতে চায়, যে একটুও, একটাও, আসল জানতে চায়, তার এই 'বিষ্ণুভক্তি' বিনে আর গতি নেই। ভক্তি ছাড়া সব জ্ঞানই অজ্ঞান, ঘোর মোহ।

ভক্তির উদয়ে, ভক্তির চরম পরিপাকে, ভক্তের প্রাণের ভোগের দেহ আর জড় দেহ থাকে না। দেখতে, শুনতে, সোয়াদ নিতে, গন্ধ সুঁকতে, ধ'রতে ছুঁতে, ভক্তকে জড় ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে আসতে হয় না। মনগড়া গ'ড়তে ভোলা মনের হাতে প'ড়তে হয় না। আমার যা নয়-তা আমার ব'লে ভাবতে হয় না। 'বিবেচনা' কর'তে গিয়ে উল্টা বুঝতে হয় না। ভক্তির প্রাণে ইন্দ্রিয়, মন, মমতা, বুদ্ধি সবই বিশ্বজোড়া, পূর্ণ প্রাণ-জোড়া, হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রাণের দেহ সকল ভাবেই প্রাণময় হয়। নকলের গন্ধও তাতে থাকে না। ভক্তির 'অন্তঃকরণ' মরণের অধিকারের সম্পূর্ণ ওপরে, সম্পূর্ণ বাইরে। তার হাত পা কাণ চোখ মুখও 'জড়ের' সীমানা ছাড়িয়ে। জগতে থাক-লেও এই শুদ্ধ প্রাণের দেহ ভক্তের জড় দেহের আড়ালে এসে দাঁড়ায়, অমর লোকে যাবার সময়, অমর লোকে থাকবার সময়, ঐ শুদ্ধ দেহই ভক্তের একমাত্র দেহ হয়। এখানে ওখানে দুই খানেই ভক্তের শুদ্ধ দেহের, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের, ভিতর দিয়ে, শুদ্ধ প্রাণের পূর্ণ জ্ঞানই আয়ত্ত হয়। খোলা প্রাণে ঢাকা চাপা জ্ঞানের অবকাশ নেই।

ভাই এইবার একবার প্রাণভ'রে ভাব ভক্তির জ্ঞানের কত বড় মহিমা, কত বড় প্রভাব! ভক্তিতে যার প্রাণ পরিপূর্ণ হয়েছে, যে সকল অবস্থায় মহাপ্রাণ শ্রীবিষ্ণুকে প্রাণে প্রাণে জড়িয়ে ধ'রে প্রাণের যন্ত্র চলাতে শিখেছে এবং চলাতে পেরেছে, তার কোথাকারও কিছু না জানা থাকতে পারে না। ভক্তির টানে প্রাণের বিষ্ণুকে প্রাণে

টেনে এনে, তাঁর অনুগ্রহে তাঁর বিশ্বলীলার সকল রহস্যই ভক্তের প্রাণের সামনেই জাজ্বল্যমান হয়। মহাপ্রাণের একভাগে একদিকে দাঁড়িয়ে বিশ্বজোড়া ভাব নিয়ে জগতের কোন্ জিনিষ তার 'অপ্রত্যক্ষ' থাকবে? তুমি ভাই এ জীবনে কত দেখলে দেখবে, কিন্তু কতটুকু দেখলে আর দেখবে ভাই? সারা ব্রহ্মাণ্ডের হিসাবে তোমার সারা জীবনে কতটুকু জানা হ'তে পারে? হতে পারে না ব'লে প্রাণেরই তাড়ায় তুমি সব জানতে কোটি কোটি জন্ম এই জগতে হয় ত ঘুরবে, ঘুরে ফিরে একে একে সব জানবার চেষ্টা অবশ্যই ক'রবে। কিন্তু সব দেখা, সব জানা, একবারে তোমার কখনই ঘ'টে উঠবে কি? উঠতে পারে না, উঠা অসম্ভব। ছোট প্রাণ, ছোটই জানবে। কিন্তু ভক্তির ভাবে, ব্রহ্মাণ্ডের যিনি প্রাণ, ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণ যাঁর অধিকারে পূর্ণ দেহে, পূর্ণ সাজে সাজান, তাঁকে হৃদয়ের মাঝে এনে দাঁড় করাতে পারলে, তুমি যা দেখবে তা ব্রহ্মাণ্ডের নকল প্রাণের ভাঙা গড়া দেহ নয়, দেখবে পূর্ণ 'বিশ্বরূপ', তাতে সকল জীবের সকল প্রাণের আসল সজ্জা, আসল ভাব। ভক্তির দিব্যচক্ষে কিছুই অপ্রত্যক্ষ থাকবে না। আর শুধু এই ছোট মরণের দেশের ভাব কেন, মরণের ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সব অমর ভাব থাকতে পারে না, মরণের জগতে যে সব ভাবের কল্পনাও ক'রতে পারে না, যে সব ভাব 'তোমার' হবে ব'লে তোমার ধারণাই হ'তে পারে না, যা তোমার বুদ্ধি বিবেচনার একবারে অতীত, সেই সব নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ ভাব, সেই পূর্ণ সুখের, পূর্ণ জ্ঞানের, পূর্ণ জীবনের সমস্ত ভাব, যে সব প্রাণে সেই সব ভাব জড়িয়ে থাকতে পারে, সেই সবই, ভক্তির চরম জ্ঞানে তোমার প্রাণের চোখে প'ড়বে। সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত কলা, মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে সেই অমরধামে বিরাজমান। ভক্তির ভাবে তুমি এ সমস্তের সন্ধান তোমার প্রাণেই পাবে। নিত্য ভক্তদের নিয়ে, নিত্য জীবনের নিত্য সখাদের নিয়ে, সকল জ্ঞানের, সকল সুখের, সকল প্রাণের যাঁতে পূর্ণ অধিষ্ঠান, সেই মহাপুরুষ, প্রাণে প্রাণে মহাপ্রাণের আকর্ষণে যে সব খেলা খেলছেন, নিয়তই খেলছেন, ভক্তির

প্রাণে ভক্তের ভগবান্ আপনিই তা দেখিয়ে দেবেন। ভক্তির জ্ঞানে মানুষ ভগবানের সকল মহিমাই জান্‌তে অধিকার পায়। ভক্তির জ্ঞান ছাড়া এ অধিকার অন্য জ্ঞানে অসম্ভব। কোটি কোটি 'জড় বিজ্ঞান' জ্ঞানের এই পূর্ণ মহিমার পরিচয় দিতে পারে না। ভক্তেরই এই সৌভাগ্য ঘটে, আর কাহারও নয়।

ভক্তিতে মানুষ, ভাই, কেবল ভগবান্‌কেই বোঝে না, ভগবানের মহিমাই বোঝে না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বুঝতে পারে, নিজেকে সকল রকমেই বোঝবার অধিকারী হয়। জগতের ভাঙ্গাচুরো মানুষ, ভাঙ্গা-চুরো আর আর জীবের সঙ্গে নিজের তফাৎ বোঝে বটে, কিন্তু কেউ 'পূর্ণ' না হওয়ায় সে বোঝা কখনই তার ঠিক বোঝা হ'তে পারে না। 'বিবেচনার' যেখানে আসল উপকরণই পূর্ণ মাত্রায় নেই সেখানে 'বিবেচনা' শুদ্ধ হবে কি ক'রে? তা ছাড়া জগতের জীবের সঙ্গেই নিজের 'সমান' 'অসমান' ভাব বিবেচনা ক'রেই মানুষ জগতে নিজেকে বোঝে, কিন্তু যিনি আসল প্রাণের মহাপ্রাণ সেই মহাপ্রাণীর সাক্ষাৎ কোনও পরিচয় ত 'বিজ্ঞানের' মানুষ পায় না। আসলের দেখা না পেয়ে, নকল নিয়ে যে জগতে চলা ফেরা করে, সে নিজের আসল ভাব বোঝবার, বিবেচনা করবার, শক্তি পাবে কোথা থেকে? ভক্তিতে আসলের দেখা পেলে, তখন প্রাণের আসল বিবেচনা বুদ্ধিতে মানুষ বুঝতে পারে সে কে। তখন সে ধ'রতে পারে কার টানে তার প্রাণ বাঁধা, কার সে নিত্য 'অনুচর,' কার টানে তাকে ঘুরতে হয়। আরও সে বোঝে তার মতন কত মানুষ, কত খাঁটি মানুষ, এই রকম তাঁকে ধ'রেই জীবন পেয়েছে। আর আর সকল প্রাণের, সকল প্রাণীর, পূর্ণ ভোগের দেহ ভক্তির চক্ষে মহাপ্রাণের অধিষ্ঠানে দেখে, ভক্তের নিজেকে জানবার, নিজেকে বোঝবার, কোনও উপকরণেরই অভাব হয় না। ফলে ভক্তিতেই মানুষ আপনাকে চিনতে পারে, আর কিছুতে পারে, না।

আপনাকে আসল ভাবে বুঝে, আর সবাইকে আসল ভাবে বুঝে,

ভগবান্‌কে আসল ভাবে বুঝে, ভক্তকে নকলের খেলা, নকল সৃষ্টির রহস্য, জানতে আর কষ্ট পেতে হয় না। আসলের ধারা যত দিন মানুষ না বুঝতে পারে, ততদিন নকলের ধারাকে আসল ভাবাই তার পক্ষে একমাত্র ভাববার পথ। আসলের ধারা দেখলে তবে নকলের ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়ে। ভক্তির ভাবে ভক্তির জ্ঞানে যখন আসলের 'প্রতিষ্ঠা' বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন নকলের প্রতিষ্ঠা যে রীতিতে, সে রীতিতে কেন নকল ভাব আসে, কেন অপূর্ণ ভাব আসে, তা অমনিই বোঝা যায়। পূর্ণের অপূর্ণ হ'য়ে পূর্ণ হওয়ার চেষ্টাই নকলের চেষ্টা। এই চেষ্টাতেই নকলে জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনের স্রোত। নকলের সঙ্গে জন্মের ধারা, মৃত্যুর ধারা, দুটা নিয়ে ভোলা জীবনের ধারা, চিরকালই থাকে। পূর্ণের ভাগীদার না হ'লে এ রহস্যটুকু বোঝে কার সাধ্য? ভক্তির জ্ঞানই স্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে জগতের জীবনের পর্দ্দা, জন্মের সূতা, মরণের সূতা, আর ভুলের জীবনের সূতাতেই গাঁথা। পূর্ণ জীবনের বুকে এই পর্দ্দা আড়াল দেওয়া থাকে, পূর্ণ জীবন কিন্তু নিজের কাছে নিজে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকট।

ফল কথা ভক্তির জ্ঞানে সকল প্রাণের একটানে বাঁধা ভাব বুঝে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ চোখের সামনে দেখে, ভক্তির প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে সকল রকমেই পূর্ণ জ্ঞান পায়। ভক্তির জ্ঞান জানবার জিনিষ জেনে, না জানবার জিনিষ ও জেনে, ভুল ভ্রান্তির তত্ত্ব বুঝে, নিজের তত্ত্বও বেশ ক'রে বুঝে নেয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজের তফাৎ কি, বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধই বা কি, তা ভক্তির জ্ঞান ছাড়া অন্য জ্ঞানে বোঝা যেতে পারে না। ভক্তির জ্ঞানের, পূর্ণ জ্ঞানের, তাড়াতেই বিজ্ঞানের প্রসার, বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। ভক্তির পূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই বিজ্ঞানের ছোট অধিকার, ছোট প্রাণের ওপর আধিপত্য।

ভক্তির জ্ঞান অবহেলা ক'রে অন্য জ্ঞানের জন্যে যে লালায়িত হয় সে নিতান্তই মূঢ়। জগতের জ্ঞান ভুল জ্ঞান ভেবে আপনাকে জানতে

চাও উত্তম কথা। কিন্তু ভাই আপনাকে জগতের জ্ঞানের বাহিরের জিনিষ ব'লে যদি জ্ঞানহীন 'পাথর' ভাব তবে তুমি বড়ই ভুল ক'রলে। প্রাণে জানবার ঝোঁক আছে ব'লেই যে প্রাণ জগতের জ্ঞান কুড়ুতে যায় এটা না বুঝেই তুমি এই ভুল কর। যা নেই তা শুধু শুধু হয় কি ? প্রাণে যদি জানবার ভাব না থাকে ত কখনই প্রাণ জানতে চাবে না। 'পাথুরে জ্ঞানী' নিজেকে চিনতে পারে না ভাই। আর এক রকম 'জ্ঞানী' আছে, সে জ্ঞানীর কথা এই, যে জগতের জ্ঞান, জগতের ভুল জ্ঞান, সরাতে পারলে, প্রাণে জাগবে শুধুই জ্ঞান, সে জ্ঞান জানবে নিজেকেই নিজে। এ জ্ঞানে জানবার কিছু নেই, জানবার কেউ নেই। কিন্তু ভাই এমন জানা কি জেনেছ যে তাতে জানবার কিছু থাকে না। সে জানা ত না জানাই। এজ্ঞানে আর অজ্ঞানে তফাৎ কি ? ব'লবে অজ্ঞানে ভুলের জ্ঞান, আর জ্ঞানে সেই ভুলের জ্ঞানের নাশ। ভাল, জ্ঞানের পূরা পূরি অভাবে আর এই কেবল জ্ঞানের জ্ঞানে ত কোনও ভেদই দাঁড়ায় না। না ভাই, জানবার ঝোঁকে যে 'এটা এই, এটা ওই নয়' এই জ্ঞান পেতে চাও, সেটা জ্ঞানের গোড়া থেকে টেনে উপরে ফেলতে যেও না। সেটা তোমার অধিকার ছেড়ে কথা। ফল ভক্তির জ্ঞান শুদ্ধ বুদ্ধি বিবেচনার জ্ঞান ,তোমাব আসল জ্ঞান। সেই জ্ঞান প্রাণ ভরা পূর্ণ জ্ঞান।

(১২)

ভক্তির সুখ।

সুখের জন্য ভোগের দরকার এ কথা সবাই জানে, সবাই মানে। চুপটি ক'রে ব'সে থেকে কেউ সুখ পায় না। যার বড় কষ্ট হ'য়েছে,

যে সুখ হারিয়েছে, সেই চুপটি ক'রে জড় সড় হ'য়ে বসে থাকে। সুখ পেতে প্রাণ ঘুরে বেড়ায়, এখানে ওখানে খুঁজে বেড়ায়। যেটা ভোগ ক'রে প্রাণের তৃপ্তি হবে মনে মনে হয় সেইটা ভোগ করবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। যে উপায়ে সেই ভোগটা প্রাণের জোটে সেই উপায়টা আগে ধ'রতে চায়। সেই উপায়টা ধ'রতে না পারলে অন্য উপায়ে যদি সেই সুখের ভোগ হ'তে পারে সেই উপায়টার দিকে প্রাণ দৌড়ে যায়। এইরকম ছুটা ছুটি ক'রে যদি ভোগটা হ'ল ত প্রাণ সুখ পেলে, নইলে প্রাণের মস্ত দুঃখ। সারা জীবনটা মানুষের, মানুষের বা শুধু কেন, সব প্রাণীরই এই রকম সুখের ভোগের চেষ্টায়, সুখের ভোগের উপায় খুঁজতে, খুঁজে পেতে, সেই সেই উপায় ধ'রে সুখের ভোগ ভোগ ক'রতে, কেটে যায়। কাটে বটে, কিন্তু সুখের ভোগ পেয়েও সুখ কতটা মানুষের ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে ভাই? যেটুকু পাওয়া যায়, ভোগে যে সুখ টুকু হয় ব'লে মনে হয়, তার মাত্রা বড়ই কম। শুধু আয়তনেই যে কম তা নয়, কালের পরিসরেও বড় কম। যৎ কিঞ্চিৎ একটু আধটু সুখ হয়, তাও কালে ভদ্রে হয়, সকল সময় কিছুতেই হয় না। যেটুকু যখন হয় সেই টুকুই কি খাঁটি পাওয়া যায়? তাও নয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে ত সুখের উপকরণ কুড়োন হয়, কিন্তু সে উপকরণে যে দুঃখ মাখান থাকে। চোখদিয়ে রূপ দেখে প্রাণে সুখ পেতে চাও? কখনও কোথাও নিখুঁত রূপ খুঁজে পাওনা, রূপের ভোগও কাজেই প্রাণের মনের মত ঘ'টে ওঠে না। নাক দিয়ে, কাণ দিয়ে, জিব দিয়ে, ত্বক্ দিয়ে, যে সব বিষয় ভোগ কর, যে গন্ধ, যে শব্দ, যে রস, যে স্পর্শ, লাভ ক'রে তৃপ্তি পাবে ব'লে ভাব, সে সবেও প্রাণের আসল তৃপ্তি হয় না। নিখুঁত সুগন্ধ, নিখুঁত সুস্বর, নিখুঁত সুরস, নিখুঁত সুস্পর্শ, ভাগ্যে কারুরই হয় না। যতই ভোগের জিনিষ ভাল হ'ক তবুও তাতে যেন কি যেন কি একটু কমি থেকে যায়। এইত এক ভাব। আর এক দিক্ দিয়ে দেখ। সুখের ব'লে প্রাণ ভ'রে কিছু ভোগ করবারও জো নেই। ভোগে রোগের ভয় সঙ্গে সঙ্গে। দুঃখ যেন ভোগের আগে

জেগে থাকে। তার পর আরও একটু ভাব। ধর তুমি খুবই ভোগ ক'রছ, ভোগের জিনিষের তোমাব কিছুরই অভাব নেই। সব ভোগ ক'রেও কি তুমি ভাই যথেষ্ট হ'ল ব'লে কখনও ভাবতে পারবে ? রাজা যযাতি নাকি হাজার বছর ধ'রে সুখের সব সামগ্রী নিয়ে সুখ ভোগ ক'রেছিল। যত রকমে পেরেছিল ভোগের আর বাকী কিছু করেনি। কিন্তু সেই হাজার বছরের পর নিজের মুখেই সে না বলেছিল—"হায়রে! হাজার বছর ধ'রে সুখের ভোগে, বিষয়ের ভোগে প্রাণ সঁপলাম, কিন্তু ভোগের পিপাসা ত মিটল না! যতই ভোগ করি ততই যে আমার পিপাসা বাড়তেই থাকে। বুঝি পৃথিবীর সব বেশ ভূষা, সব খাবার দাবার, সব রূপ, সব রস, সব গন্ধ, সব শব্দ, সব স্পর্শ, মনের মতন পেয়েও ভোগ ক'রতে যদি পাই, তা হ'লেও আমার এ ভোগের পিপাসা মিটবে না"। গল্পটা গল্পই যদি ব'লতে চাও তা হ'লেও গল্পের ভিতরের কথাটা কিছুতেই নয় ব'লে উড়িয়ে দিতে পারবে না। প্রাণ ভোগ ক'রতে চায়, সুখ পেতে চায়, এ ঠিক কথা; আর সুখের ভোগ অল্প স্বল্পও চায় না, জগৎ জুড়ে চায়, একটা পৃথিবীর একটা জীবনের সুখে তার পিপাসার শান্তি হ'বে কেন? ঐ ভোগের জন্যে লালায়িত হ'য়ে কোটি কোটি জন্ম কোটি কোটি যোনিতে প্রাণ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু যতই ভোগ হ'ক, সব ভোগ সাঙ্গ হ'ল এ ধারণা প্রাণের কখনই হয়না, পূরা পূরি সব এক বারে ভোগ ক'রলাম, এ ধারণার ত কথাই নেই। জগৎ জোড়া প্রাণ জগৎ ভোগ ক'রতে চায়, নিজের তাড়াতেই চায়, কিন্তু ছোট হ'য়ে তা পেরে ওঠে না। আকাট বন্ধনে পড়ে ছোট ভোগ ভুগে সুখের ভোগ দুর্ভোগ ব'লেই মনে করে। সুখ প্রাণের জিনিষ, নিজে প্রাণ জোড়া, জগৎ জোড়া; ছোট হ'লেই, নিজেকে গুটুতে দেখলেই, নিজের জগৎ জোড়া ভাবের অভাব হ'য়েছে ব'লে সকল অবস্থাতেই দুঃখ ভাব পাবে। জগতের ভোগে, জগতের সুখে, জীবের এ দুঃখের ভাব সুখ ভাব কখনই ঘুচবেনা। সব জায়গায় সুখের সঙ্গে দুঃখ, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি। ইন্দ্রিয়ের ভিতর

দিয়ে জগৎ জোড়া সুখ প্রাণের ভিতর ঢুকতেই পায় না। আর জগতের সুখ ইন্দ্রিয় ছেড়েও পাবার নয়। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই ভোগের জিনিষ বাঁধা, সে সূতা ছেঁড়বার নয়। মনে মনে সুখ পেতে যদি চাও তা হ'লেও ভেবনা ভাই মনে মনে পূরো সুখী হ'তে পারবে। তোমার অন্তঃকরণ ত আদৌ বিষয়ের সুখ ছাঁড়া অন্য সুখ পেতেই দেবেনা। এক রকমে না একরকমে মনের সুখ বিষয়ের সুখেরই একটা ধারা। মনে মনেও যা ভোগ ক'রবে, তাও ইন্দ্রিয়ের জিনিষই মনের সামনে রেখে। কাজেই সেই অসম্পূর্ণ ভাব, সেই ছোট ভাব, সেই দুঃখ মাখান ভাব, না থেকে পারবে না। যা বাইরে ভোগ ক'রছ মন তাই জোড়া তাড়া দিয়ে সাজিয়ে মনের ভিতর ভোগ করে, নূতন ভোগ মনের তৈরী করবার ক্ষমতা একেবারেই নেই। যদি বল, ভাল, ভোগে সুখ পাওয়া যাবে না ব'লেই মনে বেশ ক'রে ভেবে নিয়ে ভোগের ইচ্ছে তাড়িয়ে দিয়ে, মনে দুর্ভোগের হাত থেকে এড়ান পেতে পারবে, পেলেই সুখ পা'বে—না ভাই, সে আশাও তোমার ভুল আশা। সুখ ভোগেরই জিনিষ, ভোগের অভাবে সুখ কি রকম ক'রে হবে, আর প্রাণকে ভোগ থেকে টেনেই বা নেবে কি ক'রে? প্রাণকে তোমার মনের ভিতর গুটিয়ে আনলেও প্রাণ মনের মধ্যেই ভোগের বিষয় তৈরী ক'রে নিয়ে ভোগ করবে। প্রাণ 'জড়' হবে না। ভিতরেই টান,আর বাহিরেই ছাড়, সে ভোগ খুঁজবে, সুখ খুঁজবে। নিজের ভাব সে নিজে থেকে উপড়ে ফেলে দিতে পারবে না। ও কথা বাজে কথা। জেগে, ঘুমিয়ে, কাজে থেকে, ভাবনা ভেবে, প্রাণ সুখ কৈ, সুখ কৈ, ক'রেই ঘুরবে। ভোগের শান্তি প্রাণে নেই, কেননা প্রাণ 'প্রাণঘাতী' হ'তে পারে না। যত দুঃখের মধ্যেই পড়ুক' যত দুর্ভোগই ভোগ করুক, সকল দশাতেই অন্ততঃ নিজে ভোগ ক'রতে পাচ্ছি, বাঁচতে পাচ্ছি, এটুকু বুঝেও, সুখ পাবে। ঐ নিজস্ব টুকু প্রাণের কাছ থেকে কখনও কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

প্রাণের ঐ নিজস্ব সুখটুকুর মর্ম্ম ঝুঝলেই বুঝতে পারবে ভাই

কেন জগতের ভোগে প্রাণ খাঁটি সুখ, পূরা সুখ, পেতে পারে না। সুখ, যখন প্রাণের আসল ভাব, তখন প্রাণের সন্ধান না পেলে সুখের সন্ধান কে পাবে? জগতের কাজে, জগতের ভোগে, এই আসল প্রাণ আসল ছাড়া হ'য়ে বসে। সে নকল প্রাণ হ'য়ে জগৎ ভোগ ক'রতে বেড়'য়। কাজেই মিছে সুখের হাতেই পড়ে। তার বুদ্ধি মমতা মন ইন্দ্রিয় সবই নকল প্রাণের সাজ। সবই ছোট, সবই প্রাণের ভাব খর্ব্ব ক'রে, প্রাণের প্রভাব নষ্ট ক'রে, প্রাণীকে জগতের ভোগ ভোগায়। কোনটায় কি হয়, কি হ'তে পা'রে, এ ঠিক করবার শক্তি যার কম, দুদশটি ছাড়া বেশীকে যে আপনার ক'রে আপনার ভোগে আনতে পারে না, এক সময়ে অতি সামান্য ভোগে ছাড়া বেশী ভোগে যে মন লাগাতে পারবে না, মন দিয়ে এক মনে দেখলে যে শুনতে পাবে না, শুনলে যে দেখতে পাবে না, সে প্রাণ সে বাঁধা প্রাণ, আর নিজকে কতটা ছড়াতে পারবে? নিজেকে ছড়াতে না পারলেই ত তার বড় প্রাণের বড় সুখ, আসল প্রাণের আসল সুখ ভোগ করা হ'লনা। প্রাণের নিজের উচ্ছ্বাসেই সুখ, তার অভাবেই দুঃখ। এই ত গেল এক্ কথা। আরও এক কথা আছে। প্রাণ নিজের কাছেই নিজের সুখের সোয়াদ পাবে বটে, কিন্তু অপর প্রাণের খোঁজ পেলে, তাকেও নিজেরই একটা ভাব, একটা দিক্, ব'লে মনে ক'রতে পারলেও ত, খাঁটি সুখই পাবে। জগতের ভোগে প্রাণ জগতের জিনিষে এ প্রাণের ঠিক খোঁজ পায় না। যে ভোগ ক'রতে চায় তার প্রাণের মত, যা ভোগ ক'রতে চায় তার প্রাণটাও ঠিক ঐ রকমে নকলের ঢাকনে ঢাকা। জগতের প্রাণ, জগতের জীবের প্রাণ, সব জায়গায় এই ঢাকায় প'ড়ে আসল ভাবে কখনও কারও ভোগে লাগে না। জগতের প্রাণ ও আমারই মত নিজেকে ছোট ক'রে সাজিয়ে রাখে, আর সে সাজান মনের মতন, প্রাণের তৃপ্তির মতন, হয় না ব'লে ভেঙে চূরে সকল সময়েই গড়ে। জগতের প্রাণ, বিবেচনার দোষে, আপনার ভোগের মতন ক'রে সব সাজাতে না পারবার দোষে, সাজাবার গোজাবার

সংকল্প সব সামঞ্জস্য ক'রে না ক'রতে পেরে, মোটামুটি সব একবারে এঁচে নিতে না পেরে, এই রকম কেবল ভাঙা গড়া নিয়েই আছে, আসল প্রাণের ভাব, যে ভাবে খাঁটি সুখের সব ক'রতে পারা যায় প্রাণের সেই ভাব, কখনও প্রকাশ ক'রতে পারে না। এই ত ভোগ, এই ত ভাই ভোগের বিড়ম্বনা। ভোগ যে ক'রবে সেও আসল প্রাণ দিয়ে ভোগ ক'রবেনা, যাকে ভোগ ক'রবে তারও আসল প্রাণের নাগাল পাবে না। দুদিক্ দিয়ে নকলের ভোগে নকল সুখই হবে বৈ আর কি হবে? আসল প্রাণ যদি আসল হ'য়ে ভোগ ক'রত, ভোগে আসল প্রাণের সন্ধান পেত, সেই আসল প্রাণটাকে আবার নিজেরই মহাপ্রাণের ভাব ব'লে বুঝে উঠত, তা হ'লে ভোগের সুখও আসল সুখ হ'ত।

সার কথা এই, সার সুখ পেতে হ'লে, সার সুখ বুঝতে হ'লে, প্রাণের দুধারেই প্রাণকে বুঝতে হবে। আর বুঝতে হবে দুধারের প্রাণের টান, আর এক বড়র টানে দুধারের প্রাণের বাঁধন। যা ভোগ ক'রবে সে যদি তোমায় একবারে প্রাণের কাছে টানে, তুমি যদি তাকে একবারে প্রাণের কাছে টান, আর দুই প্রাণই যদি এক প্রাণের, সুখের একটা মাত্র অধিষ্ঠানের রকম ভেদ, দুইটা ভাগ হয়, তবে তোমার খাঁটি সুখের, প্রাণ ভরা সুখের, সব উপকরণই পাওয়া গেল। প্রাণ প্রাণকেই টানে, সব প্রাণই বড় একটা প্রাণের টানে আবার চলে। এই টানই প্রাণের অনুরাগ, প্রাণের প্রীতি, প্রাণের ভালবাসা, সকলের চেয়ে উত্তম ভোগ ব'লে বোঝ। জীবের প্রতি জীবের যাতে প্রীতি হয়, জীবের যাতে জীবের প্রতি টান পড়ে, আর সেই টানের সঙ্গে, সেই প্রীতির সঙ্গে, সকল জীবের প্রাণের কেন্দ্রে প্রীতির টান পড়ে, সেইটাই জীবের ভাই পরম সুখের ভোগ। এই ভোগে দুঃখের লেশমাত্রও হ'তে পারে না। প্রাণের প্রীতির টান প্রাণ ছেড়ে থাকে না। প্রাণ ভ'রে পার যা ভাল বাসতে, সে তোমার প্রাণের প্রাণের জিনিষ না হ'লে ভাল বাসবে কেন? পরকে আপনার কচ্ছি ভাবলেই ত পর ঠিক আপনার হয় না, কিন্তু

পর যখন ঠিক আমারই প্রাণের, প্রাণের প্রাণের একটা ভাগ হবে, তখন সে ঠিক আপনারই হবে। সেই ভাগকে চিনে নিজের প্রাণে গাঁথতে পারলে, তাকে টেনে এনে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে, সেই প্রীতির সুখে, প্রাণের শুদ্ধ সুখই ভোগ ক'রবে। প্রাণ ঐ প্রাণের সঙ্গ পেয়ে নিজেই পূর্ণ হবে, পূর্ণ হ'য়ে নিজেরই পূর্ণ সুখ দেবে। প্রাণের প্রীতিতেই প্রাণ পূর্ণ হয়, অন্য কোনও রকমে পূর্ণ হ'তে পারে না। প্রীতির টান বুঝতে পারলেই প্রাণ বড় প্রাণের টান বুঝতে পারে, পেয়ে বড়র সঙ্গে মিশে একবারেই পরিপূর্ণ হ'য়ে পড়ে। প্রাণের শুদ্ধ প্রীতির এমনি মহিমা। প্রাণের এই শুদ্ধ প্রীতি প্রাণের ভিতর সকল সময়েই আছে, কেননা প্রাণের এ টান নূতন ক'রে ক'রে দিতে হয় না। জগতেও প্রাণ চারি দিকে, প্রাণের দিকে প্রাণের টানও চারিদিকে। এই টানের ঝোঁকেই প্রাণ জগতের সব ভোগ ক'রতে চায়। কিন্তু হায়! ভোগ করতে গিয়ে নকল প্রাণের বাঁধনে প'ড়ে নিজের শুদ্ধ প্রীতি-কেও অশুদ্ধ ক'রে ফেলে। জগতের ভালবাসার প্রাণ কখনও প্রাণের দেখা পায় না, বড় প্রাণের দেখাও পায় না। প্রায়ই 'জড়' দেহকে ভালবাসার জিনিষ ক'রে, মরার ভোগকে জীবনের ভোগ ক'রে, প্রাণ জীবনে মরে। বেঁচে ম'রে মরণের সমস্ত দুঃখ প্রাণকে ভোগ ক'রতে হয়।

এ বিড়ম্বনার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় ভাই প্রাণের 'ভক্তি। ভগবান্‌কে ভক্তি ক'রতে শিখলে, ভক্তি ক'রতে পারলে, এ দুঃখের বিড়ম্বনা, এ প্রীতির টানে অপ্রীতির ভোগ মানুষকে ভুগতে হয় না। যে রকম ক'রেই পার ভগবান্‌কে ভালবাসতে শেখ, ভগবান্‌কে ভালবাস। তাহ'লেই তোমার ছোট প্রাণ আর ছোট প্রীতির টানে পড়'বে না। যখন বুঝবে নিজের প্রাণ সেই মহাপ্রাণেরই এক ভাব, এক ভাগ, এক দিক্, এক ধারা, তখন সেই মহাপ্রাণের ধারায় নিজের প্রাণকে আর ছোট দেখবে না, ছোটর হাতে প'ড়তে দেখবে না, মরণের অমঙ্গল অধিকারে দেখবে না। ব্রহ্মময়, বিষ্ণুময়

শিবময় প্রাণ তোমার তখন সমস্ত প্রাণকে আপনার বুকে তুলবে, আপনারই নানান্ ভাব নানান্ ভাগ ব'লে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝবে। ভক্তির ভাবে, ভক্তির ভাগে, সব ভাগই একভাগে আসবে, এক ভাগই সব ভাগে ছ'ড়িয়ে প'ড়বে। ভক্তির 'মহাকর্ষণ' বিশ্ব জুড়ে শেষে বিশ্বের ওপরে প্রাণকে টেনে তোলে। ভক্তের সবাই, ভক্ত সবাইকের। ভক্ত 'বিষ্ণু'র, 'বিষ্ণু' ভক্তের। ভক্তের 'প্রীতি' সকল জীবে, সকল জীবের প্রীতি ভক্তে। ভক্ত ভালবাসে ভগবান্‌কে, ভগবান্ ভালবাসে ভক্তকে। ভক্ত পূর্ণ, ভক্ত পূর্ণেরই 'পূর্ণ' ভাগ। ভগবানের ভক্তিতে মানুষের যে জীবে প্রীতি, পূর্ণ হ'য়ে সে পরম সুখের। ভগবানের ভক্তিতে মানুষের যে ভগবানে প্রীতি তাতেও অনন্ত সুখ। এই প্রীতিতে ভুলের পর্দ্দা, নকলের পর্দ্দা সরে যায় ব'লে এতে ভুলের দুঃখ আসবার অবসর পায় না। ভক্তের ভোগ সকল সময়েই নিখুঁত খাঁটি ভোগ।

ভগবানে ভক্তি যে পেয়েছে, ভগবানের শুদ্ধ মহাপ্রাণে আপনার প্রাণ যে টেনে বেঁধেছে, জগতের ভোগেও তাই তার আর দুর্ভোগ ঘটে না। জগতের ভোগের খুঁতের জিনিষে সে নিখুঁতটুকুই ভোগ করে। জগতের নকল জীবে সে সব জায়গায় আসল জীবের সন্ধান পায়। তার কাছে মরা কেউ নয়। গাছ পালা পোকা মাকড় থেকে ওপরে ওপরে যত জীবেরই সে প্রাণের সঙ্গ চায়, সকল জীবেরই পূর্ণ ভাব তার ভোগের চোখে। এক কথায় মরণের ভূমিতে সে অমর লোকেরই বিস্তার দেখে। মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা সবই তার কাছে সকল সময়ে পূর্ণ অক্ষয় অমর জীবন্ত মূর্ত্তিতে। নকল পর্দ্দা তুলতে জানে ব'লে সবই তার কাছে আসল। প্রাণের নিজের অধিকারে যে প্রাণকে নিয়ে গেছে, সেখানে সে মরণের ছবি দেখবে কেন, মরণের দেহের টানে প'ড়বেই বা কেন? মরা তার চোখে বেঁচেই আছে। ভাঙা গড়া মূর্ত্তি তাঁর চোখে পড়ে না, শোকের আঘাত তার প্রাণে এসে লাগে না। ব্রহ্মাণ্ডময় সে ঘুরে বেড়াক, ইচ্ছে ক'রে হয় ত হাজার হাজারবার রকম রকমের দেহ ধ'রে সে সংসারে আসবে

তা আসুক, তার প্রাণ গাঁথা আছে বড় প্রাণে, বড় প্রাণের অধিকারেই সে সব দেখে, কাজেই সে যেখানে যেমন অবস্থায় চলুক ফিরুক না কেন, তার প্রাণের খবর তার কাছে আছে ব'লে তার প্রাণের ভালবাসা কখনও যাবার নয়, সেই ভালবাসায় তার প্রাণের সুখও যাবার নয়। তার কাছে সুরূপ কুরূপ নেই, সুরস বিরস নেই, সব জিনিষে প্রাণের নাগাল পেয়ে সে সবই আপনার কাছে 'সু'ই দেখে। ভাঙা চূরার প্রাণেই সু কু; আস্ত প্রাণে, অমর প্রাণে, খাঁটি প্রাণে সবই সু। সংসারের লীলা ছেড়ে অমর লোকে, বৈকুণ্ঠ লোকে, যখন ভক্ত চলে ফেরে, তখন ত আর তার কাছে 'কু'র কথাই নেই। সবই সেখানে প্রাণময়, জড়ের নাম গন্ধও নেই। জগতের ভাঙা চূরা সেখানে ঢুকতেই পায় না। এমন অধিকারে প্রাণ প্রাণনাথকে পেয়ে, প্রাণের সাথী চারিদিকে পেয়ে, স্বয়ং ব্রহ্মময়, বিষ্ণুময়, শিবময় হ'য়ে,সকল দিকে সকল রকমেই ব্রহ্মের বিষ্ণুর শিবের সঙ্গ ক'রে, অনন্ত সুখে, অনন্ত প্রীতিতে, পূর্ণ প্রাণে, মরণের ভয় প্রাণথেকে একবারে ঝেরে ফেলে, জাজ্বল্যমান হ'য়ে, 'দেবতা' হ'য়ে প্রাণের খেলা খেলতে থাকে। মহাপ্রাণের, প্রাণনাথের, অনন্ত দেবতার ভাব তার প্রাণে তখন অনন্ত ধারায় জেগে ওঠে। নিজেও অনন্ত হ'য়ে সেই সব ভাবের অনন্ত আনন্দের রস ভোগ ক'রতে অধিকারী হয়। মহাপ্রাণের ভাগীদারের ভাগ সকল দিকেই সকল ভাবেই আছে। সে ভাগ কেড়ে নেবে কে? স্বাধীন ইচ্ছেয় 'ভক্ত' ভগবানের সকল রকমের লীলার সাথী হ'তে পারে। অমর লোকের সব লীলাই আনন্দের লীলা, পূর্ণ জীবনের লীলা, পূর্ণ জ্ঞানের লীলা। কোন লীলাতেই শোক মোহ মৃত্যুর সম্পর্ক নেই। ভক্তি না হ'লে কারুর ভাগ্যে এ আনন্দ ঘ'টতে পারে না। ভক্তির টানে ভক্তির প্রীতি এই পরম আনন্দ পাবার এক মাত্র পথ। ভক্তির প্রীতিই এই আনন্দে নিজের ভাবে দাঁড়ায়, আর কিছুই সে 'পূর্ণ' ভাবে দাঁড়াতে পারে না।

যদি বল ভাই ভক্তির প্রাণে ত প্রথমে আনন্দ নেই, প্রীতি নেই, শেষে আসবে কোথা থেকে? ভক্তির 'বৈরাগ্য,' ভক্তের 'বৈরাগ্য, এ ত

সকলের জানা কথা। এ কথার অপলাপ ক'রবে কি ক'রে? রাগ প্রীতি ছেড়ে যার প্রাণ, সেই হবে শেষে পরম রাগ, পরম প্রীতি? বৈরাগ্যে প্রেম! এ যে পাথরে রস! কথাটা এক হিসাবে সত্য কথাই ব'টে। কিন্তু ভাই ভক্তির 'বৈরাগ্য' প্রাণের 'বৈরাগ্য নয়। ভক্তি মরায় বৈরাগ্য, মরায় প্রীতি ছাড়তে বলে, প্রাণে প্রীতি ছাড়তে বলে না। মরণের দেহের রূপ রস ভক্তির ভোগে নয়, মরার প্রাণের খাঁটি দেহের রূপ রস ভক্তির ভোগের। মরণ থেকে স'রিয়ে এনে ভক্তি প্রাণের রসে ভক্তির প্রাণকে মাতিয়ে তোলে। প্রাণের রস অমরের 'অমৃত,' মরা দেহের রস কালকূটের বিষ। ভক্তির প্রাণ, ভক্তির দেবতা, জীবনের দেবতাকে ধ'রে, জীবনের সাগর ছেঁচে অমৃত পায়, পেয়ে অমর হয়; অভক্তির প্রাণ, প্রাণের দেবতার কাছ ছাড়া হ'য়ে, 'অসুর' হ'য়ে, ঐ অমৃত হ'তে বঞ্চিত হয়, প্রাণের দেবতার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে, উল্টাটান দিয়ে বিষের রস পেয়ে সেই জ্বালায় মরে। ভক্তি গোড়াতেই মরণের 'তীক্ষ্ণ' রস,—মরণের বিষ—থেকে প্রাণকে দূরে রাখতে চায়। মরণের টান থেকে, প্রাণের উল্টাটান থেকে, নিজেকে ছাড়াতে পারাই বৈরাগ্য। উল্টা টানের ছাড়া পেয়ে প্রাণ সোজা টানে প'ড়লেই প্রাণে প্রাণে তখন প্রাণের টান, তাই প্রাণের আসল অনুরাগ, আসল 'প্রীতি'। ভক্তির বৈরাগ্য ভাই আসল ভালবাসারই ধারা।

ভাবতে পার তবে কি 'ভক্ত' মরণের প্রাণ, মরণের প্রাণীকে, ঘৃণাই ক'রবে, তার সম্পর্কই ক'রবে না। না ভাই তাও নয়। ব'লেইছি ত, মরণের মধ্যেও সে প্রাণই দেখবে। তাই তার ভক্তির বৈরাগ্যেও সকল জীবে সমান অনুরাগ সমান ভালবাসা। প্রাণ যাতে মরে জীবকে সেই উপায় ধ'রতে দেখলে, তার অধর্ম্মে, অধর্ম্মের ফলে তার অসুখে, ভক্তের প্রাণ তাকে 'কৃপা ক'রতে চাবে, তাকে প্রাণ ধ'রতে শেখাবার উপায় খুঁজতে চাবে, তবু নিজের প্রাণ থেকে তাকে টেনে-ফেলে দেবেনা, কেন না সে যে তারই প্রাণের প্রাণের ভাগ, নিজেরই দোসর, ভাগ্যের দোষে সে বিড়ম্বার হাতে। সকল প্রাণই যে আপনার ক'রেছে

সে কোন্ প্রাণে কোনও প্রাণীকে পর ক'রবে। যার একজনও পর, সে ভক্তি কাকে বলে জানে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই ভক্তের, ভক্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের। দ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা ভক্তির ধাতের নয়। ভালবাসাই ভক্তি, ভক্তিই ভালবাসা। সবাইকের প্রাণ মরণের হাত থেকে ছাড়াব, সবাইকের প্রাণ প্রাণের দেবতার কাছে পৌঁছে দেব, সবাইকের প্রাণের এই বাড় বাড়ন্ত দেখব, মহাপ্রাণের ভক্তের প্রাণে এই ভাব ছাড়া অন্য ভাব স্থান পায় না।

বল দেখি ভাই সকল প্রাণে ছড়ান ভক্তির এ রস কি কখনও শুকুতে পারে? কখনই না। ভক্তির প্রাণ সদাই সরস। প্রাণের টান মর লোকে, অমর লোকে, দুই লোকেই। দুই লোকেই তার জীবন, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের সাথী হ'য়ে, প্রাণের বন্ধু হ'য়ে, প্রাণের কুটুম্ব হ'য়ে। তার জীবন কখনই একলার জীবন নয়। সবাইকে ভালবেসে সে 'ধন্য'। বিষয়ের বিষের রস ছাড়ে ব'লে ভক্তির প্রাণ নীরস হয় না। যে তোমায় বলে বিষয়ের রস ছেড়ে নিজের রসে নিজে ভোর পূর হ'য়ে থাক, সে আসল সত্যের কতকটা বলে, কতকটা চেপে রাখে। নিজেকে নিজে কেউ ভোগ করে না, পরকেই ভোগ করে। প্রাণ শুধু নিজেতেই গুটিয়ে এলে প্রাণের প্রীতির উপকরণ, সুখের উপকরণ, সবই এক রকম চ'লে গেল। এ অবস্থায় যে বড় প্রাণের ভাগ বুঝে না নেয়, বড় প্রাণের ভাগে সব প্রাণের খোঁজ না পায়, সে ইচ্ছে ক'রে প্রাণের চোখ বোঝে মাত্র। আপনাকে জানতে পারলে সব জানবারই অবসর হয়। সে সুযোগ না নাও তুমিই ঠ'কলে। কেটো সুখ, কেটো জ্ঞান, কেটো জীবন নিয়ে তুমি কিছুতেই থাকতে পারবে না। প্রাণ ভোগের দিকে, সুখের দিকে, সব জানবার দিকে, আপনিই ঝোঁকাবে। বড় প্রাণকে কাছে পেয়ে না দেখ, দিশেহারা হ'য়ে ইচ্ছে ক'রে ভুলের হাতে প'ড়বে। প্রাণ একবারে জড় সড় হ'য়ে কখনই থাকবে না। জড়ের ব্রহ্মাণ্ডেও জড় সব হ'য়ে থাকে না। ছুটা ছুটি ক'রে জড়ের অধিকারেও নিজেকে জাহির ক'রতে প্রাণের চেষ্টার

কোনও ক্রটি নেই। জগতের প্রাণে যে ঝোঁক সে ঝোঁক প্রাণের নিজের ব'লেই জগতে তার কিঞ্চিৎ প্রকাশ দেখা যায়। শুদ্ধ প্রাণ, আপনাকে জানে যে প্রাণ, সে এঝোঁক ছেড়ে ফেলবে, এ অসম্ভব কথা। যা আছে তা থাকবেই। জ্ঞানে ভক্তির উদয় না হ'লেই সর্ব্ব নাশ। ভক্তির প্রাণ খাঁটি প্রাণ নিয়ে আনন্দ ক'রতে পারবে, ভক্তির অভাবে সে প্রাণ উল্টা টানে প'ড়বেই প'ড়বে। ভক্তির প্রীতি ভক্তের প্রাণকে আসল ভোগে টেনে নিয়ে যাবে, কখনও আর কোনও বিড়ম্বনা তার ভাগ্যে ঘ'টবে না। তাই জীবনে মরণে ভক্তির প্রেম, ভগবানে প্রেম, জীবে প্রেম, সার কর, তা হ'লেই তুমি সোজা পথে, সোজা টানে। যে উপায়েই এই প্রীতি পাও সেই উপায়ই তোমার আদরের জিনিষ। কেবল যাচাই ক'রে দেখবে আগা গোড়া তাতে আছে কিনা, ভগবানে প্রীতি, জীবে প্রীতি। যাগ, যোগ, ভজন, যতক্ষণ, যে ভাবে, এই পথ দেখাবে, ততক্ষণ সেই সেই ভাবেই তারা জীবনের 'প্রিয়'। নইলে সে সব বিষের মত ত্যাগ ক'রবে।

(১৩)

কাজের যাগ

বেদের সময়ে, বেদে মোটামুটি যে সময়ের মানুষের আসল কাজের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সময়ে, যাগের কাজই মানুষ, বেদের মানুষ, আসল কাজ ব'লে ঠিক ক'রেছিল। যাগের উপকরণ, আড়ম্বর, অবশ্য অনেকই ছিল, কিন্তু যাগের আসল ভাবটা ছিল দেবতাকে স্তব স্তুতি মিনতি ক'রে দেবতার দয়ায় জগতে বাঁচবার মতন বাঁচবার উপায় পাওয়া। বেদের মানুষেরা তখন চারিদিকেই প্রাণঘাতক ডাকাতদের

ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্ক থাকত। ধন সম্পত্তির মধ্যে গোধনই তাদের বড় ধন ছিল। কিসে তাদের এই ধন ডাকাতেরা কেড়ে নেবেনা, কি ক'রলে ডাকাতেরা তাদের প্রাণে মারবে না, প্রাণ ধরবার ধর্ম্মে তারা সেই ভাবনারই পরিচয় দিত। তারা এই দেবতার কাছে চাইত তাদের গৃহস্থালীটে খুব জাঁকিয়ে উঠুক, ছেলে পুলে বাড়ুক, চারি দিকে তাদের বাড় বাড়ন্ত হ'ক, তারা নিরাপদে বসবাস করুক। জল আগুন বাতাস মাটী তাদের যেন সকল রকমেই প্রাণধারণ করবার সহায় হয়, কোন রকমে যেন তাদের বাড়বাড়ন্ত হবার পথে বাধা না দেয়। নানান্ ভাবে এ সব বাধা মানুষের ঘ'টতে পারে। এখনও ঘটে, তখনও ঘ'টত। তাই ঘটবার ভয় হ'লেই বেদের মানুষ দেবতার কাছে ঐ বাধা দূর ক'রে দেবার জন্যে কাকুতি মিনুতি ক'রত। প্রাণে বাঁচবার জন্যে, প্রাণে বাড়বার জন্যে, যা যা দরকার, সেই সব জিনিষ দেবতাকে খুসী ক'রে দেবতার দয়াতেই তারা ভোগ ক'রতে ইচ্ছে ক'রত। বাধা বিঘ্ন তাড়াবার ভারও তারা দেবতার ওপরেই দিত। প্রাণ বাঁচাবার, প্রাণে বাড়বার জিনিষ নানান্ রকমের, বড় বড় বাধা বিঘ্নও নানান্ রকমের, তাদের কাজেই নানান্ ভাবে, নানান্ রকমে, বাঁচাবার দেবতার আশ্রয় নিতে হ'ত। জল হ'চ্ছেনা, মাঠে ধান পোঁতা যাচ্ছে না, জলের দেবতাকে স্তব স্তুতি ক'রে ধ'রত। জল বেশী হ'য়ে সব ভেসে যাচ্ছে, গরু বাড়ী সব নষ্ট হ'চ্ছে, আর এক রকমে জলের দেবতাকে তখন খুসী ক'রতে চাইত। অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ডাকাতেরা প্রাণে মারতে আসছে, সে বিপদে প্রাণে বাঁচাবার দেবতাকে ভাববার রকম, ধরবার রকম, আলাদা ছিল। আবার চারিদিকে বনে আগুন লেগে পুড়ছে, নিজেদের ভিটে মাটি গোরু ভেড়া সেই বেড়া আগুনে পুড়ে যাবে এই ভয়ে আগুনের দেবতাকে খোসামোদ করবার ধারা আর এক রকমের ছিল। ফল প্রাণের জন্যে প্রাণের দেবতাকে নানান্ ভাবে ভেবে, নানান্ রকমে তাঁর পূজো ক'রে, নানান্ ছাঁদে তাঁর কাছে প্রাণের কামনা জানিয়ে বেদের মানুষ প্রাণের সার ধর্ম্ম পালন ক'রত। নানান্

মূর্ত্তিতে নানান্ শক্তিতে দেবতাকে বুঝে, দেবতাকে মনে মনে এঁচে, নানান্ মূর্ত্তির নানান্ শক্তির দেবতার তুষ্টির জন্যে নানান্ রকমে, নানান্ নানান্ রকমের উপকরণে, নানান্ রকম স্তব স্তুতিতে, নানান্ রকম যাগের ব্যবস্থা বেদের মানুষ ক'রত। প্রাণের দেবতাকে লোকের কাছে আলাদা আলাদা ক'রে সাজিয়ে নিলেও প্রাণের দেবতা যে এক বৈ দুই নয় একথাটা বেদের 'বিজ্ঞ' মানুষদের বুঝতে বড় বেশী দেড়ী হয় নি। এক দেবতারই যে নানা মূর্ত্তি নানা শক্তি, এ সিদ্ধান্ত বেদের অনেক জায়গাতেই দেখা যায়। তবে নানান্ রকমের কামনায় নানান্ দেবতারই দরকার ব'লে এটা নিয়ে প্রথম প্রথম বড় বেশী নাড়া চাড়া হয় নি।

যাই হ'ক যাগ ক'রে দেবতার তুষ্টি ক'রতে ব'সে আসল কথাটা বেদের বিজ্ঞ মানুষরা, বেদের ঋষিরা, ভুলে যান নি। যাগের সাজ সরঞ্জাম জাঁক জমক যাই থাক, দেবতার ওপর শ্রদ্ধা রেখে, দেবতাকে ধরবার উপদেশ সবাই দিতেন। শ্রদ্ধাই ছিল যাগের প্রাণ। প্রাণ বাঁচাবার দেবতা আছেন, তিনিই প্রাণ বাঁচাবার কাজ ক'রতে পারেন, আর করাতে পারেন, ক'রে থাকেন এবং ক'রিয়েও থাকেন, এই ভাবটাই হ'ল শ্রদ্ধার ভাব। বেঁচে থাকাবার কর্ত্তা অবশ্যই আছেন, এই ব্যবস্থাই শ্রদ্ধার মূল মন্ত্র। যজ্ঞের সব মন্ত্র, সব স্তব স্তুতি, এই মূল মন্ত্র ধ'রেই, প্রাণ ধরবার সার 'ধর্ম্মে' লাগান হ'ত। শ্রদ্ধা ছেড়ে যজ্ঞই হ'ত না। যাগ যে ক'রত তার প্রাণের দিক্ দিয়ে দেখলে তার প্রাণে শ্রদ্ধাই ছিল যজ্ঞের দেবতা। শ্রদ্ধার আশ্রয় পেলে পরে প্রাণ বাঁচা-বার দেবতার দয়া পাওয়া যায় এ বিশ্বাস অনেক আগেই বেদের মানু-ষের জ'ন্মেছিল। যজ্ঞের সাজ সরঞ্জামের আড়ম্বরের কথাটা খুব বেশী ক'রে বেদের পুঁথিগুলায় বলা হ'য়েছে ব'লে, এ আসল কথাটা যেন চাপা প'ড়ে গেছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু আসল কথাটা বেদের ঋষিরেই ব্যক্ত ক'য়ে গেছেন, খোলা খোলি ব'লে ক'য়ে দিয়ে গেছেন! বেশী কথায় কাজ কি শ্রদ্ধাই যজমানের প্রাণের দেবতা ব'লে শ্রদ্ধারই স্তব স্তুতি যজ্ঞেরও ব্যবস্থা বেদে পাওয়া যায়। "ওগো শ্রদ্ধা দেবতা,

তুমিই আমাদের প্রাণে শ্রদ্ধা জাগিয়ে দাও, দিনে দুপুরে, সন্ধ্যেয় যখনই যাগ যজ্ঞ করি যেন তোমার দয়া, প্রাণ থেকে তোমার ভাব, না হারাই' এই রকম ক'রে শ্রদ্ধাদেবতার কাছে বেদের মানুষ প্রাণের মিনতি জানাত। ফল বেদের ধর্ম্মে শ্রদ্ধাই ছিল সার জিনিষ।

ভাল ক'রে একবার ভাব দেখি ভাই, ভেবে বল দেখি, এই শ্রদ্ধাই কি প্রাণের দেবতার ভক্তিরই একধারা নয়? কাজের ভক্তি শ্রদ্ধা ছাড়া আর কি হ'তে পারে? বাঁচবার জন্যে, বাড়বার জন্যে, প্রাণ যা করে তাই ত হ'ল কাজ। সুতরাং কাজের তাড়ায় প'ড়ে প্রাণ ধ'রতে দরকার মত যখন প্রাণের দেবতাকে ধ'রতে হয়, তখন তিনিই সব করেন আর করান, তিনি নিজে থেকে সবাইকে থাকবার শক্তি দেন, তাঁর দয়ায় সবই থাকতে পারে, এবং থাকতে পায়, বাড়তে পারে এবং বাড়তে পায়। এই শ্রদ্ধার ভাব ছাড়া আর কোন্ ভাব প্রাণে জাগিয়ে রাখতে ব'লবে ভাই? আর এই ভাবের তলায় কি র'য়েছে ত'লিয়ে দেখ দেখি। তিনি সবাইকের, সবাই তাঁর, সবাইকের প্রাণে তিনি, তাঁর প্রাণে সবাই, তাঁর প্রাণের ভাগ নিয়ে সবাই বাঁচে, সবাইকের প্রাণের ভাগ তাঁর প্রাণ থেকেই। ভক্তির, প্রাণ জোড়া ভক্তির, এই ভাব শ্রদ্ধার তলায় না থাকলে শ্রদ্ধা দাঁড়াবে কার ওপর? কাজের ধারায় ভক্তি শ্রদ্ধার আকার ধ'রলেও মূলে সে বিষ্ণুভক্তি, সকল প্রাণ জোড়া মহাপ্রাণের ভক্তি, একথা না ব'ললে উপায় নেই। শ্রদ্ধার দেবতাকে যে আকারেই ভাবা হ'ক না, শ্রদ্ধার যজ্ঞে যজ্ঞের মূল দেবতা প্রাণের প্রাণ বিষ্ণুই। তিনিই যজ্ঞের ফলের মালিক, আর কেউ নয়।

যাগের আর একটা দিক্, আর একটা ভাব, ভাবলেই ভাই বুঝতে পারবে, যাগের শ্রদ্ধা প্রাণের প্রাণেরই ভক্তি বৈ অন্য কিছু হ'তে পারে না। যজ্ঞের সঙ্গে ছোট কামনা যা থাকে থাকুক, একটা জগৎ জোড়া কামনা যজ্ঞের সঙ্গে জড়ান ছিল। 'যজ্ঞ ক'রে যজ্ঞের দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্যে তাঁর তৃপ্তির জন্যে যা দেব, তা সবাইকের প্রাণ যেখানে সেই সূর্য্যদেবতার তৃপ্তির জন্যেই তাঁর কাছে পৌঁছালে তিনিই তার পর

জীব জগতের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বৃষ্টি দেবেন, বৃষ্টির জলে ফসল জন্মাবে, ফসল পেয়ে প্রাণী বাঁচবে।' এর চেয়ে আর প্রাণের বড় ভাব কি হ'তে পারে ভাই ? প্রাণের প্রাণে নিজের প্রাণ না মেশালে, তার প্রাণে সবাইকের প্রাণ না দেখলে, এভাব কি মনে কেউ ভাবতে পারে ? এক টানে সব প্রাণের বাঁধন না বুঝতে পারলে কোথা থেকে এভাব হবে ? নিজে বাঁচব, সবাইকে বাঁচাব, সবাই আমার প্রাণেরই এক একটা ভাব, সবাইকে না বাঁচাতে পারলে আমার বাঁচাই মিথ্যে, সবাই আমার, আমি সবাইকের, এসব ভাবনা যজ্ঞের কাজের প্রাণে গাঁথা। এভাব নিয়ে যে যজ্ঞ ক'রবে তার ছোট কামনা বড় কামনায় ঢাকা প'ড়বে, ছোট কামনা তাকে আর ছোট ক'রতে পার্বেনা, তার প্রাণকে আর জগতে ছোট ক'রে বাঁধতে পারবেনা। বিশ্ব জোড়া, সকল প্রাণ জোড়া ভাবে, যে কাজ, সে কাজের সাধ্য কি প্রাণকে খাট করে ?

সকল মানুষ বড় প্রাণ বোঝেনা, বড় প্রাণে কাজ ক'রতে যায়না, অথচ নিজেদের প্রাণ ধরবার জন্যে যজ্ঞের ধর্ম্ম সবাইকে ধরাতে হবে, না হ'লে প্রাণ বাঁচাতেই পারা যবে না, এই ভেবে যজ্ঞের যাঁরা ব্যবস্থা ক'রতেন, তাঁরা প্রাণের বড় ভাবটা আড়ালে রেখে দিয়েই যজ্ঞের ধর্ম্ম লোককে আগে বোঝাতেন। যজ্ঞের ধর্ম্ম কাজেই সেই হিসাবে প্রাণের ছোট ধর্ম্ম, কামনার প্রাণের ধর্ম্ম, ব'লে লোকে ভাবত। সেই ভাবটার ওপর লক্ষ্য ক'রে যজ্ঞের প্রাণ বাঁচাবার কাজকেও প্রাণ খাট করবার কাজ ব'লে আগেকার কত বিজ্ঞলোক যজ্ঞের নিন্দেও ক'রে গেছেন। করবারই কথা। কিন্তু একটা কথা ভেব ভাই। বেদের যুগে, যজ্ঞের যুগে, চারি দিকে শত্রু নিয়ে, সর্ব্বদা নিজেদের নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়া তখনকার ভদ্র লোকদের অন্য চেষ্টা হওয়া কি সম্ভব ছিল ? তা যদি না ছিল তখন ধর্ম্ম কাজের গতিকেই খাট হ'য়ে প'ড়ে ছিল বৈ কি। মানুষমারার, ডাকাতের, উপদ্রব যখন ক'মে আসে, তখনই যজ্ঞের ঐ আসল ভাবটা লোকের মনে বেশ ক'রে জাগিয়ে দেবার সুযোগ হয়। সেই ভাবে যখন যজ্ঞকে লোক দেখতে শিখলে তখন আর

যজ্ঞের ধর্ম্ম ছোট ধর্ম্ম ব'লে নিন্দে কেউ ক'রতে পারেনি। যজ্ঞের ভাবে, যজ্ঞের আসল ভাবে, প্রাণকে শুদ্ধ ক'রে রাজা জনক, আর আর কত লোক, ভগবানের প্রাণে প্রাণ সঁপতে পেরেছে, ভগবানের সব প্রাণ জোড়া ভাব পেয়েছে," । এইরকম কথা, এই রকম উপদেশ, যজ্ঞের বড় ভাব নিয়েই বিজ্ঞলোকে বেদের যুগের পরের কালে খোলা খুলি ব'লতে পারতেন, আগে পারতেন না। "মহাপ্রাণের জ্ঞানের ধারায় বেদ, বেদেই যজ্ঞের উপদেশ, সে উপদেশ কি মিথ্যে প্রাণের জন্যে হ'তে পারে ?" এ যুক্তি লোকের কাছে দেখাতে বেদের যুগের পর কারও কুণ্ঠা হ'ত না।

সকল যাগের সার কথা যে জগৎ জোড়া প্রাণের ভক্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না, যাগের আরম্ভে বেদের গায়ত্রীতেই সে কথা বেদের ঋষিরা প্রকাশ ক'রে গিয়েছিলেন। প্রাণের প্রাণের আসনে মহাদেবতার অধিষ্ঠান ক'রে, সকল জগতের প্রাণ তাঁতেই ভেবে নিয়ে, কাজের বুদ্ধিতে তাঁর সত্যের প্রাণের চালনা নিয়ে কাজ ক'রতে হবে বুঝে, তবে যাগের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান ক'রতে হবে। যাগ যে ভক্তিরই অঙ্গ এর চেয়ে আর বেশী কথায় বোঝানর দরকার হয় কি ? প্রাণে ব্রহ্মভাব বিষ্ণুভাব শিবভাব জাগিয়ে নেবার জন্যে ধর্ম্মের কাজে ব্রহ্মময়, বিষ্ণুময় শিবময় 'ওঁ' গায়ত্রীরও মূলে। যাগের আগে পাছে, ধর্ম্মের সব কাজের আগে পাছে, এই 'ওঁ'। প্রাণের সত্যি ক'রিয়ে নেবার জন্যেই 'ওঁ'। ব্রহ্মের ভাবে, বিষ্ণুর ভাবে, শিবের ভাবে, 'ওঁ'ব'লে, সত্যি গেলে, সত্যি গালিয়ে, যাগের কাজে হাত দেওয়া হ'ত, যাগের কাজ শেষ করা হ'ত। প্রাণ যে কাজকে নিজের ব'লে মেনে নিতে না পারত সেখানে 'ওঁ' ব'লে কখনই সায় দিতে পারত না। যাগ প্রাণের সত্যি কাজ, নকল প্রাণের কাজ নয়, এই জন্যেই যাগ ক'রতে ক'রতে প্রাণ ব'লতে পারত 'ওঁ'। যাগের এই ভক্তির ভাবেই বেদের সার কথা মনে ক'রে দেবার জন্য 'স্মৃতি' ব'লেচে সকল যাগের দেবতা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু।

যজ্ঞের এই আসল ভাবটি যখন লোক বুঝেছিল, তখন জীবনের সব

কাজ যজ্ঞেরই ধারায় ফেলতে ঋষিদের কোন কুণ্ঠাই হয়নি। জানবার জন্যে পড়া শুনা ক'রবে বেদ প'ড়বে, সেটা হ'ল একটা যজ্ঞ। যে যেখানে আপনার জন ম'রেছে, তাদের প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণের সম্বন্ধ বজায় আছে, সেই ভাবের পরিচয় দেবার জন্যে যে কাজ হ'ত সেটাও যজ্ঞ। মোটামুটি এক সঙ্গে দেবতাদের জন্যে যে হোম করা হ'ত সেটা ত একটা যজ্ঞ বটেই। জগতের ছোট ছোট জীবের তৃপ্তির জন্যে যে অন্ন দেওয়া হ'ত তাও একটা যজ্ঞ। আগন্তুক মানুষের জন্য যে অন্নপানের ব্যবস্থা হ'ত তাও হ'ত যজ্ঞে। দিন দিন এই সব যজ্ঞ ঘরে ব'সেও আর্য্যদের ক'রতে হ'ত। এর মধ্যে সকলের সেরা ছিল অবশ্য পড়ার যজ্ঞ। জেনে শুনে চলাই হ'ল প্রাণের কাজ, জানবার শেখবার জন্যেই বেদ। বেদ প'ড়তে গিয়ে প্রাণ কাজের সার কথার সন্ধান নিত, সন্ধান পেত। যদি কিছুও না প'ড়ত ত অন্ততঃ গায়ত্রী পাঠ ক'রে, বেদের সারভাব, বেদের সমাজে সবাইকের প্রাণে জাগিয়ে তোলা হ'ত। সকল কাজের মধ্যে বেদ পড়া, গায়ত্রী পড়া, কাজেই ছিল প্রাণের সত্যি আসল কাজ 'নিত্য' কাজ। অন্য কাজগুলাও দিন দিন করার খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থাই আগে ছিল, ক্রমে কিন্তু সে ভাব ঢিলে প'ড়ে যায়। যাই হ'ক যখন দিন দিন আর্য্যরা পিতৃলোকের 'তর্পণ' ক'রত, 'দেবতাদের হোম ক'রত, 'ভূতের' বলি দিত, 'অতিথির পূজা ক'রত, তখন সেই সেই কাজেও তাদের প্রাণের জগৎজোড়া টানের আর বড় প্রাণের টানের ভাব বোঝা যেত। মরাতেও প্রাণের সম্বন্ধ ঘোচে না, এভাব সত্যিই কি প্রাণের খুব বড় ভাব নয়? মনে রেখ ভাই ক্রমে এই তর্পণ ক'রতে ব'সে আর্য্যরা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জীবেরই তর্পণ ক'রত। যা কিছু ম'রেছে, ম'রে যে যেখানে গেছে, সবই আমার প্রাণের আপনার, এ না ভাবলে এ তর্পণ ক'রতে চায় কে? মরার তর্পণে যেমন বড়ভাবের এক দিক্ দেখা যায়, ভূতের বলিতেও তেমনি আর একটা দিক্ বোঝা যায়। আমার প্রাণের কাছে ছোটও আমার পর নয়, এখন মানুষ না হ'লেও সব জীবই আমারই দোসর, 'ভূতের' বলিতেও এই ভাব প্রাণে

গাঁথা। মানুষের পূজা, অতিথির সেবা, এ ব্যবস্থায় মানুষ প্রাণে যে সব মানুষকেই নিজের ব'লে বুঝবে তাই বোঝা যায়। তার পর সব দেবতার এক জোটে পূজায় মানুষের প্রাণে বড় প্রাণের নানান্ শক্তির শাসন অধিকারের কথা মানিয়ে নেয়। এই সব কাজের ওপর বেদের 'গায়ত্রী'র ভাব। মহাপ্রাণের প্রাণের ভাগে ভাগে জগতের সব প্রাণ ফেঁলে দিয়ে, তাঁর নানান্ শক্তি পেয়ে, জগতের প্রাণের জন্যে, জগতের প্রাণের প্রাণের জন্যে, জীবন ব'ইতে থাকব, দিনের দিনের কাজে আর্য্যরা এই মন্ত্রই সার ক'রে সকল কাজকে যজ্ঞের কাজে, বড় প্রাণের ভক্তির কাজে, দাঁড় ক'রিয়েছিল। যজ্ঞের এভাব যখন লোক ভুলে গিয়েছিল, যখন কিছুর জন্যে ক'রতে হবে ব'লে এই সব কাজ ক'রতে ধ'রেছিল, তখন সব যজ্ঞ, যজ্ঞের সব কাজ, বেদের ধর্ম্ম, ছোট কামনার ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল। কামনার মূলে সকল প্রাণের মঙ্গলের কামনা ধ'রে রাখতে না পারাতেই বেদের ধর্ম্ম প্রাণের ধর্ম্ম হ'তে স'রে এসেছিল। কিন্তু যে আসল বুঝে, আসল ধ'রে, বেদের যজ্ঞ ক'রত, তার কাছে যজ্ঞের কাজও ভক্তির কাজই ছিল। আসল ভাবে যজ্ঞ ভক্তিরই কর্ম্মের ধারা।

একটা কারণে যজ্ঞের আসল ভাব সমাজ ক্রমে ভুলে যেতে বাধ্য হ'য়েছিল। যজ্ঞ যদি প্রাণের মঙ্গলের কাজ, প্রাণীর মঙ্গলের কাজই হবে, তবে যজ্ঞে 'পশু বলি' কেন? প্রাণের মঙ্গলের কাজে প্রাণীর হিংসা, এ যে বড়ই উল্টা। 'কোনও প্রাণীর হিংসা ক'র না' এই যে বেদের মূল মন্ত্র, সেই বেদেরই আসল ধর্ম্মের কাজে হিংসারই ব্যবস্থা হয় কিসে? ব্যবস্থা ব'লে ব্যবস্থা, পশুর হিংসাই যে যজ্ঞের একটা প্রধান অঙ্গ ব'লেই ধরা হ'ত। তবে ত যজ্ঞের ধর্ম্ম প্রাণের আসল ধর্ম্ম হ'তে পারে না। ধর্ম্মের কাজ যখন যজ্ঞ ছাড়া হবে না, তখন আসল ধর্ম্মের জন্যে আর কাজের ধর্ম্ম খুঁজে কাজ নেই। শুধু জানার ধর্ম্মে কাজের হাঙ্গাম নেই, সেই ধর্ম্মই খোঁজা যাক, প্রাণের জানবার ভাবটাই বেশ ক'রে বুঝে সেইটেকেই প্রাণ ধ'রতে ধরা যাক, এই ভেবে ক্রমে

ক্রমে পরে বিজ্ঞ ঋষিরা জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করবার চেষ্টা ক'রে ছিলেন। কিন্তু বলির রহস্যটা যে তাঁরা সবাই বুঝতেন না, তা নয়। রহস্য যাই থাক, যাগে স্পষ্টই সাধারণ লোকের প্রাণ ধরবার ধর্ম্মে প্রাণের হিংসা, এটা হাজার যুক্তি দিয়েও মন থেকে তুলে ফেলতে কেউ পারত না। ক্রমে সত্য সত্যই এই হিংসার ব্যবস্থায় বেদের ধর্ম্মের আদর আর্য্যদের মধ্যে ক'মে এসেছিল। নানা যুক্তিতে বেদের যজ্ঞের ধর্ম্ম ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা হ'য়েছিল বটে, কিন্তু আর সে ধর্ম্ম প্রাণের চরম ধর্ম্ম ব'লে মানিয়ে নিতে কেউ সাহস পায়নি। যে দুটা ভাব সাক্ষাৎ একে অপরটার উল্টা, সে দুটা ভাবই একটা ভাবের দুটা দিক্ এ বোঝালে কি প্রাণ সহজে বুঝ মানে? নাস্তিকেরা বেদের ধর্ম্মের এই ভাবটা চেপে ধ'রেই বেদের মতকে কাহিল ক'রেছিল। এই চাপের ফলে হিংসার ধর্ম্ম হিংসার ভাব বজায় রেখে আর সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা রাখতে পারেনি।

আসল রহস্য এই, এই মরণের জগতে ভাল ভাবে বাঁচবার জন্যে, আপনার জনকে বাঁচাবার জন্যে, নকল প্রাণের বাড় বাড়ন্ত ভাব পাবার জন্যে, ছোটকে মেরে বড়কে সংসার যাত্রা ক'রতে হয়। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চারিদিকেই এই বড় ছোটর যুদ্ধ। সজীব তাজা জিনিষ খেয়ে মানুষের প্রাণ ভাল থাকে। মরণের মধ্যে বাঁচন যে জগতের স্বভাব তার আমল থেকে এ ভাব স'রিয়ে নেবার উপায় নেই। প্রাণ ধরবার ধর্ম্মের এই ভাবটা যজ্ঞের হিংসা বুঝিয়ে দেয়। জগতের ধর্ম্ম, অধর্ম্মের যেন ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায়। প্রাণের আসল ধর্ম্ম অবশ্যই এ অধর্ম্মের ধার ধারে না। না ধারুক, নকল জগতে যখন নকল নিয়ে থাকতে হবে, মরণ নিয়েই খেলা ক'রতে হবে, তখন নকলের মানুষকে এ ভাবটা বোঝালে ক্ষতি কি? যজ্ঞে তাই বাঁচবার ব্যবস্থায় পশু মারার ব্যবস্থা। যেমন তেমন রকমে প্রাণীর প্রাণ নিয়ে ত বাঁচতে হবে, তখন সেই বধের সঙ্গে, প্রাণের আসল ভাবটা, ভক্তির ভাবটা, জাগিয়ে রাখাই এ জগতে দরকার। শুধু বধে প্রাণ মরণের দিকেই নিয়ে যাবে,

বধের আড়ালে সকল জীবের, সকল প্রাণের, প্রাণের প্রাণের প্রীতির ভাবটা যদি থাকে, তা হ'লে মারণের বিড়ম্বনা হবে না। জীবনের কুরুক্ষেত্রই ঘটুক, আর ছোট তাজা জীবকে খেয়ে আপনার দেহ, আপনার নকল প্রাণ, কাজের মতন করাই হোক, যজ্ঞের ভাবে সমস্ত বধের নিষ্কৃতি। যজ্ঞের ভাব থাকলে তাই হিংসাও অহিংসা। যেখানে জীবনে মরণ, মরণে জীবন, সেখানে উল্টা ভাবেই সামঞ্জস্য। যজ্ঞ না ক'রে বধ ক'রনা, বধ ক'রলে অন্ততঃ পরেও যজ্ঞ ক'র, এই ব্যবস্থা বধ করবার ব্যবস্থা নয়। যে বধ ঘটে না, ঘ'টতে পারবে না, সেই বধকে বাঁচনের ধারায় তোলবার ব্যবস্থা। একদিকে শরীর ধারণ, অন্য দিকে উৎসব আমোদে প্রাণের স্ফূর্ত্তি ভোগ করা, মানুষের চাইই চাই। এই জন্যে শরীরের যজ্ঞ, আর উৎসবের যজ্ঞ, ছোট বড় হিংসা। যজ্ঞের ভাব রেখে সে হিংসাকে চাপা দেওয়াই কিন্তু ঋষিদের প্রথম সংকল্প ছিল। যজ্ঞের ভক্তির ভাবে কদাচারও সদাচার হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। যজ্ঞের আসল ভাবে হিংসার নাম গন্ধও নাই।

কালে নকলের ভাবটার বাড়াবাড়ী হ'য়েছিল। যজ্ঞের নাম ক'রে নানান্ উৎসবের সৃষ্টি হ'য়েছিল। নানান্ কামনায় নানান যজ্ঞ করা হ'য়েছিল। এটা ওটা ক'রে প্রাণ ধারণের জন্যে অনেক জীবই বধ্য ক'রে তোলা হ'য়েছিল। যজ্ঞের ধর্ম্মের কাজেই চারিদিক্ থেকে আপত্তি উঠেছিল। তর্কের খাতিরে যেমন হয়, যজ্ঞের পক্ষে যাঁরা তাঁরা এ কথা ও কথাও তর্কের ভিতর এনে ফেলেছিলেন। কেউ বল্‌লেন যজ্ঞের পশু ম'রে ডেঙ্ ডেঙ্ ক'রে স্বর্গে চ'লে যায়। গভীর রহস্য ধ'রে কেউ বা ব'ল্লেন যজ্ঞের পশু ত পশু নয়, পশুর ওপরে মানুষের ছোট কামনাগুলা চাপিয়ে দিয়ে তাই বধ করা হয়। মুখের মতন জবাব সঙ্গে সঙ্গেই মিলেছিল। 'পশুকে মেরে যদি স্বর্গেই পাঠান যায় তবে বুড়া মা বাপকে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয় কেন? কামনা চাপাবার জন্যে আস্ত প্রাণের দরকার কি? আর যদি যজ্ঞটা কোন রকমে ফেঁসে যায় তবে ত পশু মারাটাই সার হ'ল, তার প্রতিকার কি?" ফল হিংসাকে

অহিংসা ব'লে বোঝাবার চেষ্টায় ফল হয় নি। পরে ঋষিরে যজ্ঞের ভাব শুদ্ধ প্রাণের ভাব ব'লে মেনে নিলেও, হিংসার জন্য যজ্ঞের ধর্ম্মকে অশুদ্ধ প্রাণের ধর্ম্ম ব'লতে আর লোক কুণ্ঠিত হয়নি। শেষে 'ভক্তি'র ধর্ম্ম যখন লোক বুঝতে পারে, তখন যে প্রাণিবধের জন্যে বেদের ধর্ম্ম অশুদ্ধ ব'লে আপত্তি, সেই প্রাণিবধ সাহস ক'রে যজ্ঞের সম্পর্ক থেকে ভক্তিবাদের ঋষিরা তুলেই দিলেন। জীবের হিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করাই তখন হ'ল যজ্ঞের আসল ভাব। শুধু আপন হিতে জীবের জীবন উৎসর্গ করায় ধর্ম্ম অধর্ম্মের দিকেই যায় ব'লে মেনেই নেয়া হ'ল। ভক্তির ভাব যার হ'য়েছে, সে নিজের নকল প্রাণকে নকল ব'লে বুঝে, জগতের জীবের প্রাণের কাজে কোনও রকমে নিজের প্রাণ লাগাতে পারলে, সেই কাজে তার প্রাণ গেলেও তার কষ্ট নেই। ভক্তির ভাবে সে দুঃখের ওপর। তার সুখ কেউ কেড়ে নেয় না। বরং জগতের প্রাণের কাজ ক'রে প্রাণে প্রাণে প্রাণের বড় সুখের স্ফূর্ত্তি পেয়ে, সে সত্যি সত্যিই অমর লোকে চ'লে যায়। মূঢ় পশু নিজের প্রাণ দিয়ে স্বর্গে যেতে পারে না, আসল প্রাণের ভক্ত ভক্তির যজ্ঞ ক'রে আপনা আপনিই স্বর্গ পায়।

ঝগড়ার ভাব ছেড়ে দিয়ে ভাল ক'রে দেখলে দেখা যায় বেদের মধ্যেই এই সার সত্য জাজ্বল্যমান। ভগবান্ নিজে যখন এই মরণের জগৎ সৃষ্টি ক'রতে চান, তখন তিনি নিজের প্রাণকে এই মরণের বিশ্ব জুড়ে ছড়ালেন। সব পূর্ণ ক'রে, সব জুড়ে, নিজে হ'লেন পুরুষ। জগতের দিকে ছোট মরণের জীবনের ভাবটা ছড়িয়ে দিয়ে বড় প্রাণে তার ওপরে নিজে নিজের খাঁটি প্রাণের ভাবেই রইলেন। তার পর এই সৃষ্টির কাজে হাত দিয়ে তিনি যজ্ঞ ক'রলেন। যজ্ঞ ছাড়া ত কাজ নেই, কাজেই যজ্ঞই তাঁকে ক'রতে হ'ল। কিন্তু যজ্ঞ ক'রতে ব'সে ক'ল্লেন কি? দিলেন জগতের প্রাণের জন্যে, মরণ বাঁচনের প্রাণের জন্যে, নিজের ছোট প্রাণের আহুতি। নিজের ঐ 'ছোট' প্রাণ উৎসর্গ ক'রলেন, বলি দিলেন। সৃষ্টির কাজ তাতেই হ'ল। তাঁর ছোট

করা প্রাণ নিয়ে তবে জীব জগতের জীবন দাঁড়াল, তাঁর ছোট প্রাণ জীব জগৎ বাঁচালে। তাঁর মরণ বাঁচনের প্রাণ জীব জগৎকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ম'লেও কাউকে ম'রতে দেয় না। নিজের প্রাণটি স'পে এই কাজটি, এই মস্ত যজ্ঞটি, বাঁচিয়ে রাখবার এই ধর্ম্মটি, দাঁড় ক'রিয়েছেন। নিজেই নারায়ণঋষি হ'য়ে এই যজ্ঞটি ক'রিয়েছেন। নর ভক্তির ভাবে সেই নারায়ণেরই অংশ, তার প্রাণ পুরুষেরই প্রাণের ভাগ। তার যজ্ঞও এই আত্মবলি ছাড়া আর কি হওয়া উচিত ? ভক্তির যজ্ঞে ভক্ত অবশ্যই চাবে, পরের প্রাণের জন্য আমার এই নকল প্রাণ, ভুলের পাশে বাঁধা পশু, যেন উৎসর্গ ক'রতে পারি। জীবনের কাজে ভক্ত এই যজ্ঞই ধর্ম্ম ব'লে ধ'রবে। ভক্তির কাজ ভক্তিরই যজ্ঞ।

(১৪)

জ্ঞানের যোগ

জানতে গেলেই যোগ ক'রতে হয়। যোগ সব জ্ঞানেরই গোড়ায়। কে জানে আসল জ্ঞান, কে জানে নকল জ্ঞান, যোগ না ক'রলে কোনও জ্ঞানই হয় না। দেখে শুনে যা জানা যায় তাতে, দেখবার শোনবার জিনিষের সঙ্গে আগেই দেখবার শোনবার ইন্দ্রিয়ের, চোখ কাণের, বাঁধুনি বাঁধতে হয়। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, জানবার ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, পাঁচ রকম বিষয়ের বাঁধাবাঁধি সম্বন্ধ না হ'লে কোনও বাহিরের জিনিষই জানবার উপায় নাই। তার পর ইন্দ্রিয়গুলার, বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলার, সঙ্গে একে একে মনের, মমতার, আর বুদ্ধির এই তিনটা ভেতরের

ইন্দ্রিয়ের যোগাযোগ ঘটাতে হয়। তবে হয় আমাদের বাইরের জ্ঞান। একটু বড় বুদ্ধি আর মমতার ভেতরে আগেকার আগেকার জানা শুনা জিনিষ ধ'রে রেখে, সেই ধরা ভাবগুলা নিয়ে, এটা ওটা ক'রে ভাবতে হ'লে, ভেবে কিছু জানতে হ'লে, অল্প অল্প ক'রে মনের সঙ্গে সেগুলার যোগাযোগ ঘ'টিয়ে, অন্তরে অন্তরে জানা হয়। ফল বাইরের জানাই হ'ক আর ভেতরের জানাই হ'ক যোগ ছাড়া জানা চলে না।

কিন্তু, এই সব জানাগুলার পরিসর বড় অল্প। ছোট, খুব ছোট, মনের বাঁধনে এগুলা সব বাঁধা। যে দিক্ দিয়েই হ'ক মন ছেড়ে এদের জন্মই নেই। নীচের দিকে, বাইরের দিকে, ইন্দ্রিয়গুলার সঙ্গে মন, আবার ওপরের দিকে, ভেতরের দিকে, মমতা বুদ্ধির সঙ্গে মন বেঁধে তবে জানা। ত্বদিক্ দিয়েই এই যোগে জানা বড়ই ছোট জানা। একে একে এরকমেও অনেক জানতে পারা যায়, জানাও যায় বটে, তবু সে জানার ছোট ভাব কখনও ঘোচে না। কোটি কোটি জন্ম এই রকমে জেনে শুনেও ব্রহ্মাণ্ডের সব জানা যায় কি না যায়। যতটা যায় তাও কখনও একবারে নয়। সে হিসাবে খুবই ছোট ভাব এই মনের জ্ঞানে জড়ানই থাকে। ছোট নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকতে যায় তারা এই যোগই করুক, কিন্তু যারা বড় জানা জানতে চায়, একবারে সব জানতে চায়, তাদের এ যোগ নিয়ে থাকলে চ'লবে কেন? আসল প্রাণ সবাইকের বড়, জগৎ জোড়া, জগৎ ছাড়া, তার সঙ্গে জানবার ব্যাপারে দাঁড়ালে তবে বড় যোগ বড় জ্ঞান হবে। আসল প্রাণের সঙ্গে যোগ না ক'রতে পারলে আসল বড় জ্ঞানের যোগই হবে না।

কি ক'রে এই বড় যোগটা হ'তে পারে বল দেখি ভাই? স্পষ্টই বুঝতে পার বড় প্রাণে বড় প্রাণ না মিশুলে বড় যোগও হবে না, বড় জ্ঞানও হবে না। এই যোগটা ঘটাবার জন্যে তা হ'লে ক'র্ত্তে হবে কি? শোন ভাই বলি। ছোট ইন্দ্রিয়গুলাকে প্রথম ছোট বিষয় থেকে গুটিয়ে আন, তার পর বাইরের ইন্দ্রিয়গুলা ভিতরের ইন্দ্রিয়ে গুটিয়ে আন, শেষে সব জড়িয়ে সেই নকল প্রাণটা আসল প্রাণে গুটিয়ে

আন, চরমে তোমার আসল প্রাণ, সব প্রাণের প্রাণে, মহা প্রাণের পায় সঁপে দাও। এই হ'ল খাঁটি বড় যোগ। এই বড় যোগে উঠতে প্রথম ক ধাপে যোগের সঙ্গে 'বিয়োগ'। মরণ বাঁচনের প্রাণের মজাই এই। না জানার সঙ্গে জানা, মরার সঙ্গে বাঁচা, দুঃখের সঙ্গে সুখ, যে প্রাণের ধাতে ধাতে, সে প্রাণের যোগে, বিয়োগে যোগ এ আর কি আশ্চর্য্য কথা ? এই বিয়োগের ভাবটা বেশ ক'রে মনের চোখের সামনে এঁকে দেখাবার জন্যে যোগের পুঁথিতে মোটামুটি বিয়োগকেও যোগ বলা হ'য়েছে। কিন্তু ভাই এ বিয়োগের যোগ, প্রাণবিয়োগের প্রাণে, নকল প্রাণে। আসল যোগ নকল প্রাণ ছাড়িয়ে, প্রাণে প্রাণে ব্রহ্মে ব্রহ্মে! এ যোগে বিয়োগ একবারেই নেই, এ শুধুই যোগ, নিছক যোগ। মনের সঙ্গে এ যোগে যোগাযোগ একবারেই নেই। এ যোগে প্রাণই মন, প্রাণই মমতা, প্রাণই বুদ্ধি, আবার প্রাণই বিষয়। ছোটর সম্পর্ক এর কোনও ধারেই নেই, কোনও ভাবেই নেই।

এই বড় যোগে, মহাপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগে, যা জানতে পারা যাবে, তা আর ছোট হ'বে কি ক'রে ? এযোগে ভাই বাঁধনের দু ধারেই 'পূর্ণ'। একদিকে আমার বিশ্বজোড়া বিশ্বছাড়া প্রাণ, অন্য ধারে জগতের জগৎজোড়া, জগৎছাড়া প্রাণ। এ যোগের জ্ঞানে, জ্ঞানের সীমানা ক'রবে কি ক'রে ? এ পূর্ণযোগ, পূর্ণযোগে পূর্ণজ্ঞান। সব জানতে চাওত এ যোগ ছাড়া অন্য জ্ঞানযোগের আশ্রয় নিলে তা পারবে না। যা কিছু জানবার, যা কিছু শোনবার, যা কিছু ভাববার, হ'য়েছে, হ'চ্ছে, হবে, হ'তে পারে, সবই এই মহাযোগের জ্ঞানে। ব্রহ্মাণ্ডের এখানে ওখানে সেখানে, যেখানে যা কিছু, এ ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে সে ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ছেড়ে যা কিছু, ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে যা কিছু, সবই এই মহাযোগের মহাজ্ঞানের আমলে। প্রাণে সব, প্রাণ সকলে, প্রাণের যোগে সবের প্রাণ, এ কথা বলাই বেশীর ভাগ।

এমন জ্ঞানের যোগকেও উল্টে ফেলে কি না কেউ বলে চরম যোগ শূন্য জ্ঞানের শূন্য যোগ। এর চেয়ে বিড়ম্বনার কথা আর কি হ'তে পারে? নকলটা সব ন স্যাৎ ক'ল্লেও নকলের ওপর যে আসলটা সব ধারেই জেগে থাকবে ভাই তাকে ন স্যাৎ করে কে? আসল না থাকলে নকল আসে কোথা থেকে? জীবজগতের চারদিকে এই আসলের ধারে, নানান্ ভাবের এক ভাবে, নানান্ টানের এক টানে, যে খুব মস্ত একটা ভাব, খুব মস্ত একটা টান, প্রাণে প্রাণে বোঝা যায়, সেটাই বা না মানবে কি ক'রে? ইন্দ্রিয় মন মমতা বুদ্ধি গুটিয়ে আনলে নকল ফাঁক হ'তে পারে, কিন্তু আসলকে ফাঁকী দিতে পারা যায় কি? আসল যখন গুছিয়ে ব'সল, সুস্থ হ'য়ে ব'সল, সেই সময়েই আসল নেই হ'ল? টেনে টেনে সব আপনার কোলগত ক'রে খুব জাঁকিয়ে উঠে জিনিষটে উপে গেল? এ বুদ্ধি বুদ্ধির আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আত্মহত্যা করে কে? যা আছে তা যায় না, এ সার সত্য। প্রাণ সব গুটিয়ে নিয়ে জাঁকিয়ে ব'সে, সকল প্রাণটানা টানে আপনাকে ফেলে দিতে সহজেই ছুটবে। তুমি উল্টাদিকে টেনে ধর ত আবার উল্টো দিকেই ফিরবে। প্রাণের জিনিষ হাতে ক'রে ধ'রে হাত হ'তে ইচ্ছে ক'রে ছেড়ে দেবে। সকলের উঁচুতে উঠে নীচেয় লাফ দিয়ে প'ড়তে চাও পড়, কে আটকাবে? কিন্তু এটা ঠিক, প্রাণ প্রাণে উঠলেই প্রাণ ধ'রতে যাবে। প্রাণের প্রাণ ধ'রেই প্রাণের পূরো যোগ, পূরো জ্ঞান, তা যদি খালি হয় ত পূরন্ত কি?

কেউ আবার বলেন নকল ছেড়ে যোগবিয়োগের যোগে প্রাণ যেই আসলে উঠল, তখনি ত যোগের শেষ হ'ল, তার ওপরে আবার যোগ কিসের? আচ্ছা ভাই আসলটা ত মানলে, তাহ'লে আসল যা বলে তা আসল ব'লে না মানবে কি ক'রে? আসল যে প্রাণের চরম ভাব পাবার জন্যে সব আসলের সঙ্গে মিলে মিশে, পরিপূর্ণ হ'য়ে, সব জেনে, সব সুখে সুখী হ'য়ে, প্রাণ ধ'রতে চায়, এটা যদি না মান ত আসলকে তুমি ছোট ক'রলে। তার পর ভাই জীবজগতের সব প্রাণের নকল থেকে

ছেঁচে আনা, ছেঁকে আনা, সব আসল ভাবও, যদি নিজের প্রাণে পূরে, সেই সব প্রাণ নিজের প্রাণে টেনে এনে, সেই সব ভাব আপনার ক'রে, বড় হও, পূরন্ত হও, তাতেই কি তোমার পূরন্ত হওয়ায় সাধ মিটতে পারে ? অনন্ত জীবজগৎ অনন্ত জন্ম নিয়ে যে সব ভাব সঞ্চয় করে, মহাপ্রাণের অফুরন্ত লীলায় সে সব ভাবও পরিমাণে খুব ছোট। জীবজগতের জীবলীলায় শেষ হয় নি, হবে না। এড় আড়ালে মস্ত একটা প্রাণের বড় ব্যবস্থা জাজ্বল্যমান র'য়েছে। নইলে সবাই 'জড়' হ'য়ে, সবাই সবাইকের সঙ্গে আপনার হ'য়ে মিলতে মিশতে চেয়ে, মরণ বাঁচনের মধ্যে বাঁচতে চাবে কেন ? যেখানে এক রকমের দশটা সেই খানেই দশটার মূলে সেই রকমটা ধ'রে একটা থাকেই থাকে। জীব জগতের সব প্রাণের, প্রাণের হিসাবে, বাঁচবার ঝোঁকের, জানবার ঝোঁকের, সুখ পাবার ঝোঁকের হিসাবে, সব সুখের, সব জ্ঞানের, সব প্রাণের, একটা প্রাণ থাকা চাই। সেই মস্ত প্রাণ অফুরন্ত ভাবের মহাভাব। সেই মহাভাবে আপনার প্রাণের ভাব জোড়া গাঁথা দিতে না পারলে আসল যোগ হ'লই না। আপনাকে জেনে আপনার ভাবে প্রাণ যতই বড় হ'ক তবু ছোট ভাবে বড়। বড়র যোগে হবে বড় ভাবে বড়। আর শুধু আপনাকে জানা, শুধু অপনার ভাবে থাকা, জানা আর থাকা কথারই অপব্যবহার। সমান বুঝে, তফাৎ বুঝে না জানলে জানাই হয় না, সমান ভাবে তফাৎ হ'য়ে না থাকলেও থাকা হয় না। জানতে হ'লেই চারিদিকের সব জানতে হবে, চারিদিকের সবাইকের সঙ্গে থাকতে হবে, আর যাঁকে ধ'রে চারিদিগের সব তাঁকেও জানতে হবে, তাঁকেও মানতে হবে। যাঁর জন্যে সবাই সমান, যিনি সবাইকে সমান ক'রে রাখেন, নিজের নিজের স্বাধীন ভাবে, স্বাধীন ইচ্ছের স্বাধীন প্রাণের কাজের ফলে, যারা সমান হ'য়েও অসমান, পূরা পূরি জানবার জন্যে, থাকবার জন্যে, তাঁর ও এদের সকলেরই সম্বন্ধে নিজের নিজের সমান অসমান ভাব জানা, আর তাই জেনে, সেই সেই ভাবে থাকা, চাইই চাই। জ্ঞানের এভাব,

থাকবার এভাব, নকলে আসলে প্রাণের দুভাবেই থাকবে। এভাব ছাড়া জানাও কেউ বোঝে না, থাকাও কেউ বোঝে না। বোঝে ব'লে যে বলে সে বোঝার গোড়ায় কুড়ুল মেরে ওকথা বলে। ফল সমস্ত ছেড়ে নির্ভাজ বিয়োগে যোগের কল্পনা ডুমুরের ফুলের কল্পনা, তা'তে জ্ঞানও জ্ঞান ছাড়া জ্ঞান। আসল যোগ প্রাণের সঙ্গে মহাপ্রাণে, তাতেই আসল ভোরপূর জ্ঞান।

এখন সহজেই বুঝতে পারবে ভাই বড় যোগের বড় জ্ঞানের দুটা ধারা। যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের লীলা জানতে চাবে, সমস্ত বিজ্ঞানের আসল রহস্য জানতে চাবে, এক ধারে তারও এক উপায় এই বড় যোগ। সব প্রাণের মরণ বাঁচনের সব রহস্য সব প্রাণের মরণ বাঁচনের ওপরের প্রাণের কাছেই লুকান আছে। ছোট খাট যোগী না হ'লে একটা রহস্যও কেউ জানতে পারবে না। বাহিরের জ্ঞান লোপ ক'রে, কত ভেবে কত চিন্তে, এই রকমই যোগের ফলে, এক একটা এই রকম জ্ঞান পেয়ে, এক একজন যোগী, বিজ্ঞানের যোগী, মানুষের মঙ্গলের জন্যে, বাঁচবার পথ সোজা করবার জন্যে, সেই জ্ঞান জগৎকে দিয়ে গেছে। বিজ্ঞানের যোগীদের হাতে জীবজগতের আসল কথা এই রকমে অনেক এ পর্য্যন্ত ব্যক্ত হ'য়েছে। এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু বিজ্ঞান 'ভাঙা গড়া' নিয়ে থাকে, ভাঙা গড়ারই ধরণ বোঝাতে যায়, আর তাতেই যে আসল জীবনের ভাবটুকু বোঝা দরকার তাইই বুঝতে যাবে, আসল জীবনের পূরো আসল ভাব, পূরো আসল জ্ঞান, বোঝবার জন্যে, বোঝাবার জন্যে, কখনই ব্যস্ত হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের লীলাতেও জীবজগতের প্রাণে প্রাণে যে সম্বন্ধ, জীবজগতের সকল প্রাণের প্রাণের সঙ্গে সমস্ত জীব জগতের এক এক জীবের প্রাণের যে সম্বন্ধ, সে সব সম্বন্ধ বিজ্ঞানের যোগে জানবার চেষ্টা হয় না। সব জীব কি রকমে মরে বাঁচে, কি রকমে এক হ'য়ে ছোট বড় সম্বন্ধ-পাতিয়ে আছে, এই সব সম্বন্ধ কি রকমে যায় আসে, বিজ্ঞানের যোগ তাই বলবে। কাজেই বিজ্ঞানের যোগে আর আসল প্রাণের যোগে ব্রহ্মাণ্ডের

ধারায় তফাৎ অনেক। সমস্ত জগৎ মরা বাঁচার মাঝ দিয়ে কেন বাঁচে, কি ক'রে বাঁচে, এই রহস্যই ব্রহ্মাণ্ডের যোগী বোঝেন ও বোঝান। বিজ্ঞানের যোগী মরা বাঁচা বুঝতে যখন এই রহস্যের কাছে ঘেঁসে আসে, তখন সে জ্ঞানে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানের আভাস অবশ্যই আসে। একটু বেশী গভীর ভাবে সে রহস্য বুঝতে গেলে আসল প্রাণের আসল জ্ঞানের কথাও বিজ্ঞানে এসে প'ড়বে। যেমন এই 'মহাকর্ষণের' জ্ঞান। আসল কথা ভুলনা ভাই, বিজ্ঞানও প্রাণেরই এক ধারার জ্ঞান, মরণও বাঁচনেরই ধারা, মরণের জ্ঞানও বাঁচনের জ্ঞানেরই একদিক্।

বড় যোগের বড় ধারা কিন্তু মহাপ্রাণের নিত্যলীলার, জড়ের ওপরের খেলার, রহস্য বোঝায়। বিজ্ঞানের কথা, সৃষ্টির কথা, ছাড়িয়ে যে কথা, সেই কথাই মহাযোগ বড় ক'রে বলে। বিজ্ঞানের কথা, সৃষ্টির কথা, ওকথার খাস্তা নকল বৈ কিছুই নয়। মহাপ্রাণ কি ভাবে আছেন, কিভাবে জানেন, কেমন আনন্দ করেন, কেমন ভাবে থাকান, কেমন ভাবে জানান, কেমন আনন্দ করান, নিত্য জীবেরা তাঁকে ধ'রে কি ভাবে থাকে, জানে, আনন্দ ভোগ করে, সেই শুদ্ধ প্রাণের, শুদ্ধ জীবনের, শুদ্ধ জ্ঞানের, শুদ্ধ সুখের, সমস্ত কথা মহাযোগের অমর ধারা জানিয়ে দেয়। মহাযোগের এই ভাগ যোগের রাজভাব, সেই রাজযোগের জ্ঞান 'রাজ বিদ্যা,' জ্ঞানের সেরা। প্রাণের আসল আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আসল প্রাণের বাঁধন, সকল প্রাণের প্রাণপতির সঙ্গে সকলের প্রীতি বাঁধন, এই 'রাজযোগের' রাজবিদ্যা ধ'রিয়ে দেয়। রাজযোগী মহাযোগের জ্ঞানে যে 'অনন্ত' রূপ দেখেন, তাতে আগাগোড়া জগতের জীবের পূর্ণ প্রাণের পূর্ণ দেহের সন্ধান পান। সব শক্তির, সব দেবতার, আসল ভাবও ঐ রূপে। যক্ষ রক্ষ দৈত্য দানব তাদেরও আসল মূর্ত্তি সেখানে। প্রাণে যারা মারে তারাও বাঁচাতেই মারে তাই 'ঘাতক' জীবও 'তাঁর প্রেমময় বিশ্বরূপের' বাইরে নয়। ফল সবাই সেখানে, এমন কি প্রাণকে যে প্রাণ নয় ক'রে তোলে, সেই মায়াও

সেখানে নিজের প্রাণের মূর্ত্তিতে। রাজযোগের জ্ঞান সব দিক্ দিয়েই পূর্ণ।

এখন যোগের এই যে আসল কথা ব'ল্লাম, এতে তোমার বুঝতে রাকী র'ইল কি যে আসল যোগ ভক্তিরই যোগ? ভক্তিযোগ ছাড়া যোগই হয় না। এক ভাবে যেটা মহাপ্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ, আর এক ভাবে সেইটাই মহাপ্রাণের এক ভাগে, এক ধারায়, নিজের প্রাণকে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল ভক্তিই আসল যোগ, আসল যোগই আসল ভক্তি। ভক্তির ভাব বাদ দিতে গেলেই যোগ শূন্য যোগ বা আত্মযোগে দাঁড়াতে যাবে, দাঁড়াবার কিছু না পেয়ে যোগ 'যোগভ্রষ্ট' হবে। যোগপথে যাঁরা আসল জ্ঞানের খোঁজ ক'রতে ব'লেছেন, তাঁরা ভক্তিযোগকেই যোগ ব'লে জ্ঞানের জন্যে সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এ পথ যাঁরা ছেড়েছেন, তাঁরা বাদ দেওয়াকেও যোগ বলে ধ'রে গোড়ায় বিড়ম্বনায় প'ড়ে, শেষে জ্ঞান বাদ দিয়ে তাঁদের যোগের জ্ঞানফলকে যোগ ফল ব'লে প্রকাশ করে নাস্তা নাবুদ হ'য়েছেন। প্রাণের আর মহাপ্রাণের সব ভাবের সব ভাগের এক যোগেই পূরো যোগফল পূরো জ্ঞান। নইলে যোগফলের ঘর, জ্ঞানের ঘর, খালি। যোগের জ্ঞান ভক্তির যোগেরই জ্ঞান।

আসল যোগের জ্ঞান ভক্তিযোগের জ্ঞান ব'লে এ যোগে এ জ্ঞানে ভুলের অবকাশ নেই। যোগে ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যই বুঝতে চাক, আর মহাপ্রাণের রহস্যই বুঝতে চাক, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যোগ হবে, প্রাণের নকলের সঙ্গে নকলের যোগ হবেনা। যোগে যে দেখবে, যে জানবে, সে প্রাণেই দেখবে, প্রাণেই জানবে, যা দেখবে, যা জানবে তাও আসল দেখবার প্রাণ, আসল জানবার প্রাণ। মরা বাঁচার দেহ দেখবে না, মরা বাঁচার দেহকেও দেখবে না। মরা বাঁচা নিয়েই ভুল। প্রাণে ম'রেছে বা ম'রছে বা ম'রতে পারে ব'লে বুঝতে গেলেই গোড়ায় ভুল হয়। এই ভুল নিয়ে 'জড়' জগতের মরা বাঁচা থাকা। দুঃখ মোহ এই ভুলেরই ওপর। দুঃখের মোহের মরণের জড় জগৎ

ছেড়ে সুখের জ্ঞানের জীবনের প্রাণ, সুখের জ্ঞানের জীবনের প্রাণকে 'আঁকড়ে' ধ'রে যা জানে, তাতে নির্ভুলই জানবে। মহাপ্রাণও সুখের জ্ঞানের জীবনের, জীবের প্রাণও সুখের জ্ঞানের জীবনের। যোগে, ভক্তিযোগে, নয় জানবে মহাপ্রাণকে, না হয় জানবে কোনও জীবের প্রাণকে, মহাপ্রাণের চারিদিকের সম্বন্ধকে, না হয় জীবের প্রাণের সম্বন্ধকে, এছাড়া আর কিছুই জানবে না। ভুল ভ্রান্তি তাই যোগে অসম্ভব। বুদ্ধির ভুল, মমতার ভুল, মনের ভুল, ইন্দ্রিয়ের ভুল, বিষয়ের ভুল, এই নানান্ রকমের ছ'ড়িয়ে পড়া সেই গোড়ার মহাভুল, ভুলের প্রাণের যোগে যোগে থাকবে, আসল প্রাণের আসল যোগে থাকবে না, থাকতে পারে না। ভক্তির যোগে, সেই যোগের জ্ঞানে, জীবের অচল অমর প্রাণের মূর্ত্তিতে যোগীর প্রাণের দৃষ্টি বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে মহা-প্রাণেরও অচল অমর অচ্যুত মূর্ত্তিতে সেই দৃষ্টি স্থির। কোন রকম জ্ঞানেইযোগীর কাজেই 'অন্তঃকরণে' জানবার বিষয়ে কোনও সন্দেহই হয় না। প্রাণের ইন্দ্রিয়ে, প্রাণের অন্তঃকরণে, যেখানে প্রাণেরই দেহ জানা ছাড়া আর কিছু নেই,সেখানে জানবার বিষয়টা এ রকমের কি ওরকমের, বুদ্ধিবিবেচনার সে ভাব আসতেই পারে না। এই কারণেই যোগের জ্ঞানে আগা গোড়া কোনও 'অস্থির' ভাব সেই। প্রাণের মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় বিষয় সবই যোগে অটল, প্রাণের বলেই অটল।

এই মহাযোগের, এই মহাজ্ঞানের নিখুঁত আদর্শ কোথায়? কে এই 'মহাযোগী' 'মহাজ্ঞানী'? কে জাননা ভাই? যিনি সব জীবের, সব জগতের, ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি গুটিয়ে এনে নিজের প্রাণের কাছে টেনে এনে, শেষে নকল সব ধ্বংস ক'রে যিনি সব নকলের আসল ভাব আসল প্রাণে ধ'রে সেই সেই প্রাণকে বড় প্রাণের কাছে ধ'রে দেন, তিনিই এই মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, সব হরণ ক'রে এনে হর, সংহার ক'রে তিনি 'মহাকাল' 'মহারুদ্র,' মরণের 'ওপরে প্রাণ তুলে তিনি 'মৃত্যুঞ্জয় শিব,' বড় প্রাণে সব রেখে, সবাইকে থাকতে দিয়ে, তিনি 'ভব'। এই মহাযোগে তিনি না জানেন এমন আসল কিছুই নেই।

ভক্তির ভাবে তিনিই পরম 'জ্ঞানী'। ভক্তিযোগের এমন মঙ্গলময় গুরু আর কেউ নেই। জীবের অনেক ভাগ্যে ভক্তির খুব বড় সাধনায়, জীব তবে শিবের ভাব পায়। শিবের ভাবে মিশে, শিবের প্রাণের এক ধারায় নিজের প্রাণ দেখে, তখন সেই ভাবে জীব মহাপ্রাণের পায়ে নিজের প্রাণ ডালি দেয়। মহাযোগী শিবের জ্ঞানে তখন জীবের সমস্ত জ্ঞান প্রাণে স্ফূর্ত্তি পায়। যোগের জ্ঞানে যোগের ভক্ত শিবের ভাব ধ'রেই সিদ্ধি পায়, যোগের জ্ঞান পেতে হলে তাই এই পরম ভক্ত, মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়কে ভক্তির ভাবে ধ'রতে হয়। ধ'রতে তাই কষ্ট কিছুই পেতে হয় না। সব প্রাণেই 'শিব' ভাব আছে, 'মৃত্যুঞ্জয়' ভাব আছে। সেই ভাব জাগিয়ে তোলাই মৃত্যুঞ্জয় শিবের আশ্রয় নেওয়া। বাইরে মুর্ত্তি গ'ড়ে, আখ্যান ইতিহাস শুনে সে ভাব জাগাতে চাও জাগাও, কিন্তু এটা ম'নে রেখ আসল শিব প্রাণেরই এক ধার নিয়ে, প্রাণের বাইরে তাঁর আসল দেখা পাবে না। এইবার ভাব দেখি একবার এই মহাযোগী কাঁর প্রাণের কাছে জগতের প্রাণ টেনে এনে নিজের প্রাণে তুলে, নিজের প্রাণ ভক্তির যোগে, জ্ঞানের যোগে, যোগ করেন? এ যোগের জীব ত হ'লেন রুদ্র, 'ঈশ্বর' কে? ঈশ্বর আর কে? যিনি সকল যোগের ঈশ্বর, সেই যোগেশ্বর 'কৃষ্ণ'। সব প্রাণের টানের সেই খানেই শেষ। সেই জন্যেই ত তিনি 'কৃষ্ণ'। তিনিই 'হরি' ঐ কারণেই। মহাপ্রাণের এক মহাভাবেরই এই দুই নাম। যোগীশ্বর শিব মহাযোগের পূর্ণ জ্ঞানে তাঁরই মহিমা ছাড়া আর কিছু জানতে চান না, কেন না আর কিছু জানবার নেই। হরিভক্তিই তিনি সার করেছেন, হরির কথাই 'পাঁচ' মুখে বলেন। জগতের, জগতের ওপরেরও, সার কথা ব'লে 'পাঁচ মুখ' বার ক'রেই তাঁকে ব'লতে হয়। পাঁচ জনেই, পাঁচ-জাতেই, ছিল আগে মানুষের সমাজ। এখনও 'পাঁচ জনের' কথাই মানব সমাজের কথা, 'পাঁচ মুখে' যা ব্যক্ত হয় তা 'অসত্য' হয় না। পাঁচ ভূতের 'সার সত্য' ব'লেও সার কথা পঞ্চানন পাঁচ মুখে প্রকাশ করেন। বেদে

ভগবানের নিজের জ্ঞান নিজের দিক্ থেকে ব্যক্ত, আসল 'তন্ত্রে' ভক্তের দিক্ থেকে, যোগীর দিক্ থেকে, জ্ঞানীর দিক্ থেকে, যোগীশ্বর শিবের কথায় ব্যক্ত। এই হ'ল বেদ আর তন্ত্রের বিষয়ে ভাবের তফাৎ। মূল বেদে তাই যোগের কথা খোলা খুলি নেই, তন্ত্রে কিন্তু খুব খোলা খুলি ভাবেই যোগের সব ধারা বোঝান হ'য়েছে। বেদের ধ্যানের ভাবকে ধ'রে, পরের 'বৈদিক সাহিত্যের' ধ্যানের ভেতরের দিকের ভাবটার বিচার আচার নিয়ে, নীচের দিক্ থেকে যোগে যত যা দরকার, এ সব তন্ত্রেই ভাল ক'রে বোঝান হ'য়েছে। যাই হ'ক ভাই, আসল কথা, যোগের পথ আসল ভাবে ভক্তির পথ ছেড়ে যায় না, যোগের জ্ঞানও ভক্তির জ্ঞানই ধরে। রুদ্রের যোগ ও জ্ঞান এই সত্যই বুঝিয়ে দেয়। সকল যোগের সকল জ্ঞানের চরম ভগবানের প্রাণে।

(১৫)

সুখের 'রাস'

বেঁচে থেকে যে চলে ফেরে বসে সেই সুখের জন্যে লালায়িত। সুখের জন্যে সেই চায় একটা মাত্র জিনিষ প্রাণের রস। যে রস পেলে, যে মধু খেলে, নিজের প্রাণ সরস হ'য়ে উঠবে, স্ফূর্ত্তি পাবে; সেই রস, সেই মধু সবাই সুখের তরে খোঁজে। জীবের সব ভোগেই রসের খোঁজ, রসই ভোগের সার সামগ্রী। সব ভোগের বড় ভোগ হ'ল ভোজন, ভোজনে মানুষ চায় খাবারের রসের সোয়াদ নিয়ে 'রসনার' তৃপ্তি। পাঁচ ইন্দ্রিয়ে যে যা ভোগ করে সবেতেই সবাইকের দরকার 'রস,' 'বিষয়ের রস'। রস না হ'লে সুখই নেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তিই নেই।

সুখের ভোগই রস। রূপ দেখলে যখন প্রাণ সুখ পায় তখন বোঝে যে সেই রূপে 'রস' আছে, যখন সুখ পায় না, তখন বোঝে তাতে 'রস' নেই। এই রকম সুখের পান ভোজনের রসে 'রস', ভাল ফুল চন্দনের গন্ধে 'রস', মিঠে বায়ুর স্পর্শে 'রস', মধুমাখা কথায়, মধুর শব্দে, 'রস'। মিঠে ভোগ সবই 'রসের'। সুখের জন্যে 'রস' চায় না, এমন জীবই নেই, জীবের এমন কাজও নেই। মৌমাছি ফুলের রস খুঁজে খুঁজে ত বেড়ায়ই, মানুষ, গ'রু, ভেড়া, পাখী, ফরিঙ, পোকা, মাকড়, এমন কি গাছ পালা গুলাও 'রসের' ভোগেই প্রাণকে সুখী ক'রতে চায়, প্রাণে প্রাণ পেতে চায়। রস পেলেই সব গজায়, রস না পেলেই সব শুকায়। জীবের দেহ রসের জোড়েই টিকে থাকে, রস ক'মলেই দেহ প'ড়তে থাকে। এমন যে পৃথিবীর দেহটা সেটাও রসের ওপরে, রসের মাঝে, রস নিয়ে, প্রাণ ধ'রে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটাও ব্রহ্মাণ্ডের রসে ভাসছে, তার ওপরেই জেগে আছে। রসের ধারা অনেক, রকম অনেক, কিন্তু রস ন'ইলে কোনও প্রাণই বয় না। কাজেই রস ন'ইলে সুখ নেই। প্রাণ যাতে বয় তাতেই সুখ, প্রাণ যাতে না বয় তাতেই দুঃখ। বাঁচন সুখ, মরণ দুঃখ। রসেই বাঁচন, রসের অভাব হ'লেই মরণ। ভোগের জগতে খালি রসেই ভোগ, ভোগের সব কাজও তাই রসের লেগেই। তবে রসটা যদি খাঁটি না হয়, মিঠে না হয়, তা হ'লেই বিপদ্, তা হ'লেই দুর্ভোগ।

এই খানেই মস্ত গোল। খাঁটি রস কোথায় যাতে মানুষ, ভোগের জীব, খাঁটি সুখ, খাঁটি আনন্দ পাবে? বিষয়ের রস কি খাঁটি? কি ক'রে বলি বিষয়ের রস খাঁটি? খাঁটি কি যায় আসে? খাঁটির কি হাজা শুকো আছে? যা সত্যির তা চিরকালই সত্যির, মিথ্যের আঁচ তার গায়ে লাগবে কেন? বিষয়ের রস কখনও ত ঠিক থাকে না। সে রসের আনন্দ ত দেখতে দেখতেই ফুরিয়ে যায়, ম'রে যায়। শুধুই কি তাই? আজকের যা সুখের কালকেই তাই হয়ত হবে দুঃখের। বিষয়ের রসের ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের ভয়। প্রাণ

ভোরে রসনার তৃপ্তি ক'র্ত্তে যাও রোগ, সারা রাত ধ'রে মিষ্টি গান শুনে এস সকালই শরীর বেতাক হ'ল। প্রাণ পূরে বিষয়ের রসের সোয়াদ নিতে গেলেই বিড়ম্বনা। তার ওপর এই বিষয়ের রসে মজার আর একটা মজা আছে। যতই এ রসে মজ, তৃপ্তি আর হবে না। প্রাণ সদাই ব'লবে আরও চাই। যা দিয়ে এরস ভোগ ক'রবে সে গুলাও আবার ক্রমে ঢিলে প'ড়ে যাবে। রূপের পিপাসা মিটতে না মিটতেই দেখবার শক্তি ক'মে আসবে। রসনার তৃপ্তি হ'তে না হ'তেই খাবার শক্তি, চিববার শক্তি, হজমের শক্তি, একটু একটু ক'রে খর্ব্ব হ'তে থাকবে। গান বাজনা শুনতে শুনতেই কাণ ক্রমে কালা হ'য়ে আসবে। ভাল মন্দ গন্ধ নাক বুড়া বয়সে আর তফাৎ ক'রতে পারবে না। গায়ের চামড়া ক্রমেই লোল হবে, মিঠে কড়া বোধ আর তাতে বড় থাকবে না। মরণের অধিকার, জরার অধিকার, যতই দেহের ওপর আসবে, ততই রস ভোগের শক্তি লোপ পাবে। জোয়ান বয়সে যে রসে প্রাণ ম'জে ছিল, বুড়ো বয়সে সে রসে মজা ত দূরের কথা, সে রস 'নীরস' হ'তে আরম্ভ হবে। বিষয়ের রসের আনন্দের পরিণাম এই সব। যে সব ইন্দ্রিয় ভোগ করে তারাও ভোগ করবার মতন শক্ত থাকে না, যা সব ভোগ করে তারাও আর মিষ্টি লাগে না। কেন এমন হয় বোঝ কি ভাই? বোঝ বৈ কি। দেখছই ত এ দুদিকেই 'নকল,' দুদিকেই 'মিছে'। যে ভোগ ক'রছে সেও নকল প্রাণে, যা ভোগ ক'রছে তাও নকল প্রাণের। যা থাকে তা যায় না, যা যায় তা থাকেনা। বিষয়ের রস যখন যায় তখন বিষয়ে সেটা নেই, সে রস ভোগের শক্তি ইন্দ্রিয়ের রস যখন যায়, তখন সে রস ভোগের শক্তিও ইন্দ্রিয়ের ঠিক নেই। রসও ওপরের জিনিষ, রস ভোগের শক্তিও ওপরের জিনিষ। নকলের পেছনে দুদিকেই আসল আছে।

আসল রস আছে বিষয়ের আসল প্রাণে। বিষয়ের রস বাঁচে মরে, বাঁচা মরা প্রাণেরই ধারা, কাজেই বিষয়ের প্রাণে ছাড়া বিষয়ের রস

আর থাকবে কোথায় ? মরণের এলেকায় এসে তাকে মরণের বিড়ম্বনা পেতে হয়, ন'ইলে আসলে তার মরণ নেই। তুমি ভাই যখন যে রূপটা দেখ, তখন খাঁটি রূপের রূপটা দেখতে পাওনা, খাঁটি রূপের বাঁচন মরণের রূপ দেখ, তাই বাঁচা মরার সুখ দুঃখ তোমায় পেতে হয়। সব রূপের আড়ালে সবাইকের খাঁটি প্রাণের রূপ খাঁটি প্রাণেই লুকোন আছে। শব্দের বেলায়, রসের বেলায়, গন্ধের বেলায়, স্পর্শের বেলায়, এই রকমই সব বুঝতে হবে। যা শোন, যা খাও, যা সোঁক, যা ছোঁও, তার তারই আড়ালে, শোনবার, খাবার, সোঁকবার, ছোঁবার, খাঁটি প্রাণ আছে ব'লেই, মরা বাঁচার দুঃখে সুখে তাই তাই ভোগ কর। খাঁটি না থাকলে নকল হয় না। প্রাণই একমাত্র খাঁটি জিনিষ, সুতরাং ভোগের রস নিজ প্রাণই, প্রাণের একটা খাঁটি ভাবই। রস রসেই মেশে, প্রাণ প্রাণেই মিশে যায়। নকল ইন্দ্রিয়গুলায়, মরণ বাঁচনের ইন্দ্রিয়গুলায়, নকল প্রাণের, মরণ বাঁচনের প্রাণের, 'নশ্বর' বিষয়ের, রস মিশ খেলেও, ইন্দ্রিয়ের আ'ড়ালে যে আসল প্রাণ আছে, তাতেই বিষয়ের আড়ালের আসল রস মেশে। তাই দুঃখের ভোগের মাঝেও প্রাণের দুঃখের আড়ালে সুখ, প্রাণে আছি ব'লে আনন্দ, ক'রচি কর্ম্মাচ্চি ব'লে আনন্দ। এ আনন্দ কখনও শুক'য় না, এ আনন্দে কখনও বিষাদ নেই, বিস্বাদ নেই। জীবের ভোগের প্রাণে প্রাণে এ আনন্দের ধারা চিরদিন বয়। প্রাণ যায় না, এ আনন্দও যায় না। জীব যেমন ক'রেই হ'ক বিষয়ের নকল রসের ভেতরে আসল রসের একটু খোঁজ পায়ই পায়, পেয়ে সেই রসে নিজের আসল প্রাণকে সরস বোঝে, বুঝে সুখ পায়, আনন্দ লাভ করে। কাজে কর্ম্মে ভোগে যখন প্রাণ, তখন এ রস না থাকলে প্রাণ থাকবে কেন ? প্রাণ যে ভাবেই থাকুক সে নিজে রসের, আর সে চায় রস। রস পেয়েই, রসে মিশেই, তার নিজের রসের, নিজের প্রাণের স্ফুর্ত্তি, তাতেই আনন্দ, তাতেই সুখ।

এখন বল দেখি ভাই, এই প্রাণের রসের মূল স্রোত কোথায় ?

আপনার জিনিষের সঙ্গেই আপনার জিনিষ মেশে। তেলে জলে ত মিশ খায় না, জলে জলে, তেলে তেলে, এক রকমের জলে জলেই, এক রকমের তেলে তেলেই মিশ খায়। সব প্রাণের, বিশ্বভ'রে জীবের প্রাণের, সব রসের ধারা নিশ্চয়ই এক স্রোতে বয়। ন'ইলে প্রাণে প্রাণে মিলে আনন্দ হবে কোথা থেকে ? এ স্রোত ভাই মহাপ্রাণেরই অখণ্ড রসের স্রোত। যেখানে সব প্রাণের প্রাণ, যে প্রাণের এক এক ভাগে, এক এক ভাবে, এক এক প্রাণ, সেইখানে, সেই বড় প্রাণেই, সমস্ত প্রাণের রসের ধারা একস্রোতে বয়, সেই বড় স্রোতের এক এক ভাগ, এক এক ভাব, ছোট ছোট প্রাণের ছোট ছোট ধারা। মহাপ্রাণ চরম রস, ছোট প্রাণ খণ্ড রস। নকল প্রাণ নকল রস। নকল প্রাণের জগতে জীব নকল রসে মরা বাঁচার নকল ক'রে বাঁচে, আসল প্রাণের জগতে, মহাপ্রাণের দেশে, আসল রসে, 'অমরের' দেহ প্রাণের স্ফূর্ত্তি ভোগ করে। গাছ পালা জীব জন্তু সবাইকের দেহ মর জগতে হাজা শুকোর রসে, হাজা শুকোর প্রাণে, 'সংসার' করে, অমরের দেশে কারু দেহে হাজা শুকো নেই, কেননা সবই এক রসের প্রাণ। নকলের দেশে আসল প্রাণ যতক্ষণ নিজেকে ছ'ড়িয়ে রাখে ততক্ষণ নকল প্রাণ নকল জগতের রসে মিশে বাড় বাড়ন্ত ভাব দেখায়। যখন আসল প্রাণ নিজেকে গুটিয়ে নেয়, তখন জগতের রস আর নকল প্রাণের রসে মিশ খেতে চায় না, দেহটা শুকুতে থাকে, শেষে শুকিয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু সব প্রাণের সব রস যেখানে এক হ'য়েছে, সেখানে প্রাণ যখন থাকে, তখন সে প্রাণ আর নিজেকে গুটুতে চায় না, কেন না তার ভোগের রস ত কোন রকমেই 'বিরস' হ'তে পারে না, সুতরাং রসের সঙ্গ, সুখের সঙ্গ, সুখের সংসর্গ সেখানে কোন রকমেই ঘুচে যায় না। সেখানকার প্রাণ সর্ব্বদাই গ'জিয়ে আছে, সর্ব্বদাই রসে পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। যে দেহ খাঁটি প্রাণের রসে ভোরপূর হ'য়ে আছে, তাকে ছোট ক'রবে কে ? তার সব ইন্দ্রিয়ের ভোগ খাঁটি রসের ভোগ, সব বিষয়ের ভোগ

খাঁটি রসের ভোগ। তার সুখ, তার আনন্দ, সকল সময়েই পূর্ণ মাত্রায় বজায়।

মূলের এই এক রস, চরম সুখের এই এক মহারস, সব প্রাণকেই সুখের টানে টানতে থাকে, টেনে নিয়ে সব প্রাণের ভেতর সুখের 'অমৃত' ছ'ড়িয়ে দেয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, সব জীবের প্রাণের মাঝ দিয়ে, প্রাণকে নিয়ে, রসের নানান রকমের স্রোত চ'লছে, সব স্রোত কিন্তু গিয়ে প'ড়ছে সেই রসের মহাসাগরে, ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে মহাপ্রাণের মহারসে। যে ভাবেই যে আনন্দ ভোগ করুক না কেন, মহাপ্রাণের মহারসের স্রোতে প্রাণকে কোন রকমে না কোনও রকমে বাইয়ে নিয়ে তবে আনন্দ ভোগ করে। রসের টানই প্রাণের টান। জীব জগতের কেন্দ্রের দিকে যে বড় টান, মহাকর্ষণ, সে এই রসের স্রোতেরই টানের একটা ভাব বৈ আর কিছু নয়। এই টানেই প্রাণ বড় প্রাণের সঙ্গে মিশে, বড় প্রাণের এক ভাগে নিজেকে ফেলে, সেই ভক্তির টানে, ভক্তির রসে, ভক্তিরই সুখ, বড় প্রাণের নিজস্ব সুখের ভাগ, আপনি পায়। এ'রস' বড় সূক্ষ্ম রস, এটানও বড় সূক্ষ্ম টান। এই রসে ডুবু ডুবু হ'য়ে, সব প্রাণের রসের অনন্ত সাগরে নিজের আসল রসের দেহ মিশিয়ে, জীব অনন্ত ভাবে পূর্ণ হয়, হ'য়ে অনন্ত সুখের অধিকারী হয়। ছোট হ'য়ে, নানান রকমের কামনায় বাঁধা প'ড়ে, ছোট ছোট সুখ জীব যখন খুঁজে বেড়ায়, তখনও প্রাণের ভেতরে ঐ রসের স্রোতের টানেরই পরিচয় দেয়। সুখ পেতে হবে ব'লে যখনই যে যা করে তখনই সে সেই কাজে ঐ টানের, ঐ ঝোঁকের, একটা ধারা প্রকাশ করে। জগতের কাজে, নকল প্রাণের কাজে, প্রাণের রস নকল ভাবেই ব'ইতে থাকে, প্রাণ মরণের ভিতর দিয়ে বাঁচবার আনন্দে আনন্দ পেতে থাকে, রোগ, শোক, তাপের মাঝ দিয়ে, নিজে ঠিক আছি, আপনার রসে আপনি আছি, বুঝে নিজস্ব সুখ হারায় না। মরণের ওপারে, খোলা প্রাণের প্রাণের রসের সাগরে নিত্যই সাঁতার। ফল যে ভাবেই দেখা যাক, যে দিক্ দিয়েই ধরা যাক,

প্রাণ রসের টানেই আছে, রসের দিকেই ছুটেছে। যেখানে প্রাণ, সেখানেই রস, সেই দিকেই প্রাণের টান। জীব জগতের প্রাণে প্রাণে রসের টান, জীব জগৎ ছাড়িয়েও ঐ, আর সব টানের একটানা টান একটা বিরাট্ প্রাণের বিরাট্ রসের দিকে।

সব টানের মাঝের প্রাণ, ভাই, তা হ'লে এক রসরাজ 'কৃষ্ণ,' যিনি মধুর রসের টানে সব প্রাণকে টানতে কখনও ভোলেন না। যে সুখ পেতে চায়, 'রসরাজ' 'কৃষ্ণে' ভক্তিই তার একমাত্র সার ক'রতে হবে। সবাইকের প্রাণে রস ছ'ড়িয়ে দিয়ে, সবাইকে, রসের তরে, আপনাকে পাবার তরে, লালায়িত ক'রে, তিনি মহারসের মহানন্দে নিজের প্রাণ ছেড়ে দিয়ে খেলা ক'রছেন। এই রসের খেলাই তাঁর রাসের খেলা। বুঝুক আর নাই বুঝুক, রসরাজ কৃষ্ণের এই রাসের সুখ ভোগ করবার ইচ্ছে জীবের প্রাণে প্রাণে। সুখ চাওয়া রসরাজকে পেতে চাওয়ারই অন্য নাম মাত্র। জীব আপনার আসল প্রাণকে যতক্ষণ না বুঝতে পারে, ততক্ষণ বেঁচেও ম'রে, সুখেও দুঃখী হ'য়ে, প্রাণে সরস হ'য়েও যেন নীরস হ'য়ে, রসরাজ কৃষ্ণের রসের রাসের টানে নিজে যে রাসের খেলাতেই আছে সেটা ধ'রতে পারে না। বড় প্রাণের ভাগে আপনার প্রাণ চিনতে পারলে, ভক্তির আসল ভাব প্রাণে জেগে উঠলে, জীব রসরাজের রাসের খেলার সাথী ব'লে তখনই আপনাকে বুঝে নেয়। ভক্তির সঙ্গেই রাসের ভাব প্রাণে উঠবে, রসরাজ কৃষ্ণের প্রেম রাসের প্রাণ, ভক্তিরও প্রাণ। ভক্তিই রাস, রাসই ভক্তি। সুখের জন্যে প্রাণে রাসের ভাব জাগান, আর ভক্তির ভাব জাগান একই কথা। রাসের সুখ ভক্তিতে, ভক্তির সুখ রাসে। ভক্তির রসেই সুখের রস, রাসের আনন্দ, প্রাণে উথলে ওঠে। রস-রাজের ভাল বাসা প্রাণে যে সার ক'রতে পেরেছে, সেই টানে যে প্রাণকে স্থির ক'রে 'রাখতে' পেরেছে, প্রাণের অন্তঃস্থলে সেই রস যে 'সংগোপনে' রেখেছে, প্রাণে প্রাণে সেই আসল রসের দেহের সঙ্গ পাবার জন্যে লালায়িত হ'য়ে তারই সাধ্য সাধনা 'আরাধনা' যে করে,

সেই রসরাজের রাসের একমাত্র প্রধান সাথী। ভক্তির পরাকাষ্ঠা তারই হ'য়েছে, আর কারুর নয়। আনন্দের অধিকার, সুখের অধিকার, এই প্রাণ ছেড়ে অন্য প্রাণে নেই।

রসরাজের রাসে, রসরাজের ভক্তিতে, জীবের একমাত্র সুখের উপায় ব'লেই, ঐ রাসের ভাবে, ভক্তির ভাবে, জীবের ভালবাসা ধ'রেও জীব আনন্দ পায়। প্রাণের প্রাণকে ভাল বাসলেই সেই ভালবাসা সেই বড় প্রাণের সব ধারাতেই ছ'ড়িয়ে প'ড়বে। যে রসের সাগরের দিকে আমার প্রাণের রস ছুটেছে, সেই রসের সাগর থেকেই সব রসের স্রোত বেরিয়েছে। পরস্পরের টানে, টানের সঙ্গে উল্টা টান, 'আকর্ষণের' সঙ্গে 'বিকর্ষণ' মেনে নিতেই হয়। রাসের ভাবে, ভক্তির ভাবে, প্রাণের টান বড় প্রাণ থেকে ছোট ছোট প্রাণে, সব প্রাণে, পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। ভগবানের ভালবাসার রসে 'রসিক' ভক্ত জগৎকে ভাল না বেসেই পারবে না। রসিক ভক্তের কাছে সব জগতের আসল প্রাণই রসরাজের রাসের সাথী, কাজেই নিজেরও সাথী। প্রাণের ভক্ত কখনও নকল দেখে না, ভক্তির ভাবে সে সকল প্রাণের সকল অবস্থাতেই আসল প্রাণের সন্ধান পায়। তুমি আমি সকলেই আমরা এক 'পূর্ণ' রসের 'পুরুষের' রাসের সহচর, এক রাসের খেলার খেলুড়ে। যে ভাবেই যে থাকি না কেন, সবাইকের সুখ ঐ খেলা ছাড়া আর কিছুতে নেই। সবাই এক হ'য়ে একযোগে ঐ খেলা খেলব, সবাই সেই রাসের পুরুষের, রাসের প্রাণের, এক একটা দিক্, এক একটা ভাব ধ'রব, সবাই তাঁকেই ঘিরে ঘুরব, তাঁর আনন্দে সবাই আনন্দ পাব, ভাগ যোগ ক'রে সবাই পূর' আনন্দ ভোগ ক'রব, ভক্তির এই সরস ভাব প্রাণে যখন ওঠে, তখন মানুষের জীবজগতে মহারাসের ভালবাসা, জগৎজোড়া টানের ভালবাসা, আপনা আপনিই স্ফূর্ত্তি পায়, সমস্ত কাজে সেই ভালবাসা প্রকাশ পায়, সমস্ত জ্ঞানের মূলে সেই ভালবাসা বোঝা যায়। এই ভাব জীবের আসল প্রাণের নিত্য ভাব ব'লে ভক্তির ভাব যে জাগাতে না শিখেছে, সেও পেছুনের ঐ আসল

টানে, জগৎকে ভালবাসতে হবে, জগৎকে নিয়ে চ'লতে হবে, জগতের সুখের সঙ্গে 'আমার' সুখ বাঁধা, এটা ভেতরে ভেতরে বুঝতে পারে। আমি রাসের জন্যে, সবাই রাসের জন্যে, সাক্ষাৎ ভাবেই হ'ক, আর পরোক্ষেই হ'ক, প্রাণের মাঝে এ ভাব কাজ ক'রবেই ক'রবে। ভগবানের প্রেম রাসের প্রেম, জগতের প্রেম রাসের প্রেম, শুদ্ধ জীবের শুদ্ধ প্রাণের প্রেমও রাসের প্রেম, রসের টানের সঙ্গে সঙ্গে এ কথা কটা প্রাণ থেকে আপনি বেড়'য়, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই বেড়'য়। জগতের বিষয়সুখে যে ম'জেছে তারও কাণে কাণে প্রাণ এই কথা ব'লে দেবে, আবার যে বিষয়ের রস বিরস বুঝে আসল প্রাণের রস পাবার জন্যে আসল প্রাণের ভাগ নিতে ব্যস্ত হ'য়েচে, তারও প্রাণের কাণের ভেতরে এই মধুর কথা, মধুর শব্দ আপনা আপনি প্রবেশ ক'র্বে।

বোঝ দেখি ভাই মানুষের প্রাণে, জগতের এই নকল প্রাণে, এমন কি আছে যা থেকে এই 'নিত্য' রাসের খোঁজ পাওয়া যায়? আছে একটা জিনিষ দুটা ভাবে। আছে আনন্দ পেতে হবে এই ভাব, আর সেই ভাবের আর একদিকে তারই জন্যে প্রাণের প্রতি 'অনুরাগ'। প্রাণের প্রতি আমার সকল অবস্থাতেই একটা 'আসক্তি' আছে, আর সেই আসক্তিটুকু আছে ব'লেই বুঝি প্রাণে আমি সুখী, বেঁচে থেকে আমি সুখী। এই অনুরাগ আর অনুরাগের এই আনন্দ থেকেই বিরাট্ রাসের বিরাট্ আনন্দের ভাবটা বুঝে দেখলেই ধ'রতে পারা যায়। জগতের এটা ওটা সেটা কত জিনিষে কত রকমে অনুরক্ত হ'লাম, সুখ পেলাম না, বা সুখ পেয়ে সুখ হারালাম, তবু অনুরাগ ছাড়তে পারলুম না, একটা ছেড়ে আর একটার ওপরে ঝুঁকে তারই রসে প্রাণকে 'রসাক্ত,' অনুরক্ত ক'রতে ছুটলাম, তাতেই যেন সুখ আছে ব'লে ধ'রে নিলাম, কিন্তু শেষে সেখানেও ঠ'কলাম। এই রকম শত শত বার পদে পদে ঠ'কেও সুখের ইচ্ছা আর অনুরাগ যে আমায় ঠকিয়েছে এটা ভাবতে, এটা মানতে, কখনই পারলাম না।

সব মোহ ঘুচছে, এটা মোহ ব'লে কখনও ধারণাতেই আসছে না। আসছে না কেন? আসছে না কেন না অনুরাগ আর সুখের ইচ্ছা প্রাণের ভিতর থেকে আসছে, বাহিরের ক্ষণিক জিনিষের সঙ্গে সম্পর্ক ঘ'টলেও, ক্ষণিক জিনিষ চ'লে যাবার পরও স্থায়ী হ'য়ে থাকছে। প্রাণে যা স্থায়ী তা প্রাণেরই। প্রাণেই অনুরাগ, প্রাণেরই অনুরাগ, প্রাণেই সুখ, প্রাণেরই সুখ। যেখানে প্রাণ সেই খানেই তা হ'লে প্রাণের অনুরাগ, সেই অনুরাগেই পাবে সুখের সন্ধান। যে প্রাণের এক একভাবে সমস্ত প্রাণ, সেই প্রাণে অনুরাগই চরম অনুরাগ, সেই অনুরাগের সুখই চরম সুখ। নিত্য রাসের লীলা এই অনুরাগের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। রাসের ভাবে সরস হওয়াই প্রাণের অনুরাগ। বিশ্বব্যাপী রাস, বিশ্বব্যাপী অনুরাগ। রাসের ভক্তিই রাসের প্রেম, শুদ্ধ প্রেম, খাঁটি ভালবাসা, খাঁটি আনন্দের জিনিষ।

জগৎ যদি এই রাসের রসেই ভাসছে তবে জগতে দুঃখ শোক আসে কোথা থেকে? এমন প্রশ্ন সহজেই মনে উঠতে পারে। অনুরাগই যদি জীবের প্রাণের ধর্ম্ম হয়,তবে জীবের বিরাগ হয় কোথা থেকে? এ প্রশ্নও ঐ আগেকার প্রশ্নেরই আর এক ধারা, আর এক ভাব। প্রাণের রহস্য যে জানে তার কাছে এ প্রশ্নের উত্তর প'ড়েই র'য়েছে। জগতে তাই প্রাণ মরণের ভেতর দিয়েই বেঁচে থাকে। প্রাণের ধর্ম্মও তাই প্রাণহীণ হ'য়ে জগতে প্রকাশ পেতে বাধ্য হয়। প্রাণের আসল ধর্ম্ম অনুরাগের রস, প্রেমের রস, বিরাগ আর বিদ্বেষের ধারা দিয়ে জগতে আপনার পরিচয় না দিয়েই সুতরাং পার্ব্বে না। কিন্তু উল্টা ধারায় নিজের পরিচয় দিলেও শেষে যেমন ক'রেই হ'ক আবার সোজা ধারায় ফিরবে। প্রাণের যেমন জন্ম, মৃত্যু, আবার জন্ম, প্রাণের সব ভাবেরও সেই রকমই বুঝতে হবে। হাসি কান্নার মাঝ দিয়ে জগতের ভালবাসা ফোটে, ভালবাসার কাজ রোষ আর ভয়ের মাঝ দিয়ে উদ্যম নিয়ে থাকে, একদিকে ঘৃণায় অন্য দিকে আশ্চর্য্য

ভাবনায় ভালবাসার শান্তি, ভালবাসার সমাধি, হয়। প্রাণের দিকে প্রাণের প্রীতি, প্রাণের অনুরাগ, আর তাতে সুখ, এই 'নয়' রসের মধ্যেই দপ্‌দ'পে থাকে। মেরে বাঁচিয়ে রাখাই জগতের অদ্ভুত নিয়ম। সুখ আর অনুরাগকে উল্টে পাল্‌টে দিয়েও জগৎ শেষে সুখ আর অনুরাগ বজায় ক'রে দেয়। দুরন্ত শোকের রোষের ঘৃণার জ্বলন্ত বৃত্তান্ত প'ড়েও তাই জগতের রসের রসিক প্রাণে প্রাণে সুখ টের পায়, জগতের জীবে অনুরাগ হারায় না। শোকে শোক পেয়েই মানুষের আনন্দ, রোষে রুষ্ট হ'য়েই আনন্দ, ঘৃণায় ঘৃণাবোধ ক'রেই আনন্দ। জগতের এ ছলনা, এ মায়া, স্বতঃসিদ্ধ।

এই মায়া, এই ছলনা, এড়াতে হ'লে, প্রাণকে জগৎ ছাড়িয়ে তুলতে হ'বে। জগতে থাক না থাক তাতে কিছু যায় আসে না, তোমাকে প্রাণের ঐ কপট ভাব বুঝে নিয়ে কপটের অতীত হ'তে হবে। শুদ্ধ প্রাণে শুদ্ধ প্রাণের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ বুঝে নিতে হবে। এক অখণ্ড শুদ্ধ প্রাণের নানান্ ধারায় আপনার প্রাণ, সব প্রাণ, দেখতে হবে। সেই অখণ্ড শুদ্ধ প্রাণের সাধ্য সাধনায়, আরাধনায়, ভজনে, মায়া তোমার কাছে এগুতে পার্ব্বে না। সব রসই তোমার তাজা রস হবে, প্রাণের প্রেম ছাড়া, সে রসে আর কিছুই থাকবে না। এমন কি জড় জগতের, মরা জগতের, যে নটা রস, সে কটাও সব জীয়ন্ত হ'য়ে দাঁড়াবে। শোক রোষ ঘৃণা বিরস ভাব ফেলে দিয়ে সরস হবে। প্রেমের স্ফূর্ত্তি পাবার জন্যেই, জেনে শুনেই, শোক রোষ ঘৃণা দরকার মত শুদ্ধ প্রেমিক আদর ক'রে নেবে। না হারালে, না অভিমান ক'রতে পাল্লে, উপেক্ষা দেখাতে না জানলে, ভালবাসা ফোটে না ব'লেই, রসিক ভক্ত, শোক রোষ ঘৃণা প্রাণের জিনিষ, প্রেমের জিনিষ, শুদ্ধ রসের জিনিষ, শুদ্ধ রাসের জিনিষ, ব'লে তাদের বুকে রাখবে। জগৎ এ রহস্য বুঝতে দেয় না ব'লেই জগতে শোক শোকের, রোষ রোষের, ঘৃণা ঘৃণারই। তবু কিন্তু আসলের ভাবটা তলায় জাগে ব'লে ভালবাসা আর সুখ এ সবের মধ্যেও জগতে বজায় থেকে যায়।

জগতের ওপরে ঐ রহস্য প্রাণে প্রাণে গাঁথা থাকে ব'লে এ বিড়ম্বনা টুকু শুদ্ধ ভক্তকে, শুদ্ধ রসিককে, আর ভোগ ক'র্ত্তে হয় না।

ভগবানের পূর্ণ রসের প্রকৃত কথা এখন বুঝলে ত ভাই? বল দেখি এ রাস তোমার প্রাণের জিনিষ ব'লে মনে হয় কিনা? এ রাসের রস ছেড়ে কি নিয়ে তুমি থাকতে চাও? চাইলেই কি পেরে উঠবে? প্রাণ তোমায় নিত্যই ঐ রাসের টানে টানবে। তার নিত্য ধর্ম্মই রাস। সব সুখের চেষ্টার তলায় তার ঐ রাসের লীলাই বর্ত্তমান। সে রাসের টানে প্রাণ সব দিকে বাঁধা। সে বাঁধন ন'ড়িয়ে যাবেই বা সে কোথায়? প্রাণ যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ রাসের প্রাণ। এইটা বুঝলেই সুখ, নইলে সুখেও দুঃখ। বোঝবার ভুলেই দুঃখ, নইলে দুঃখ প্রাণের নিজের জিনিষ নয়। সব সুখ নিয়ে রাসের রস, এ রস না চাবে কে? না চেয়েই বা পার পাবে কে?

রাসের এই রহস্য বোঝাবার জন্যেই পুরাণে নিত্য রাসের কথা। রাসমণ্ডলের বাইরে মায়ার পর্দা ঢাকা দিয়ে, নিজ মণ্ডলে শুদ্ধ রসের সমস্ত প্রাণ নিয়ে, সকলের প্রাণেশ্বর নিজের ভালবাসা, সকলের ভালবাসা, ভোগ ক'রছেন আর ভোগ করাচ্ছেন। নয় রস শুদ্ধ সত্ত্ব হ'য়ে, আসল প্রাণে, রাসেশ্বরের প্রধান সাথী হ'য়ে, সেখানে বর্ত্তমান। জীবজগতের সব আসল প্রাণই এই নয়রসের প্রাণে ঢুকে, এই নয় রসের প্রাণের ভাগ ধ'রে, সেই ভাবে রাসেশ্বরের রাসের কাজে যোগান দিচ্চে। যে যেখানে আছে সবাই শুদ্ধ অবস্থায় সেই স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে। এ রাসের আরম্ভও নেই, শেষও নেই। এ রাস দেশের সীমানা মানে না। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের ওপর এই রাসমঞ্চ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এর ভাগীদার, তবে বুঝতে পারলে। সব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের মধ্যে এই লীলা জেগে আছে, সব জীবের প্রাণের মধ্যে এই লীলা জেগে আছে। যে ব্রহ্মাণ্ড যখন মহাভাগ্যে খাঁটি প্রাণের দেখা পায়, তখন সে ব্রহ্মাণ্ড সেই লীলারও দেখা পায়। যে জীব যখন আসল প্রাণের দেখা পায়, সে জীব তখন সেই লীলা প্রাণে ধরে।

ব্রহ্মাণ্ডকে ধ'রে রাখবার জন্যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে আসল পূর্ণরসের প্রাণের অধিষ্ঠান হ'লে, ধর্ম্ম রাখবার জন্যে, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে অবতীর্ণ হ'লে, কৃষ্ণের এই নিত্যলীলা জীবের জানবার সুযোগ হয়। ভক্তির ভাবে ভগবানের প্রাণে নিজের প্রাণ ফেলে দিলে সেই প্রাণেও তখন ঐ নিত্যলীলা বোঝবার উপায় হয়।

(১৬)

সুস্থ প্রাণ

জ্ঞানে ধর্ম্মে আনন্দে যে প্রাণ আসল প্রাণে উঠেছে, আসলের ভাগে আপনাকে ব'সিয়েছে, আসলের ভাবে আপনাকে ভাবাতে পেরেছে, সে প্রাণ আর কখনই প্রাণ ছাড়া হ'তে পারে না। কোন্ কামনায়, কিসের জন্যে, সে আর এদিকে ওদিকে ছুটবে বল ভাই ? তার ত জানবার আর কিছুই নেই যে তাই জানতে ঘুরোঘুরি ক'রবে। এটা ওটা ক'রতে আর তাকে হবে কেন যখন সে সব করবার অধিকার বুঝে নিয়েছে ? এ প্রাণের সঙ্গে মিলে, ওপ্রাণের সঙ্গে মিশে, তাকে কি আর সুখ খুঁজতে হয়, একবারে যে সব প্রাণের প্রাণের কোলে ব'সেছে ? আসল ভক্তির ভাব হ'লে প্রাণের যার যার জন্যে ঘুরোঘুরি সে সব ছুটে যায়। প্রাণ তখন এক জায়গায় ব'সে, এক সময়ে সব নিয়ে, ভ'র পূর হ'য়ে, জ্ঞানী, কর্ম্মী, সুখী। তাই বা ব'লি কেন, দেশ কাল ছেড়ে, সবের মাঝে সব হ'য়ে, প্রাণ হ'য়ে, থাকবার কামনাই তখন প্রাণের এক কামনা, তাতেই সব কাজের কামনা, সব রকম কামনা, মিশে যায়, প্রাণের সব কাজ করাই তখন প্রাণের এক কাজ, জগতের

মিছে কাজের, প্রাণছাড়া প্রাণের নকল কাজের, বাঁধনে আর তখন প্রাণকে প'ড়তে হয় না, যার মরণ আছে তাকে নিয়ে, তাকে আপনার ক'রে, প্রাণকে সে অবস্থায় আর থাকতে হয় না, ঐ ম'ল, ঐ গেল, ঐ ছাড়লে ব'লে প্রাণকে আর কাঁদতে ব'সতে হয় না, মরণের প্রাণের সঙ্গ, জগতেব প্রাণের সঙ্গ, সে তখন ছেড়েছে, আসল প্রাণের আসল প্রাণের সব ধারার, সব ভাবের, সব ভাগের, সন্ধান সে তখন পেয়েছে, তাদের নিয়েই পূর' সুখে আছে, জানতে শুনতে তাদেরই জানছে, সে জানায় কখনও ভুল ভ্রান্তি ঘটেনা, ঘ'টতে পারেনা, কেননা তাদের অদল বদল হয় না, যে সব প্রাণ কেবল ম'রে ভূত হ'চ্ছে, সে সব প্রাণের খোঁজ আর ভক্তির ভাবে থাকতে পায়না। ভক্তির প্রাণ, সকল রকমে, সকল অবস্থায়, যা আছে, যা ছিল, যা থাকবে, তারই আশ্রয়ে, তারই এক ভাগে, যা ছিল না, থাকবেনা, কাজেই যা ঠিক নেই, তার কোনও ধারই ধারেনা, তার সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধই, নেই। চির কালের সার বস্তুর এক অংশ হ'য়ে, সেই অংশ বুঝে পেরে নিয়ে,প্রাণে কোন দিকেই আর সে আপনাকে ব্যস্ত ক'রে তুলতে চাবেনা। সে প্রাণ একবারেই সুস্থ, কোন রকন আনচানানিই তার আর নেই।

জগতের প্রাণে যা কিছু আনচানানি সবের মুলে একটা বৈ দুটা আশঙ্কা নেই, সেই এক আশঙ্কা, এক আতঙ্ক, মরণের ভয়, প্রাণের প্রাণছাড়া হবার ভয়। কি ক'রলে ম'রব না, বাঁচতে হ'লে কি জানতে হবে, মরণের দুঃখ কি ক'রে ঘুচবে, এই সব ভাবনাতেই জগতের প্রাণ ব্যতিব্যস্ত হয়, মরণটাই সে এক মাত্র বিপদ্ ব'লে বোঝে।. বোঝায় অপরাধ কিছু নেই, প্রাণ প্রাণছাড়া হ'বে এত, বড়ই বিষম কথাই বটে। সমজদারের কাছে এটা একটা হাসির কথাও বটে, কেননা প্রাণ আবার প্রাণ ছাড়বে কি ক'রে? তা হ'লেও জগতের লোক, সত্যি সত্যিই এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই যেন শিউরে উঠছে, জড়' সর' হয়ে আছে, কাজে কর্ম্মে, জানা শোনায়, আনন্দ উৎসবে, একটু এদিক্ ওদিক্ হ'লেই ডরিয়ে ওঠে। কেন এমনটা হয়

ভেবেছ কি ভাই? প্রাণ প্রাণছাড়া হ'তে ত পারেই না, একথা ত প'ড়েই আছে, তবে এ ভয় জগতের প্রাণে ওঠে কেন? ওঠবার কারণ আছে ব'লেই ওঠে। জগতের প্রাণ যে ভাই প্রাণ ছেড়েই প্রাণের কাজ ক'রতে জগতে ঢোকে। অপ্রাণের কাজে প্রাণ হবার চেষ্টাই তার একমাত্র চেষ্টা। তাই এই বাঁচন মরণের সঙ্কট এই প্রাণে। বাঁচতে গিয়ে তার কেবল ওলট পালট। সে বাঁচতে বাঁচতে মরে, ম'রতে ম'রতে বাঁচে, জানতে জানতে ভুল করে, ভুল ক'রতে ক'রতে জানে, সুখের কাজে দুঃখ কষ্ট পায়, দুঃখ কষ্টের মাঝ দিয়েও বেঁচে সুখী হয়, জগতে ঢুকে প্রাণ মরণের প্রাণ হ'য়েই এই সব বিড়ম্বনা ভোগ ক'রতে বাধ্য হয়। মরণের প্রাণ মরণের ভয় ক'রবে বৈ কি। আসলের ভাব ছেড়ে, নকলে এসে নকলের ভাবে নিজেকে ভাবিয়ে তুললে, প্রাণের উল্টা টানে আপনাকে ভাসিয়ে দিলে, উল্টা ভাবনা না আসবে কেন? যে এই উল্টা টানের তলায় সোজা টানের সন্ধান পেয়েছে, সেই টানে প্রাণ ছেড়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণে নিজের প্রাণকে মোঙড় ক'রে বেঁধেছে, তার এ মরণের ভয় আর নেই। সে জগতের মরণ হেঁসে উড়িয়ে দেয়। 'অমরের' আশ্রয়ে, 'অমরের' ভাবে মরণের ভাব তিষ্ঠিতে পারে না। আসল কথা না জানাতেই ভয়, তাতেই যত কিছু আনচানানি। যে নিজের আসল ভাব বুঝেছে, যে জগতের আসল ভাব বুঝেছে, তার ভুল ধারণা, মরণের ধারণা থাকবে কেন?

পূর্ণ প্রাণের, সকল প্রাণের মহাপ্রাণের, পাশে দাঁড়িয়ে, ভক্তির প্রাণ মরণের মোহ কাটিয়েই পূর্ণ জ্ঞান পায়। জগতে যা কিছু মোহ সবই এই মরণের গতিকেই। প্রাণ প্রাণছাড়া হ'য়ে জগতে চ'লেছে, জগতের সকল মোহের গোড়া এই জ্ঞানেই। এই ভাবে ভাবতে বাধ্য হওয়াই মস্ত অজ্ঞান, মস্ত 'অবিদ্যা'। জগতের ভাবে এ মোহ কাটাবার উপায় একেবারেই নেই। মরণের জগতে, অদল বদলের জগতে, যা কিছু জানতে যাবে তাতেই সন্দেহ, সেইটাই অস্থির, কেননা সেইটাই প্রাণের মরণের সম্বন্ধ, উল্টা টানের একটা ধারা। পদে পদে জগতে

এই মোহের জালেই বাঁধা প'ড়তে হয়। জগতের জ্ঞান অচলকে চল বোঝায়, চলকে অচল বোঝায়, যা নেই তা আছে দেখায়, যা আছে তা নেই দেখায়, যা বোঝে না তা বোঝে বলে, যা বোঝে তা বোঝেনা বলে। জগতের বিজ্ঞান মরণে বাঁচনের ধারা, বাঁচনে মরণের ধারা, সকল রকমে দেখাতেই আছে। জগতের বিজ্ঞানের কাজই তাই, অধিকারও তাই। প্রাণ অপ্রাণ হ'য়ে জগতে সেঁধিয়েছে ব'লেই বিজ্ঞানের জ্ঞান এই উল্টাধারাতেই বয়। উল্টা ধারায় বয় ব'লেই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রাণকে সর্ব্বদাই সন্দেহে দোলাতে থাকে। চল যদি অচল হয়, অচল ত আবার চল হবে, সে ত আবার অচল হবে, তবে চলাচলের শেষ ভাব ধ'রব কি? এক সম্বন্ধে যেটা অচল, আর একটা সম্বন্ধে সেটা চল, অন্য আর এক দিক্ থেকে সেটাই আবার ভাবতে হবে অচল, এ বিড়ম্বনার শেষ কোথায়? চলাচলেও যা, বাঁচা মরাতেও তাই, চেতন অচেতনেও ওই। একই প্রাণের সোজা ধারা উল্টা ধারা, দুটা ধারা ব'ইছে ব'লেই জগতের জ্ঞান সুস্থির হ'তে পারে না, বিজ্ঞানের প্রাণ জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটিয়ে সুস্থ হয় না। যে প্রাণ নিজে সুস্থির, যার ভাগে ভাগে সবই সুস্থির, তার ভাগে নিজেকে ফেলে দিলে, আর প্রাণের অস্থির জ্ঞানের মোহে প'ড়তে হয় না। স্থির জ্ঞানেও জ্ঞানের ভাবে প্রাণ সুস্থ হ'য়ে পড়ে। ভক্তির অভাবে প্রাণ মোহের প্রাণ, ভক্তির ভাবে মোহ আপনিই স'রে যায়।

সব বুঝে শুঝে প্রাণের মনের মত সব ক'রতে পেয়ে ভক্তির প্রাণ সদাই নিজের সুখে সুস্থ থাকে। লোকের দুঃখ হয় কিসে? না অভাবে। যা পেতে চাই তা না পেলেই আমি মস্ত দুঃখী। কামনার বস্তুটা প্রাণে না জুটলেই প্রাণ আপনাকে খালি ব'লেই বোধ করে, ক'রে দুঃখ পড়ে, দুঃস্থ হয়। জগতে কামনার এটা ওটা পেয়েও প্রতিপদেই মানুষ টের পায়, যে ঠিক যেটা চাওয়া উচিত সেটা চাওয়া হয় নি, চেয়ে যেটা পাওয়া গেল সেটা প্রাণের মনের মত নয়। রূপ বল, রস বল, শব্দ বল, স্পর্শ বল, কোনটাই জগতে প্রাণ ভ'রে পাওয়া

যায় না, যা পাওয়া যায় তাতে পূরোপূরি খুসী হওয়া চলে না। চাওয়ায় আর পাওয়ায় সব সময়েই খুঁত থেকে যায়। জগতের ভোগের দুর্ভোগই এই। এর কারণ অবশ্যই আর কিছু নয়, জগতের রূপে রসে প্রাণের রূপ রস পাবে না। আসল প্রাণে যে রূপ যে রস জগতে তা নেই, থাকতে পারে না। জগতের জিনিষ যে তৈয়ারী ক'রেছে সে খাঁটির মত নকলকে ক'রতে গেছে, কিন্তু পারে নি। খাঁটি হ'তে কখনই পারে না, অথচ খাঁটি হ'তে চায় ব'লেই জগতের জিনিষ অদলায় বদলায়। যে প্রাণ এই জগতের জিনিষ ভাঙা গড়ার কাজে, সে তার প্রাণের তাড়াতেই আস-লের ঝোঁকেই, এই রকম অদল বদল ক'রতে থাকে। খাঁটি-টি কখনও ক'রতে পেরে ওঠে না, কিন্তু করবার উদ্যমও সে ছেড়ে দিতে পারে না। জগৎ সদাই চ'লেছে খাঁটি হবার পথে, কিন্তু নকল প্রাণে, ভুল প্রাণে, সে খাঁটি কখনই হ'তে পারে না। এই জগতের নকল জিনিষ নিয়ে কাজেই মানুষ কখনও তৃপ্তি পেতে পারে না। আসল না পেলে, পূর' জিনিষ না পেলে, তৃপ্তি কি কখনও হ'তে পারে? কখনই না। আসল প্রাণ পেলেই, তার সঙ্গে আসল প্রাণের আসল পূর' রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রাণ আপনিই পাবে। এ ভাব প্রাণ পায় কেবল এক ভক্তির ভাবে, অন্য কোনও ভাবেই নয়। শুধু যে আপনিই থাকে, আপনাকে জানে, তার থাকাই হয় না, জানাই হয় না। থাকা আর জানা দশের সম্পর্কে। বিনা কাজে থাকা আর এক রকমের মরণ বৈ আর কিছুই নয়। কাজ ক'রতে হ'লেই, ন'ড়তে চ'ড়তে হ'লেই, বস্তু নিয়ে, বিষয় নিয়ে প'ড়তে হয়। আর কাউকে না জেনে শুধু নিজেকে জানাও না জানারই মধ্যে। আমি কি বুঝতে হ'লেই আমি কি নই তা বুঝতে হয়। ন'ইলে জানাই হয় না। তবেই প্রাণ থাকতে আর জানতে, পূরাপূরি থাকতে আর জানতে, সব প্রাণের সম্পর্কেই থাকবে, সব প্রাণকেই জানবে। এই রকম থেকে জেনে কাজ কর্ম্ম ক'রলে প্রাণের আর চাইবার কিছু থাকে না,

অথবা যখন যা চায় তখনই খাঁটি সেটি হাত বাড়ালেই পায়। এই প্রাণ ছাড়া আর কোন্ প্রাণ সুখে থাকবে, অভাব পূরিয়ে সুস্থ হবে ভাই ? আর কেউ নয়। ভক্তির প্রাণ এই রকমে যা সদাই আছে, যা সব জানে, যা সকল ভাবেই সুখী, তার ভাগে থেকে সকলের চেয়ে বড়র আশ্রয়েই আছি ব'লে নিজেকে বুঝতে পারে। জগতের জীবের নকল প্রাণ কখনও পূর' হয় না, কাজেই বড় হ'তে পায় না। প্রাণের ঝোঁকে বড় হ'তে চাইলেও তার বড় হওয়া হয় না। সে যত বড়ই হোক ছোট থেকে যায়। যে কোটি কোটি লোকের ওপর নিজের প্রভুত্ব জাহির ক'রতে জগতে পারে, সেও জগতে যত বড়ই হ'ক, আসল প্রাণের কাছে খুবই ছোট। ছোট জগতের, অপূর্ণ জগতের, পূর্ণ প্রভুত্ব যে জীবে সে জীবও ছোট। জগতের সম্পর্কে প্রাণের বড় হবার উপায় নেই। যেখানে মরণ বাঁচন আছে সেখানে বড় কি কেউ হ'তে পারে ? আজ যে নিজের বড় পদের গোমরে ধরাকে সরাখানা দেখছে, কাল সে ধূলোয় গড়াগড়ি দেবে, ধূলোয় মিশবে, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। তার হুকুম আর কেউ তখন মানবে না, তার কাছে আর কেউ তখন 'এদিন' 'ওদিন' ব'লে দাঁড়াবে না, তার ভ্রূকুটিতে কেউ তখন আর ম'লাম ব'লে আঁতকে উঠবে না। জগতের বড়াই দুদিনের বড়াই,তার পর ধূলা। শুধু তাই নয়, এক জায়গার বড়, অন্য জায়গায় কেউ নয়। এক দেশের সিংহ, অন্য দেশের ভেড়া। পদে পদে এসব জগতে চোখে দেখে, কাণে শুনে, মানুষের চোখ ফোটে না এই আশ্চর্য্য। জগতে সবজান্তা কেউ নয়, সব নিজের ক'রে কেউ থাকে না, যা চায় তাই সকল সময়ে কেউ পায় না। জগতের জীব পূরাপূরি তাই প্রাণের বল, জ্ঞানের বল, সুখ ঐশ্বর্য্যের বল, পেতে পারে না। জগতের বড়'র যে আশ্রয় নেয়, সে বড় ভেবে সুতরাং ছোটরই আশ্রয় নেয়, প্রবল ভেবে দুর্ব্বলকেই সে আঁকড়ে ধরে। ব'ড়র আশ্রয়, প্রবলের আশ্রয়, নিতে হ'লে, জগৎ ছাড়া জীবের আশ্রয় নিতে হবে। মহাপ্রাণের পায়ে আপনাকে লুটিয়ে দিতে হবে।

একবার যে 'তাঁর' হ'তে পেরেছে, তার আশ্রয়ের ভাবনা আর নেই। ভক্তির প্রাণ তাঁর, কাজেই ভক্তির প্রাণ সব বড়'র আশ্রয়ে সকলের চেয়ে প্রবলের আশ্রয়ে। এমন কিছু থাকতে পারে না, যা সেই বড় প্রাণের একধারে নেই, এমন কিছু বোঝবার বিষয় নেই যা সেই প্রাণের চোখের সামনেই প'ড়ে থাকে না, এমন কিছু পাবার মতন হ'তে পারে না, যা সেই প্রাণের এক কোণে পাওয়া যায় না। সেই প্রাণ সকল রকমের সব নিয়ে, আসল সব নিয়ে। সেই বড়'র বড়'র অভাবের তাড়না নেই, কি ক'রব ব'লে ভাববার নেই, কেমন ক'রে ক'রব ব'লে বিবেচনা করবার নেই। এমন জনের আশ্রয়ে থেকে, তাঁর পায়ের তলায় প'ড়ে থেকে, ভক্তির প্রাণ কোনও ভয়ে কাতর হ'তে পারে না, দুঃস্থ হ'তে পারে না।

জগতের জীব কার আক্রমণে, কার শত্রুতায়, কার বিক্রমে, সদাই ভয়ে জড় সড় হ'য়ে থাকে? থাকে এক শত্রুর। সেই শত্রু ছাড়া আর কোন শত্রুই মানুষকে সশঙ্ক রাখে না। এই শত্রু মানুষের কামনা। এর দল বল অনেক, মূল চাঁই কিন্তু এই। এরই কাজে এর দল বল চলে ফেরে। একে যে দেবে ফেলতে পারে তার আর জগতে ভয়ের ব'লে কিছু থাকতে পারে না। কামনা হ'তেই জগতে সব ভয়, কামনার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়েই যত ভয়। ঐ যে বলে ছয় 'রিপু,' এ সব কামনারই, আর কারুর নয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সবই কামনা ধ'রে। অপূর্ণ জগতের কামনার ঘরেই এদের সকলের বসবাস। কামনার ওঠা পড়া ভাল মন্দ নিয়েই এরা মানুষকে পেয়ে বসে। কামনার থাকার পথে ওঠা পড়ায় কাম, ক্রোধ, কামনার হওয়ায় পথে ওঠা পড়ায় লোভ, মোহ, কামনার যাওয়ার পথে ওঠা পড়ায় মদ, মাৎসর্য্য। মরণের জগতের আসল রহস্যই বাঁচা মরা থাকা, সুতরাং সেই জগতের মূল ভাব কামনায় এ রহস্য থাকবে বৈ আর কি হবে? কামনা গজিয়ে ওঠে, বেঁচে ওঠে, অমুক জিনিষ পেয়ে প্রাণকে তৃপ্ত ক'রব, ভাল ক'রে বাঁচাব, এই

লোভে, সেই জিনিষ পাবার উৎকৃট লালসায় ; তার পর—'এমন জিনিষ ? এ না পেলে কি প্রাণ বাঁচে ?—এই ভুলের বশে মরণের জিনিষকে বাঁচনের জিনিষ মনে ক'রে, মোহে প'ড়ে, 'এ জিনিষ কি পাব ? কি ক'রে পাব ? কোন্ রকমে পাব ? এ বুঝি পাওয়া যাবে না'—এই সব ভয়ে, লোভকে প'ড়তে দেখে। কামনা যখন—খুব পেয়েছি, সকলের চেয়ে বেশী পেয়েছি, ভেবে, নিজেকে ফুলতে দেখে, যা পেয়েছি তা আমার প্রচুর, এমন কত লোকের নেই, মনে ক'রে সামান্য ঐশ্বর্য্যে নিজের প্রাণ পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণ বোঝে, তখন সেই মদগর্ব্বে কামনা নিজের মরবার পথে, কেননা তখন যে জগতের সব তার ভোগের, সমস্ত জগৎ যে তার আসল কামনার ধারায়, সেই ভাবটা সে তখন হারায়। এই মদ গর্ব্ব কামনার ছুটে যায়, যখন অপরের ঐশ্বর্য্য, অপরের ভাল, কামনার নজরে পড়ে, তখন আত্মহারা কামনা একবারেই মরে, পরের ভাল সহ্য ক'রতে না পেরে মাৎসর্য্যে আপনার ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ ব'লেই ধরে, তার চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য পাবার জন্যে নিজের আগেকার ভাবকে ধিক্কার দেয়, কামনা তখন নিজের আকার প্রকার বদলাতেই চায়। আবার তার পর নূতন লোভ, লোভের সঙ্গে মোহ, নূতন মদ, মদের সঙ্গে মাৎসর্য্য। কামনার এই জন্ম মৃত্যুর জগতে আর বিরাম নেই। কিন্তু এই বাঁচা মরার মাঝে প্রাণের তাড়ায় থাকতেও হবে, প্রাণের মনের মতন জিনিষ পেতেও হবে, এই ভাবটা জীবের অনুরাগ হ'য়ে, কাম' হ'য়ে, মনোরথ হ'য়ে, প্রাণকে ব'ইতে থাকে, আর তারই সঙ্গে, তার আর এক দিকে, প'ড়তির দিকে, পাবার জিনিষ না পেলে বাধা বিঘ্নের ওপর দ্বেষ ক্রোধ তাকে জ'ড়িয়ে থাকে।

কামনার গর্ভে জ'ন্মে এই ছয় অসুর জগতে জীবকে ছন্নছাড়া ক'রেছে। এক পড়ে, এক ওঠে। এদের কেউ না কেউ জীবকে আটকে ব'সে আছেই। জীব যখন প্রাণের দায়ে ছুটে গিয়ে বড়র আশ্রয় নেয়, বিষ্ণুর পায়ে, মহাপ্রাণের পায়ে, জ'ড়িয়ে ধ'রে শরণাগত হ'তে পারে, তখন আর অসুর তাঁকে ধ'রতে পারে না, ধ'রতে গেলে

তাঁর শুদ্ধ প্রাণের দৃষ্টিতে, কোথায় উড়ে যায়, তাঁর 'সুদর্শন' অস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়। শুদ্ধ প্রাণের 'দর্শন' প্রাণের অসুর মারতে অমোঘ অস্ত্র। জীবের ইন্দ্রিয়, জীবের শত্রুর ছলনায়, প্রাণঘাতী 'দৈত্যের' চালনায়, মরবার পথে রাগদ্বেষে না চ'লে, যদি একেবারে আসল বাঁচবার পথে, শুদ্ধ প্রাণের শুদ্ধ ভালবাসার বশে চলে, ইন্দ্রিয়ের আসল প্রাণ-রূপী 'ইন্দ্রকে' আপনার ক'রে তাঁর হ'য়ে বাঁচতে চায়, তখন প্রাণঘাতী রিপু সেই বড় দেবতার শত্রুর ভেদক, প্রাণের চালক অস্ত্রের আঘাতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যায়। জগতের কামনা ছেড়ে, শুদ্ধ ভালবাসার শুদ্ধ কামনা নিয়ে থাকলে রিপুভয় আপনিই দূরে যায়। ইন্দ্ররূপী, বিষ্ণুরূপী, ভগবানের শুদ্ধ প্রাণের ভক্তই, এই শুদ্ধ ভালবাসার কামনার একমাত্র অধিকারী। স্বয়ং, শুদ্ধ হ'য়ে, শুদ্ধের আশ্রয়ে, শুদ্ধের সঙ্গে না থাকলে, সেই ভাবে আছি ব'লে না জানলে, শুদ্ধ হ'তে কেউ পারে না। ভক্ত এই ভাবে নিজেকে ভাবতে জানে, ভাবতে পারে, ভক্তই তাই শুদ্ধ জীব, ভক্তির প্রাণই শুদ্ধ প্রাণ। রিপুর ভয়, অসুরের ভয় একমাত্র ভক্তেরই নেই আর সকলেরই অছে। যে ভগবানের সে কামনার নয়, যে কামনার সে ভগবানের নয়। ভক্ত ভগবানের ভক্ত তাই কামনার নয়। ভক্তের কামনা শুদ্ধ কামনা, ভক্ত চায় শুদ্ধ প্রাণ, সে মরণের পথে নিয়ে যায় না।

ভক্ত যাকে চায় সে শুদ্ধ প্রাণ ভক্তের আপনার, খাঁটি আপনার ব'লেই ভক্তকে ছলনা করে না, বিশ্বাসঘাতকতা করে না। ভক্তের আশ্রয় শুদ্ধ প্রাণ, ভক্তের সঙ্গীও সব শুদ্ধ প্রাণ। ছলনা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবে কে? প্রতারণা প্রবঞ্চনা করে কে, না যে প্রাণকে বাঁচতে দেবনা ব'লে মারে। মারতে পারুক আর নাই পারুক মারার মতন ক'রলেই, প্রাণকে মরার ভাবনা ভাবতে দিলেই মারা হ'ল। না ম'রেও ম'রতে পারি ব'লে ভাবাই জগতের মহামোহ। জগতের ভাবে প'ড়লে এ মহামোহের হাতে প'ড়তেই হবে। এই মহামোহের জাল চারিদিকেই পাতা। যে দিকে তাকাবে সেই দিকেই দেখবে সব না

ম'রেও ম'রেছে, ঘুরে ফিরে বেঁচে উঠেও ম'লুম ম'লুম ডাক ছাড়ছে। জগৎ জুড়ে জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই মরণের রোল, অথচ সত্যি কেউ ম'রতে পারে না। পশু পক্ষী মানুষ ত দূরের কথা, জগতের দেবতাগুলাও, জগতের এক একটা শক্তি যাদের হাতে তারাও, এই মরণের ফাঁদে প'ড়ে ছটফট ক'রছে। সমস্ত জগ কে দেহে পূরে যে বিরাট্ পুরুষটি, সে মানুষটিও, সে দেবতাটিও, ম'রি ভেবে ম'রতে বাধ্য হয়। ম'রে 'বাঁচব' ভেবে জীবদেহে ঢুকে, নকল প্রাণ হ'য়ে, গোড়ার মোহ কাটাতে কেউ পারে না; সত্যি সত্যি না ম'রেও দেহ বদলানটাকেই প্রাণ বদলান ভেবে নিয়ে জীব প্রাণে মরে। ম'রে বাঁচবার খেয়াল কার কবে হ'য়েছিল, সে খপর নেবার বড় দরকার নেই, তবে জগতে যারা আছে, যারা আসছে যাচ্চে, তাদেরই গোড়ায় এই খেয়াল নিজের স্বাধীন ইচ্ছেয় হ'য়েছিল, তাই সবাইকের গলায় নিজের হাতের তৈরী ফাঁস। এই ফাঁসের গাঁটে গাঁটেই যত দুঃখ যত ভুল। প্রাণের সম্পর্কে মরণের সম্পর্ক ক'রে তুলেই দুঃখ, প্রাণের সম্বন্ধে মরণের সম্বন্ধ বুঝেই ভুল। আপনার প্রাণও মরার প্রাণ,আর সম্পর্কের, সম্বন্ধের, প্রাণও মরার প্রাণ হওয়াতে জগতে জীবের প্রাণের বুকে দুদিক্ থেকে বিশ্বাসঘাতকের ছুরী বসে। যাকে আমার ব'লছি সে ঠিক আমার নয়, তার আড়ালে আছে অজ্ঞাত ভাবে যে খাঁটি আমার, আর যে 'আমি' অপরকে আমার ব'লেছি সে 'আমিও খাঁটি আমি নই, আমার অন্তরালে আছি খাঁটি আমি। জানব বা পে'য়ে সুখ পাব জগতের কোনও জিনিষ ধ'রে এ আশা ক'রতে যাওয়াই বোকামি। আসল প্রাণের ভাগীদার ভক্ত, প্রাণের বাঁধনে, প্রাণের সম্পর্কে, বাঁধা ভক্ত, এ মায়া 'মোহ' যে ধারে গেছে সে ধার দিয়েও যায় না। সে জগতে যদি আসতে চায় ত ম'রব বাঁচব ব'লে আসতে চায় না, বাঁচব বাঁচাব সবাই বাঁচুক বাঁচাক এই ভাব নিয়েই আসতে চায়, ম'রতে দোবনা, মরবার ভাবনা ভাবতে কাউকে দোবনা, এই তার জগতের কাজ। মরণের ভুল, মরণের দুঃখ, ভক্তের কোনও অবস্থা-

তেই ঘটেনা। যাদের ঘ'টেছে তাদের সেটাও ভক্ত বাঁচাতে চায়। তাদের আড়ালে যারা তারাও ত শুদ্ধ প্রাণ, তারাও যে তার সঙ্গী, তাদের ফাঁস কেটে দেবার চেষ্টা না ক'রলে প্রাণের কাজ করা হ'তে পারে কি? ভক্তির প্রাণ নিজেত মোহে পড়েই না, অপরকেও মোহ থেকে উদ্ধার ক'রতে স্বতই উদ্যোগী, সদাই উদ্যোগী। ভক্তের প্রাণ কোথাও মরণ দেখেনা, দেখতে চায়না। এ প্রাণ দুঃস্থ হবে কিসে? যে অমৃতের ধারায় ডুবে আছে তার রোগ কোথায়? সংসারের, যাওয়া আসার, জ্বালা যন্ত্রনা তাকে ছুঁতেও পারে না। যে আসে যায় ব'লে না বুঝে, এক প্রাণেই আছি ব'লে বোঝে, তার যাওয়া আসার ভাবই নেই, এ ভাবের ক্লেশ আসবে কোথা হ'তে?

অমর ভাবে, আপনার শুদ্ধ ভাবে, খাঁটি প্রাণের ভাবে থেকে ভক্ত জগতে পাপের ভয়, পাপের দণ্ডের ভয় থেকেও সর্ব্বদা মুক্ত। জীব হিংসা হ'ল যত পাপের মূল, মারা ছাড়া পাপই নেই। অমুক জীব যেমন ক'রে নিজের প্রাণের স্ফূর্ত্তি, নিজের প্রাণের বিকাশ, পেতে চায়, তার পথে বাধ দেব এই ভেবে কিছু করাই পাপ করা, প্রাণের কাছে অপরাধ করা, হিংসার ভাব আনা। পরের প্রাণের হিংসায় আপনার প্রাণেই আগে হিংসা আনতে হয়। নিজের প্রাণকে মরণের ভাবে না ভাবলে অপরের মরণ ভাবতেই পারা যায়না। প্রাণহিংসার পাপে আপনার প্রাণহিংসার দণ্ড সঙ্গে সঙ্গেই। হিংসার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাব নিয়ে নিজেকে মরবার জন্যে তৈয়ারী ক'রতে হয়। মরার ভাবের প্রাণকে ম'রতেই হবে, ম'রে আবার বাঁচতে হবে, ভব ঘোরে ঘুরতে হবে। পাপের দণ্ড, দুষ্কর্ম্মের দণ্ড, আপনার প্রাণে মরণের ভাবের দণ্ড ছাড়া আর কিছুই যয়। ভক্তির প্রাণ সকল দিকেই বাঁচার ভাবে। অমুক মরুক,' অমুকের বাঁচনের পথে, ঠিক ভাবে প্রাণ ধরবার পথে বাধা পড়ুক, এ ভাব ভক্তের প্রাণে কোন রকমেই উঠতে পারে না। যে খুনে, যে দস্যু, যে সকল প্রাণেরই প্রাণ ধরবার পথের কাঁটা, সেও যাতে মরার ভাব ভুলে অমরের ভাব বোঝে,' অমরের ভাব পায়, ভক্ত তার

সম্বন্ধেও তাই চায়, তেমন লোক মরুক এভাবও ভক্তের শুদ্ধ প্রাণে উঠতে পারেনা, কেননা উঠলেই শুদ্ধ প্রাণ অশুদ্ধ হবে। শুদ্ধ হ'য়ে, শুদ্ধ প্রাণের আশ্রায় নিয়ে, চারিদিকে শুদ্ধ প্রাণে ঘিরে থেকে, ভক্তের প্রাণ পাপের অধিকারের, দোষের অধিকারের একবারে, বাইরে ; পাপের জন্যে, দোষের জন্যে, সাজার ভয়, শাস্তির ভয়, তার গণ্ডির ভেতর ঢোকবার অবকাশই পায় না। নিরপরাধ ব'লেও সুতরাং ভক্তের প্রাণ নির্ভয় ও সুস্থ।

জগতের প্রাণ যত রকমে অসুস্থ হ'তে পারে,ভক্তের প্রাণে তার কোন ভাবই কখনও উঠতে পারেনা। জগতের প্রাণ অব্যবস্থায় থাকে ব'লে পদে পদে দুঃস্থ হ'য়ে পড়ে, ভক্তির প্রাণ এক খুঁটিতে বাঁধা, তার এক লক্ষ্য, এক গুরু, এক মন্ত্র, এক তন্ত্র, কাজেই তার জীবনে এক ব্যবস্থা। প্রাণের শাসনে ভক্ত চলে,আসল প্রাণ যা বলে তাই করে,প্রাণ যা বোঝায় তাই বোঝে, প্রাণের যে সুখ তাই সে ভোগ করে। প্রাণের এই ব্যবস্থায় কখনও কোনও অসামঞ্জস্য ঘ'টতে পারেই না। ভক্তির ভাবে প্রাণ নিজের ব্যবস্থা বুঝে নিতে পারলে আর কি অস্থির হ'তে পারে ? ভক্তের স্বাধীন প্রাণ যা ইচ্ছে তখন ক'রতে পারে বটে, কিন্তু স্বাধীন ব'লে আত্মহত্যা কে কবে প্রকৃতিস্থ থেকে করে ? ভক্তিতে প্রাণ নিজের ভাবে, নিজের প্রকৃতিতে, কাজেই তার ইচ্ছে স্বতন্ত্র হ'লেও, নিজের তন্ত্রে, নিজের শাসনে, নিজের ভাবেই সে থাকবে এতে আর কথা কি ? নিজের ভাব ছুড়ে ফেলে দেওয়া, স্বতন্ত্র হওয়া, স্বাধীন হওয়া, নয়। নিজের ভাব ছেড়ে পরের বশ হ'লেই ত হ'ল 'পরাধীনতা'। নিজের শাসন না মেনে উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে স্বাধীনতার পরিচয় দেওয়া হয়না, স্বাধীনতা হারানরই পরিচয়ই দেওয়া হয়। নিজের বাঁধনে নিজের ভাবে নিজেকে বাঁধা ছাড়া স্বাধীন ভাব পাবার অন্য উপায় নেই। যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে 'সংযম' নেই, প্রাণকে নিজের প্রকৃতিতে রাখার চেষ্টা নেই, সেখানে স্বাধীন ইচ্ছা ইচ্ছা ক'রেই নিজেকে বিসর্জ্জন দেয়। প্রাণের ব্যবস্থার মাঝে ভক্তির প্রাণ এ

স্বাধীনতা, এ সংযম, কখনও হারায় না ব'লেই, তার 'সুস্থতা কখনও নষ্ট হয় না। প্রাণের ভক্তিই প্রাণের সুস্থতা, তার অভাবই প্রাণের দুঃস্থভাব। ভক্তির ভাবে প্রাণ যেমন ভাবে যা পেতে চায় তাই পেয়ে 'পূর্ণকাম' হয়, সে ভাবের কোনও রকম অদল বদল আর তার ইচ্ছার গণ্ডির মধ্যে পড়েনা, প'ড়তে পারেনা। জগতে যা পাব পাব ব'লে পাইনে, যার জন্যে জগতে ঘুরে মরি, সকল কাজের চেষ্টায়, সকল জ্ঞানের চেষ্টায়, সকল সুখের চেষ্টায়, যাকে লক্ষ্য ক'রে ছুটে গিয়ে ধ'রতে না পেরে হতাশ হ'য়ে প'ড়ি, ভক্তির টানে সেই আসল প্রাণ, আর আসল প্রাণের চির সুখের, চির শান্তির, ব্যবস্থায় প'ড়ে আর কেন ভাই আমি অব্যবস্থার ব্যবস্থা খুঁজব, তার জন্যে লালাইত হব? আসলে যা পাব খাস্তা নকলে তা পাব কোথা থেকে? সংসারের প্রাণের নিত্য অদল বদলের ব্যবস্থা থেকে এড়ান পেয়ে, ভক্তির প্রাণ, মুক্তির প্রাণ, ছাড়াপ্রাণ, খোলা প্রাণ, স্বাধীন প্রাণ হ'য়েও, নিজের সুব্যবস্থা, চিরকালের ব্যবস্থা, স্বইচ্ছায়, স্বভাবে, মেনে নিয়ে, কখনও অশান্তি, দুর্ভোগ, অসুস্থতার কবলে পড়ে না। সংসারের ব্যতিব্যস্ত প্রাণের ত কথাই নেই, সেত অব্যবস্থাতেই আছে, অব্যবস্থাতেই থাকবে, এমন কি শুধু মুক্তির ছাড়া প্রাণেও এই সুব্যবস্থা মেনে নিতে না শিখলে, ভক্তির ভাবে আপনাকে না তুললে, অব্যবস্থার জালেই আবার বাঁধা প'ড়ে সুস্থ হবার অবকাশ পেয়েও ব্যস্ত হয়। সব দেখবার সব জানবার অধিকার পেয়েও যে জ্ঞানের চোখ বুজে থাকবে, সবাইকে আপনার ক'রে সবাইকের কাজে আপনার কাজ, আপনার কাজে সবাইকের কাজ, ক'রতে পেয়ে যে কাজের হাত পা গুটিয়ে থাকবে, সকলের প্রাণে আপনার প্রাণ মিশিয়ে আপনার প্রাণে সবাইকের প্রাণ মিশিয়ে, যে পূর্ণ সুখ পেতে পারে, সে আপনার প্রাণকে শুধু আপনাতে টেনে ধ'রে ব'সে যদি থাক্‌বে, তা হ'লে প্রাণের তাড়াতেই সে আঁধারে অন্য পথে, অব্যবস্থার পথে, ছুটে বেড়িয়ে যাবে এতে আর আশ্চার্য্য কি? গোড়ায় শুদ্ধ প্রাণ এই রকমেই প্রাণছাড়া হ'য়ে, এই রকমেই ছন্ন ছাড়া হ'য়ে জগতে ঢোকে।

ছাড়া প্রাণ

যে যেখানে আছে সবাইকে আপনার ক'রে, আপনার কোলে নিয়ে, আপনার বুকে ধ'রে, সব জেনে, বিশ্বভরা সোহাগে, প্রাণ, জীবের প্রাণ, নিজের 'খাঁটি ভাবটি' চরিতার্থ ক'রে, পূর্ণ সুখে, পূর্ণ জ্ঞানে, তৃপ্তি পেয়ে, সুস্থির হ'তে যায় বটে, কিন্তু এটাও অসম্ভব নয়, এবং এতে আশ্চর্য্য মান্‌বারও কোনও কথা নেই, ভবঘোরে প'ড়ে আপনি সবাইকের হ'য়ে এবং সবাইকে আপনার ক'রে থাকবার চেষ্টা ক'রে, পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ ক'রে, তিক্ত বিরক্ত হ'য়ে, প্রাণ সব নিয়ে সুখের আশা, জ্ঞানের আশা, ছেড়ে দিয়ে, শেষে শুধু আপনাতে আপনি গুটিয়ে ব'সতে, আপনাকে আপনি জানতে, আর আপনার সুখে আপনি থাকতেই চায়। পরকে জানা, পরকে নিয়ে আনন্দ পাওয়া, পরের কাজে আপনার কাজ ম'নে করে সেই কাজে থাকা, জগতের জীবের প্রাণ ধারণের গতিক, এটা ঠিক কথাই, কিছু সে জানায়, সে আনন্দে, সে থাকায়, বুঝলাম না, সুখ পেলাম না, আসল কাজে র'ইলাম না, এই ভাবটাই বুকে সদা সর্ব্বদাই জেগে ওঠে। তাই ওসব ছেড়ে আপনসর্ব্বস্ব হ'য়ে ব'সতে প্রাণের যদি ইচ্ছে হয়, সেটা বড় অন্যায় অসংগত কিছু হয় না। কেউ কোথাও নেই, আমিই আছি একলা, আমিই সব, ছোটর মধ্যে প্রাণের ভিতর এই মস্ত বড় ভাব যদি হয়, তাহ'লে সেটাত ভাল কথাই। কোথাও কিছু ঠিক জানবার নেই, নিজেকে নিজে জানা ছাড়া আর জানা নেই, কাজেই ঐ জানাই যথেষ্ট জানা, এ রকম জ্ঞান এক হিসাবে মঙ্গলের জন্যেই, জগতের জানবার হিড়িক থেকে প্রাণকে এড়িয়ে রাখবার জন্যেই। সুখ বাহিরে কোথাও নেই, বাইরে সুখ খোঁজা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়, সুখ নিজের কাছেই, প্রাণের এ ধারণা দুর্ভোগ থেকে অব্যাহতি পাবার ধারণা, তাতে আর ভুল নেই। জগতের থাকায় না থাকা, জানায় না জানা, সুখে দুঃখ,

আপনা থেকে দূরে রাখতে হ'লে, শুধু আপনাতে আপনি হওয়ার চেয়ে আর ভাল উপায় আপনার দিকে তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যায় না। যাচ্ছে যাগ, বদলাবে বদলাগ, আমি ঠিক আছি ছিলাম থাকব, জীবের মরণের মাঝে এই কথা দপ্‌দ'পে ভাষায় লেখা র'য়েছে। জানি জানি ক'রে আর কিছু জানতে না পারলাম ত নাই পারলাম, আমার জানা আমাতেই আছে, এতে ভুল হবার কিছু নেই, এই অভ্রান্ত জ্ঞান প্রাণের মাঝে বুঝতে না চাইলেও মানুষকে বুঝতে হয়। আমার হ'য়ে, চির-কাল আমার সঙ্গে আমার প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে, স্থির থেকে, জগতের কেউ সুখ না দিক, তাতে কিছু যায় আসে না, আমার প্রাণ আমার হ'য়ে নিজের সুখ, চিরকালের সঙ্গী হবার সুখ, বেঁচে বেঁচেই দিচ্ছে, দিয়েছে, আর দেবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রাণ থেকে যাবার নয়। সব এক আমাতে, আমি এক সবে, শুধু আপনাকে ধ'রে, আপনার প্রাণে আপনি থেকে, আপনার জ্ঞানে আপনি জেনে, আপনার রসে আপনি ভেসে, প্রাণ জগতের থাকা জানা সুখের এনয় ওনয় তানয় এই নয় নয় নয়ের দায় থেকে অবশ্যই ছাড় পায়।

বিয়োগের যোগ চর্চ্চা ক'রলে, কেবল নয় নয় নয়ের যোগের পথ ধ'রলে, এই জগৎ ছাড়া ভাবে প্রাণ উঠতে পারে। রূপে রূপে খাঁটি রূপ নেই, রসে রসে খাটি রস নেই, গন্ধে গন্ধে খাঁটি গন্ধ নেই, পরশে পরশে খাঁটি পরশ নেই, শব্দে শব্দে খাঁটি শব্দ নেই, কোনটাতেই অজর অমর স্থির ভাবের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সবই যেন ঠিকের ধারার ইঙ্গিত ক'রেও নিজেকে ঠিক ক'রে ধ'রতে পারছে না, এই সত্য টুকু প্রতি কাজে, প্রতি আনন্দে, প্রতি জ্ঞানে, ধ'রতে পারলেই, প্রাণে এই যোগের সূত্রপাত হ'ল। জগতের প্রাণকে বিষয়ের যোগ থেকে, বিষয়ের সম্বন্ধ থেকে, মরার প্রাণের, ভূতের প্রাণের, সম্পর্ক থেকে স'রিয়ে নিয়ে এসে, জগতের হিসাবে প্রাণের উল্টা টানে, প্রাণের হিসাবে প্রাণের সোজা টানে, প্রাণের ভেতরে ভেতরে যে টানটুকু জগতের টানকে উল্টা বুঝিয়ে দিচ্চে, সেই টানে, প্রাণকে ফেলতে চেষ্টা করাই হ'ল

উল্টা যোগ ছেড়ে সোজা যোগ করা। এই সোজা যোগে, প্রাণের এই নিজের যোগে, প্রাণ আপনাতে আপনি হ'তে পায়, আপনাকে আপনি দেখতে পায়, আপনাকে আপনি জানতে পারে। সেই জানাতেই তার থাকা, সেই জানাতেই তার সুখ, খাঁটি থাকা, খাঁটি সুখ, একলার থাকা, একলার সুখ। ইন্দ্রিয় দিয়ে বিষয় ধ'রে জগতের উল্টা যোগ; বিষয়ের বাঁধন থেকে ইন্দ্রিয়কে খ'সিয়ে নেওয়াই সোজা যোগের পথ। এই উল্টা যোগে উল্টা প্রাণ মরণের পাঁচ বায়ুর টানে, উল্টা প্রাণের প্রাণবায়ুর টানে, বিষয়ের দিকে টেনে, বিষয়ের দিকে ঝুঁকে আসে। যোগ ক'রতে গেলে সেই জন্যে উল্টা প্রাণের প্রাণবায়ুগুলাকে অন্তরের সোজা দিকে আগে ফেরাতে যত্ন ক'রতে হয়। তোমার ভাই নিজের ইচ্ছের জোরে সোজা স্রোত উল্টা পথে ব'য়েছে, তলায় তার সোজা ভাব ঠিক আছে, কাজেই নিজের ইচ্ছের উল্টা ভাব ভেঙে দিলেই, ইচ্ছে ক'রে সোজা পথে আনতে চাইলেই, প্রাণবায়ু সোজা দিকেই ব'ইবে। তুমিই প্রাণবায়ুকে বেঁকিয়েছ জোড় ক'রে বেঁকিয়েছ, তাকে সোজা ক'রতে তুমি বেশ পার; বেঁকে সে ছোট হ'য়ে গেছে, ছোট নিয়ে, ছোট ধ'রে থাকে, সোজা হ'লেই আবার বড়র ভাবে আপনাকে ছ'ড়িয়ে ফেলবে। যোগের প্রাণায়াম তোমার প্রাণকে, প্রাণ বায়ুকে, এই রকম সোজা ক'রিয়ে ছড়াবার রাস্তা ধ'রিয়ে দেয়। 'প্রাণায়ামে' প্রাণ বায়ু ছ'ড়িয়ে, প্রাণকে সোজা যোগের দিকে, 'বিয়োগের' যোগীরা নিয়ে যান। প্রাণায়ামের অভ্যাসে, বিয়োগের যোগের অভ্যাসে, প্রাণ ক্রমেই জগতের কাছ থেকে ছাড় পেয়ে, জগৎ ছাড়া হ'য়ে, আপনার আপনি হ'তে থাকে। যোগ যখন পেকে ওঠে, আমিই এক এই জ্ঞানও তখন পেকে ওঠে। এই জ্ঞানেই তখন প্রাণের সব ভাব, থাকা, জানা, সুখ।

জ্ঞানের যোগে, শুধু কেবল এক ভাববার জ্ঞানের যোগে, প্রাণ বিষয়ের বাঁধন ছিঁড়ে' মুক্ত হয়, এ কথা অবশ্যই স্বীকার ক'রতে হবে, কিন্তু বুঝে দেখ দেখি ভাই প্রাণ এতে কি বেশ সুস্থ হ'তে পায়?

ছাড়া পেলে প্রাণ সুস্থ হবার পথে দাঁড়াল এটি ঠিক, কিন্তু ছাড়া প্রাণই কি সুস্থ প্রাণ? যে স্বাধীনতা প্রাণ হারিয়ে ছিল, দেহ মনের বাসনা, নকল প্রাণের বাসনাকে, আপনার বাসনা ক'রে, পরের বশে, পরের অধীনতায়, নিজেকে হাত পা বেঁধে ফেলে দিয়ে, ভিতরে স্বাধীন হ'য়েও, যে স্বাধীন ভাব বাহিরে প্রকাশ ক'রতে অক্ষম হ'য়েছিল, সে স্বাধীন ভাব ছাড়া প্রাণে ফিরে এলেও, ছাড়া প্রাণ আপনাতে যদি শুধু আপনিই থাকে তা হ'লে কোন কাজে সে স্বাধীন ভাব প্রকাশ ক'রবে? যার কাজ নেই, যার জানবার নেই, যার সুখের খোঁজ নেই, সে আপনাতে আপনি স্বাধীন হ'তে পারে, কিন্তু এ স্বাধীনতা ভুয়ো স্বাধীনতা, অকেজো স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কাজে। শুধু আপনাকে আপনি জানবার স্বাধীনতায় স্বাধীন ইচ্ছার এক রকম লোপ হয় ব'ল্লেও দোষ হয় না। কিন্তু স্বাধীন প্রাণে স্বাধীন ইচ্ছের লোপ, চিরকালের জন্য স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ইচ্ছে গুটিয়ে রাখা, অসম্ভব। স্বাধীন প্রাণ যতই গুটুতে তুমি চেষ্টা কর ছাড়া পেয়ে গুটিয়ে সুটিয়ে ব'সে সে কতক্ষণ থাকবে? সে জানবার জন্যে, সুখ পাবার জন্যে, কাজের জন্যে ছুটবেই ছুটবে। যে যা সে তা হ'তে চাবেই চাবে। কিন্তু শুধু জ্ঞানের যোগে, আপনাকে আপনি জানবার যোগে, প্রাণ ছুটবে কোথায়? আর ত কাউকে সে চেনবার জানবার চেষ্টা কখনও ক'রেনি, কে কোথায় সেত কিছুই জানে না। যদি কিন্তু সে জেনে থাকে, ঠিক ভাবে জানুক আর নাই জানুক, কোনও রকমে যা কিছু সে জেনেছে, ভুল ভ্রান্তির জানাতেই জেনেছে, সেটা নকল প্রাণের জানা শুনা ছাড়া আর কিছু নয়। জ্ঞানের যোগে আপনাকে ছেড়ে আর কাউকে না জানতে পারলে, অথচ প্রাণ আর কিছু জানবার জন্যে তাকে তাড়া ক'ল্লে, সে কাজে কাজেই হয়ত ভুল জানার দিকেই ফের ফিরবে। তখন ছাড়া পেয়েও তার ছাড়া পাওয়া হ'ল না। প্রাণের বড় খুঁটি যে আছে এটা সে কখনও ভাবেও নি, জানেও নি, কাজেই হাতের কাছেই সেই খুঁটি থাকলেও না জানবার গতিকে তাতে নিজেকে

ক'ষে বেঁধে স্থির হবার উপায় সে দেখতে পায় না। শুধু আপনাকে জানার ছাড়া প্রাণের চোখে বড় জ্ঞানের বড় প্রাণের, অন্য কোনও প্রাণের, আলো নেই। তার নিজের প্রাণের আলোয় সে নিজে আলোময় বটে, কিন্তু নিজের বাইরে সে আঁধারেই তাকায়। প্রাণ বাইরে তাকিয়ে যদি প্রাণ না জানে, প্রাণ না চেনে, তাহ'লে অগত্যা প্রাণ ছাড়া যা, প্রাণ নয় যা, তাই দেখছি ব'লে ভাববে। তাহ'লেই আবার ছাড়া প্রাণ প্রাণ ছাড়া হবে, মরণের পথে আসবে, মরণের সিঁড়িতে পা বাড়াবে। প্রাণের ঘরে নিজের আলো জ্ব'ললেই হয় না, প্রাণের বাইরে চারিদিকে আলো না জ্ব'ললে, প্রাণের প্রাণ ছাড়া হবার সম্ভাবনাটাই ঘ'টে ওঠে।

নয় নয় যোগের ছাড়া প্রাণ, চারিদিকে আসল প্রাণের, অন্য অন্য প্রাণের সন্ধান না ক'রে, সে সন্ধান না পেয়ে, প্রাণের প্রাণকে দেখতে জানতে চেষ্টা না ক'রে, তাঁকে দেখতে জানতে না পেয়ে, ছাড় পাবার আগে যে জগৎ জোড়া প্রাণের বঞ্চনায়, প্রাণে প্রাণ নেই ভাববার মায়া-মোহে প'ড়েছিল, আপনাতে কেবল আপনি ছাড়া পেয়েও সেই মায়ার জালে বাঁধা প'ড়ে যায়। মায়ার প্রাণে আর শুধু ছাড়া প্রাণে তফাৎ এই যে মায়ার প্রাণ আপনাকেও আপনি জানে না, শুধু ছাড়া প্রাণ সেটা জানে, কাজেই মায়ার বাঁধন কাটে। কিন্তু সে বাঁধন কাটলে কি হয়, যদি ভাবে ছোট হ'য়ে বাঁধা প'ড়ে বাঁচা ছাড়া, ম'রে বেঁচে বাঁচা ছাড়া; আর অন্য রকমে বাঁচবার কোনও ধারা নেই, তা হ'লে যে বাঁধন কেটে ছিল, সেই বাঁধনই সে আবার আদর ক'রে নেবে। মরণের প্রাণে জানায় অজানা, থাকায় না থাকা, আনন্দে বিষাদ, হ'লে কি হয়, শুধু ছাড়া প্রাণ জানার জানা, থাকায় থাকা, আনন্দের আনন্দ না পেয়ে, না জানার জানাতেই ঝুঁকবে, না থাকার থাকতেই থাকতে চাবে, বিষাদের আনন্দেই প্রাণ সঁপে দেবে। থাকতে, জানতে, সুখ পেতে, প্রাণের গতিকে তাকে হবেই হবে, আসলে না হ'লে নকলই সে না মেনে নিয়ে আর কি ক'রবে? শুদ্ধ সত্ত্ব হ'য়ে যে

ভাবটা প্রাণের ছলনার ভাব, মায়ার ভাব, মোহের ভাব ব'লে ছাড়া প্রাণ বুঝে ছিল, দিশে না পেয়ে ফের সেই ভাবে আবার ঢুকে সেইটাই একমাত্র ভাব, কাজেই আসল ভাব, সত্যের ভাব, এই ধ'রে প্রাণ বড় হ'য়েও ছোট হবে, সত্যির হ'য়েও আবার মিথ্যের হবে। তুমি ভাই যে সুখ পাচ্চ, জগতের সে সুখ তোমার আসল সুখ নয় একথা তাকে ব'ল্লে, ছাড়া পেয়ে যে প্রাণ স্বইচ্ছায় বাঁধনে ঢুকেছে, সে তা বুঝবে কেন? ওই জগতের সুখে দুঃখ মাখান সুখ ছাড়া সুখ ত সে পায়নি, সুতরাং দুঃখের সুখই তার কাছে এক সুখ, ঐ ভাব ছেড়ে আসল কাজের সুখ, আসল দশ জনের হ'য়ে দশ জনের সুখে সুখ, তার কাছে কথার কথা। এই রকম ফের বাঁধা পড়া ছাড়া প্রাণকে জগতের জানায় জানা নেই যদি বল, তা হ'লে সে মনে প্রাণে ব'লবে যে জগৎ ছেড়ে জানার জানাও ত জানলাম না, জ্ঞানের যোগে সে রাস্তা ত ধ'রতে পারিনি। সব নিয়ে পূরন্ত হ'য়ে থাকা, দশের হ'য়ে থাকা, দশের কাজে থাকা, চির-কালের জন্যে এই রকমে থাকা, জগতে ঘ'টে উঠবে না ব'ল্লেও, যে ছাড়া পেয়ে কাউকে নিয়ে থাকতে পাবার গতিক দেখেনি, সে ব'লবে স্থির হ'য়ে জড় ভরত হ'য়ে থাকার চেয়ে, অস্থির হ'য়ে আজ একে, কাল ওকে, পরশু তাকে ধ'রেও, দশের মাঝে দশের হ'য়ে থাকাও ভাল। ফল মায়া ছাড়িয়েও ছাড়া প্রাণ কেবল আপনি জানার যোগে মায়ার হাতে ইচ্ছে ক'রে এসে ফের প'ড়তে চাবে, তবু শুধু আপনার আপনি হ'য়ে থাকতে পার্ব্বে না। যোগের ছাড়া প্রাণ মায়ার জালে বাঁধা প'ড়তে পারে ব'ল্লে ঠিক বলা হয় না, সেই জালে বাঁধা প'ড়বেই প'ড়বে এতে ভুলটি নেই।

শুধু ছাড়া প্রাণ মায়ায় এসে যেই প'ড়ল অমনি তার দুর্দ্দশাও আরম্ভ হ'ল। ছাড়া পেয়ে আর কাউকে জানুক আর নাই জানুক, আপনাকে অন্ততঃ সে জেনে ছিল, ঠিক জানা ব'ললে যা বোঝায় সে রকম জানা নাই জানুক, আমি এই রকম ওই রকম নই, সমান অসমান তুলনা ক'রে আপনাকে না বুঝুক, আমাতে এই, আমি এ টুকু,

ছাড়া প্রাণ, শুধু প্রাণ, ঠাওর ক'রেছিল। কিন্তু মরণের হ'য়ে আমিই আমি এ জানা টুকুও ঘুচে যেতে বসে। আমি আজ থাকব কাল থাকব না, এ ভাব যার অস্থি মজ্জা, সে জ্ঞানে আমি আমিই থাকব, এটকুও বুঝতে বাধে। প্রাণ প্রাণ ছাড়া হ'তে পারে না, আমি আমি না থেকে পারিনে, এটা স্বতঃসিদ্ধ বটে; কিন্তু তবু মরণের ভাবে, ইচ্ছে ক'রে প্রাণের উল্টা ভাব প্রাণে টেনে এনে, ঐ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানটাও আর যেন স্বতঃসিদ্ধ থাকে না। প্রাণে প্রাণে যা সত্য, যা পরম সত্য, সে জ্ঞানটাকেও নষ্ট ক'রতে পারে ব'লেই ত মায়া মায়া। জ্ঞান নিজের সর্ব্বনাশ না ক'রলে আর অজ্ঞান হ'বে, মোহ হ'বে কেন? ছাড়া প্রাণ মায়া মোহে প'ড়ে তাই তার একমাত্র জ্ঞানের গোড়ায় কুড়ুল মারে। উল্টা টানের ভুল জ্ঞানকে সার ক'রে, নিজের আসল প্রাণ ছেড়ে, আসল আমি ছেড়ে, অন্য কত কি জড় ক'রে নকল আমি সাজিয়ে, তাকেই আমি ব'লে, মরণের আমির অধিকারে প্রাণ ধ'রে নেয়। পাঁচ ভূত এনে মরণের পাঁচটা এনে, সেই গুলার জড় করা জড় দেহকে আমি ব'লে, মরার আমি হ'য়ে মরতে পেয়ে, নিজের মোহকে তখন প্রাণ চরিতার্থ করে। ভেতরে ভেতরে আসল প্রাণের ঝোঁকে কিন্তু ম'রেও আমি থাকব এ ভাব টুকু ছাড়তে প্রাণ চায় না। মোহটা এই রকমে আরও পেকে ওটে, 'জ'ড়িয়ে' ধরে। ম'রেও থাকব, অথচ দেহ ত থাকবে না, এটা বুঝে দেহের ভেতরে যার বলে দেহ নিয়ে নিজেকে মরণ বাঁচনের আমি ব'লে বুঝি, সেই মরণ বাঁচনের বোঝবার-শক্তিটেকেই সেই অন্তঃকরণটাকেই, আমি ক'রে প্রাণ তুলে নেয়। তার ভেতরেও কিন্তু ম'রে বেঁচে থাকব এই মোহ। যাতে মরার বুদ্ধি আছে, সে যে প্রাণের বুদ্ধি হ'তে পারে না, মোহে প'ড়ে প্রাণ এটা বুঝেও বোঝে না। যে প্রাণ তার জ্ঞানের সব ধারাতেই প্রাণ। বুদ্ধির মরণ, ম'রতে পারি এমনি বোঝাও, প্রাণকে উল্টে দেওয়ারই লক্ষণ।

প্রাণ নিজেকে না বুঝতে আরম্ভ ক'রলে, নিজেকে উল্টা ভাবে ভাবতে সুরু ক'রলে, যে মরার দেহ মরার মন নিয়ে উল্টা চালে চ'লতে

পারে, সেই দেহ সেই মন নিয়েই নিজের 'প্রাণযাত্রা' চালাতে আরম্ভ করে। আমি মরণের ভাব সব দিকে ভোগ ক'রব, মরণের হব, এই আছে এই নেই এই রকম জানবার অধিকার পাব, যেমন থাকব তেমন থাকব না, পলে পলে বদলাব, মাঝে মাঝে একবারেও বদলাব, এই সব ভাব প্রাণে উল্টা টানে এনে, সেই সেই মরণের বুদ্ধি অভিমান মন দেহ নিয়ে, সে আপনাকে ভেল ক'রে সংসারে চ'লিয়ে দিতে প্রাণকে মন্ত্রণা দেয়। সেই মন্ত্রণার কুহকে প'ড়ে প্রাণ উল্টা প্রাণ সাজিয়ে, উল্টা প্রাণের সাজে, ওলট পালটের প্রাণের সাজে, স্বয়ং নিত্য হ'য়েও অনিত্যের মতন সংসারে ঘোরে ফেরে আসে যায়। জ্ঞানের প্রাণ অজ্ঞান হ'লেই সে তখন আর নিজেতেও থাকতে যেন পারে না। কথাটা শুনলেই আশ্চর্য্যের মনে হয় বটে, কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার গোড়াতেই, শেষে কিছুই আশ্চর্য্যের নেই। যে নিজেকে ওলটাবে তার উল্টা ভাবে আশ্চর্য্য হবার আর কি আছে? অনিত্য মন, অনিত্য দেহ, অদল বদলের মন, অদল বদলের দেহ যখন প্রাণ হ'য়ে দাঁড়াল, তখন সেই অনিত্য প্রাণে অদল বদলের ভাব সব দিক্ থেকেই জুটবে। এই মুহূর্ত্তের দেহ পর মুহূর্ত্তেই বদলাবে, এখনই যাতে মন দিচ্চি পরক্ষণেই তাতে মন দেব না, আজ যা আমার ক'রে আমি আমি হ'য়েছি সেটা কাল আর আমার থাকবে না, সেই আমার হিসাবে আমি তখন ব'দলে যাব, আর এক রকমের ব'লে নিজেকে বুঝব, পদে পদে নকল প্রাণে এই সব মরণের ভাব ভাবতে বাধ্য হ'তে হয়। দেহের পতন ভাবতে গেলে ত আবার জ্ঞান থাকে না। তখন আমির ভাবে আরও গুরুতর বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত হয়। জগতে চলা ফেরার আমি, এটা ওটা ভোগ করবার আমি, এটা ওটাকে আমার আমার করবার আমি, এটা ওটা বোঝবার আমি, দেহের পতনে একটা অভিনয় সাঙ্গ ক'রে, আর একটা অভিনয়ের নট সাজতে তৈয়ারী হব। যত কাল এই মরণের আমি থাকব, ততকাল কতবার যে নূতন নূতন সাজ প'ড়ব তা বলতে পারি নে। ছাড়া প্রাণ নিজেকে জেনেও

যখন অজ্ঞানের ফাঁদে পা দেয়, তখন এই অনিত্যের বিড়ম্বনায় না প'ড়ে যায় না।

অনিত্যের বিড়ম্বনায় প'ড়তে প'ড়তেই প্রাণ দুরন্ত অসুখের মাঝে পড়ে। ছাড়া প্রাণে সত্যি সত্যি সব নিয়ে সুখ পাবার উপায় নাই হ'ক, আপনিই সব হ'য়ে, সবই আপনি হয়ে, আপনাকে হারাবার আর আপনার জিনিষ হারাবার দুঃখটা ঘুচে যায়। কিন্তু যখন শুধু দুঃখ না পাবার সুখে প্রাণের সুখের তৃষ্ণা মিটে ওঠেনা ব'লে প্রাণ সঙ্গ সুখ পেতে ছুটে গিয়ে চারি ধারে সত্যির প্রাণ না জানার গতিকে, জগতের মরণের প্রাণগুলার সঙ্গ ধ'রে, তাদের নিয়েই দুঃখের সুখ পেতে ছোটে, তখন দুঃখ সে নিজেই টেনে আনে। দুঃখের হাত হ'তে এ অবস্থায় সে মুক্তি পায় না বটে, কিন্তু সঙ্গসুখ, দশজনের হ'য়ে থাকবার সুখ, সে কতকটা পায়, পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে মনে করে। শুধু একলার প্রাণে এই সুখটুকু না পেয়েই সে দুঃখের বিড়ম্বনাও ঘাড়ে পেতে নেয়। সুখ চায় ব'লেই প্রাণ দুঃখ চায়না,যদি দুঃখ না হ'লে সুখ পাওয়া না যায় তবে প্রাণের কাছে সেই মিশান সুখও ভাল, তবু কেবল দুঃখ নেই ব'লে প্রাণ খুসী হ'তে পারে না। ছাড়া প্রাণ যে পথে গেলে সঙ্গসুখ পাওয়া যায় সে পথ কখনও ধরে নি ব'লেই ছাড়া পেয়ে ধরা প'ড়তে আবার চায়। মরা প্রাণের সঙ্গে নানান্ দুর্ভোগ ভোগ ক'রে,আবার বিরক্ত হ'য়ে, আবার তাদের ছাড়বার যোগ, ছাড়বার উপায় ধ'রে, ছাড়া পেতে পারে বটে, কিন্তু পেলেও আবার স্বভাবের তাড়নায়, সুখের প্রাণে প্রাণের সুখ পাবার ইচ্ছায়, অন্য উপায় না দেখতে পেলে, অন্য অন্য প্রাণের প্রাণের সন্ধান না পেলে, দুঃখ মিশন সুখ পেতেই ইচ্ছে ক'রে, ছাড়া প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছেয় ঘুরে আসবে। জগতের প্রাণ মরা জিনিষের বাসনায় ঘুরে ফিরে আসে যায়, ছাড়া প্রাণ আর গতি না দেখে সাধ ক'রে মরণের অধিকারে ঢোকে। এক দিকে মরা জগতের টান, অন্য দিকে ইচ্ছে ক'রে প্রাণকে মরণের হাতে ফেলে দেওয়া। একদিকের ইচ্ছা পরাধীন, অন্য দিকের ইচ্ছা স্বাধীন। এক দিকে

মরাকে জীবনের একমাত্র গতিক ব'লে মরণে পড়া, অন্যদিকে শুধু মরণ এড়িয়েও বাঁচার বাঁচা হয়না ব'লে ম'রে বেঁচে বাঁচতে গিয়ে মরণে পড়া। একদিকে মোহের একটানা স্রোত, অন্য দিকে জ্ঞানের স্রোত থেকে মোহের স্রোতে গা ঢালা।

ছাড়া প্রাণ মায়ার ফাঁস নিজের গলায় জ'ড়িয়ে, প্রাণ জানা থেকে প্রাণ না জানায়, প্রাণে থাকা থেকে প্রাণে না থাকায়, প্রাণ পেয়ে সুখ পাওয়া থেকে প্রাণ না পাওয়ার দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণের প্রাণ না জানায়, প্রাণের প্রাণে না থাকায়, প্রাণের প্রাণের সঙ্গ ধ'রে সুখ পেতে যত্ন না করায়, আপনার যোগে শুধু মুক্তির প্রাণে পরে আপনহারা হয়। চারি ধারে, প্রাণের প্রাণের ভাগে ভাগে, সব আপনার, সব একই ভাবের, সব শুদ্ধ, সব মুক্ত, এ কথাটুকু ত'লিয়ে একবার প্রাণ না বুঝে, পরকে আপনার ক'রতে, প্রাণহারা প্রাণকে আপনার ক'রতে, আপনার প্রাণে নিজেও প্রাণছাড়া হয়। আসল আপনার জিনিষ, প্রাণের জিনিষ, প্রাণে টেনে নিয়ে পূরন্ত হবার মতন হ'য়েও, প্রাণছাড়া জিনিষ ধ'রে পূরন্ত হ'তে গিয়ে, সমানে সমানে মিশবার জন্যে নিজেও প্রাণ ছেড়ে, আসল নিজেতে নিজে খালিই থেকে যায়। বড় প্রাণের, সবজোড়া প্রাণের, ভাগের ভাগ হ'য়েও,সেভাগে, সেভাবে, নিজেকে ধ'রতে না পেরে, একলা ছাড়া প্রাণ ছোট ভেবে ছোট হ'য়ে, ছোট ভেবে যারা ছোট হ'য়েছে তাদেরই দলে মিশে যায়। অমৃতের সাগরে এসে অমৃতের সাগর ছাঁচতে পেয়েও, যারা সেই সাগর ছেঁচে প্রাণের প্রাণ তুলে ভোগ ক'রছে, তাদের দলে না মিশে, প্রাণের টানে, প্রাণের প্রাণের টানে, যোগ না দিয়ে, যারা উল্টা টান ধ'রে অমৃত থেকে গরল তুলছে, তাদের দলভুক্ত হ'য়ে, অমৃতে গরল পেয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত ছাড়া প্রাণ নিজেকে মরণের রসে ভিজিয়ে দেয়। ফল একলার যোগের ছাড়া প্রাণের মুক্তি কোন দিক্ দিয়েই কাজে দাঁড়ায় না। প্রাণ প্রাণের ব্যবস্থার বাঁধনে আপনাকে না বাঁধলে, নিজের সব ভাবকেই অব্যবস্থার ফাঁদে ফেলবে, নিজের ঝোঁকেই ফেলবে। ছাড়া পেলে যাতে ফের ফাঁদে না পড়ে

সেটুকু না জানলে, ফের ফাঁদে পড়ায় আশ্চর্য্য কিছুই নেই। ছাড়া পাবার সঙ্গে জগৎছাড়া হ'য়ে থাকবার,প্রাণে প্রাণে থাকবার ভাব প্রাণে জাগান চাই। নইলে মুক্তি, আসল মুক্তি, প্রাণের মুক্তি, প্রাণের ভাব বজায় করা মুক্তি না হ'তে পেলে, নিজেকেই প্রাণ মুক্তি দেয়, মুক্তির ভাব ছেড়ে দিয়ে অমুক্তির পথে দাঁড়ায়। এক ভক্তির যোগের মুক্তি ছাড়া আর কোন মুক্তিই যোগের ধারায় প্রাণের ভাব বজায় ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে না, অন্য যোগের মুক্তি তাই প্রাণে পেয়েও প্রাণ ছাড়তে বাধ্য হয়।

একদিন ভাই এই ভারতে বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ মুক্তি আর নির্ব্বাণের যোগ ভারতবাসীর মন আকর্ষণ ক'রেছিল। কিন্তু এ নির্ব্বাণ যোগ আর মুক্তি বেশী দিন ভারতের ধর্ম্মের প্রাণে স্থান পায় নি। কেন পায়নি জান কি ভাই? পায়নি কেন না নির্ব্বাণের ভাব প্রাণকে ধ'রে রাখবার ভাব নয় ব'লেই। জগতের সঙ্গে পরিচয়ে সব দিক্‌টেই প্রাণ ছাড়া, খালি, শূন্য, এটা ঠিক কথাই। কোথাও প্রাণ নেই, যে জানে সেও আসল প্রাণ নয়, যাকে জানে, যার সঙ্গে পরিচয় করে, সেও আসল প্রাণ নয়, সবই শূন্য প্রাণ, একথাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই। জগতের পরিচয়ের সব ধারায় এই শূন্যভাব অভ্যাস করবার জন্যে মনে প্রাণে সব শূন্য ভেবে, সেই শূন্যযোগে জগতের সম্পর্ক শূন্য সম্পর্ক ব'লে, সে সম্পর্ক ছাড়তে পারলেও মন্দ কথা নয়। কিন্তু সেই শূন্য যোগের পাকাপাকি অবস্থায় প্রাণের কি দশা হয় বল দেখি? সে বরাবর আপনিও নেই, আপনারও কিছু নেই, এই রকম নেই নেই-টাই ভেবে এসেছে। তার যেমন ভাবনা সিদ্ধিও ত সেই রকমেরই হবে। যোগের চরম ভাব সে আপনিও আপনি হয় এই মাত্র। জগ-তের আমি আমি নই, কিন্তু এর মূলে যে একটা আসল আমি আছি এ ভাবটাও শূন্যযোগে নেই। প্রাণ প্রাণছাড়া হ'য়েও যে প্রাণের ভাব, প্রাণের ঝোঁক, প্রাণে প্রাণে ছাড়তে পারেনা, কখনই পারেনা, শূন্যযোগের কোনও অবস্থাতেই সেটুকু প্রাণে জাগান হয় না। শূন্য যোগের জগৎ ছাড়া প্রাণ আপনাকেও নিবিয়ে দিতে চায়, আপনাতেও

আপনি নেই বুঝতে চায়। কিন্তু এটা অসম্ভব। আমি এ রকমের আমি না হ'তে পারি, মনের দেহের জগতের আমি না হ'তে পারি, কিন্তু এ রকমের না হওয়ায় আড়ালে আসল রকমের আমি একটা আছি এ ভাব, এ ভাবনা, থাকবেই থাকবে। না থাকার আড়ালে সর্ব্বত্রই থাকার ভাব তুলে ফেলে দেবার জো নেই। শূন্য প্রাণ প্রাণ ছাড়া হ'তে কখনই পার্ব্বে না। প্রাণ হবার ঝোঁকে, জানবার থাকবার সুখ পাবার ঝোঁকে, আসল প্রাণে না মিশতে পেলে, প্রাণ ছাড়া প্রাণের দলে ফের এ'সে জুটবে। নির্ব্বাণ মুক্তির প্রাণ আপনাতেও প্রাণ না পেয়ে নিজের ঝোঁকে অগত্যা খালি প্রাণের দেশে এসে ঢুকবে। যে দেশের প্রাণছাড়া প্রাণ প্রাণ নয় ব'লে সে সে দেশ ছেড়ে ছিল, প্রাণের দেশে গিয়ে নিজের বোঝবার দোষে, শূন্যযোগের শিক্ষা দীক্ষা অভ্যাসের দোষে, প্রাণ পেয়েও, প্রাণের সঙ্গ পেয়েও, সে আপনাকে আর সবাইকে চিনতে না পেরে, প্রাণের মুখ দেখবার জন্যে ফের ভুল প্রাণের দেশেই ফিরে আসতে কুণ্ঠা বোধ করে না। আসলের অভাবে নকল ধ'রেও প্রাণ তৃপ্তি পেতে চায়, তবু একবারে নস্যাৎ হ'তে চায় না।

শূন্যযোগের দুর্দ্দশা বুঝে যদি ভাই বল যে আচ্ছা শুধু প্রাণের প্রাণ, শুধু বাঁচবার প্রাণ, শুধু থাকবার প্রাণ, চর্চ্চা ক'রে, সেই যোগ ধ'রেই না হয় প্রাণছাড়া জগতের বিড়ম্বনা থেকে প্রাণকে স'রিয়ে নিয়ে ফেলব, আর সেই শুধু থাকার প্রাণেই প্রাণের মরণের হাত থেকে মুক্তি অনুভব ক'রব। এই পাথুরে প্রাণ, কোটো প্রাণ, মুক্তির অবস্থায় পেয়ে, আর কিছু হ'ক না হ'ক, অন্ততঃ আমি যে আছি এ ভাবটা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ধ'রে থেকে, কিছু স্থির হওয়া যায় বটে। তবু কিন্তু প্রাণের সব ভাব এতে স্থির হয় না। যে আপনাকে আপনি না জানলে, আছি ব'লে না বুঝতে পারলে, তার থাকাটাও ত ফাঁকা হ'ল। আছি ব'লে বুঝলেই আপনাতে আপনার যে প্রীতিটুকু, যে পূর্ণ ভাব টুকু, নেই নেই ভাবের দুঃখের অভাবটুকু, অনুভব করা যায়, সে সুখটুকুওত পাথুরে

প্রাণে সম্ভবে না। থাকা, জানা, আনন্দ পাওয়া, এ তিনটা এক সূতোয় গাঁথা, একটা ছিঁড়ে গেলেই সূতো ছিঁড়ে সব কটাই খ'সে যাবে। পাথুরে প্রাণ সুতরাং নিজেকেই নিজে ঠিক ভাবে পায় না। তার ওপর থাকা, জানা, আনন্দ পাওয়া,পরের সম্পর্কে কাজে, জানায়, সুখ পাওয়ায়, নিজেদের প্রভাব দেখায়, স্ফূর্ত্তির পরিচয় দেয়। আর কোন রকমেই সেই সেই ভাব নিজের নিজের স্ফূর্ত্তির পরিচয় দেয় না। জ্ঞান ছাড়া সুখ ছাড়া থাকার প্রাণে, প্রাণের এই তিন ধারার স্ফূর্ত্তিরই সম্ভাবনা নই। থাকার প্রাণ প্রাণ পেয়েও আসল ভাবটুকু ঘরে বাইরে কোথাও পেতে পারে না। শুধু থাকার প্রাণ খোঁজবার উপদেশ যাঁরা দিয়েছেন, তাঁরা এই ভেবেই দিয়েছেন, যে দুঃখ মেশান সুখের চেয়ে, অজ্ঞান মেশান জ্ঞানের চেয়ে, সুখ ছাড়া জ্ঞান ছাড়া প্রাণও ভাল, আর দশ জনকে নিয়ে থাকতে, জানতে, আনন্দ পেতে গিয়ে, পদে পদে না থেকে, না জেনে, দুঃখ পেয়ে, বিড়ম্বনা ভোগ করবার চেয়ে, শুধু থাকাই পরম লাভ। এ উপদেশ নৈরাশ্যের উপদেশ। প্রাণ আসল ভাবে নিজেকে বুঝলে, চারিদিকের প্রাণ ধ'রে, প্রাণের প্রাণ ধ'রে, পরম সুখে পরম জ্ঞানে নিছক বাঁচায় থাকতে পারে। সেটা না বুঝতে পারাতেই নৈরাশ্যের পথ ধ'রতে বলা হয়। যে জগতের কাজেই কেবল ঘুরে মরে, সেই রকম থাকার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আপনার পরম মঙ্গল ব'লে ভাবে, তার জন্যেই এই পাথুরে প্রাণের পাথুরে বোঝার উপদেশ। পাথুরে প্রাণ কিন্তু শুকনো নিষ্কৃতি পেয়েও শেষে তাতে তুষ্ট হ'তে পারবে না। প্রাণ তিন ধারায় নিজেকে যতক্ষণ না বাইতে পার্ব্বে ততক্ষণ তার তৃপ্তি-পাওয়া অসম্ভব। পাথুরে প্রাণ আসলের সন্ধান না ক'রতে পেরে ফের নকলে ঘুরে আসবেই আসবে।

শুধু থাকার প্রাণের যোগে যে কারণে প্রাণের আসল ভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ'রিয়ে দিতে পারেনা, আপনাতে থাকার জানার যোগ, অথবা আপনাতে থাকার জানার আনন্দ পাওয়ার যোগও সেই রকমই অল্প বিস্তর কারণে প্রাণ থেকে জগতের মরণের বাঁধন খ'সিয়ে নিয়েও

প্রাণের নিজের সীমানাতে নিজেকে যেন বেঁধে রাখে, ছেড়ে দিয়েও ছেড়ে দেয় না। যারা নিজের ভাবে, নিজের মতন, তাদের সঙ্গেও যদি থাকতে না পেলাম, তাদেরও যদি জানতে চিনতে না পারলাম, তাদের আপনার ক'রে, আপনাকে তাদের ক'রে যদি সুখই না পেলাম, তবে আরে নিজের প্রাণের ভাবের পূর্ণ বিকাশ পেলাম কৈ? যদি ছাড়া পেয়েও তা না ঘটে, না ঘটবার হয়, তবে ছাড়া পাওয়ার চেয়ে বাঁধা থাকাও যে ছিল ভাল। সে বাঁধনেওত অন্ততঃ নকল সাজে পরের মুখ, স্বজাতির মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। এ মুক্তির যে আসল নকল কোনও সাজেই তা পাইনে। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আপনার প্রাণের আপনি প্রাণ নকল সাজও পছন্দ করে। জাতি ভাই আছে, তার সঙ্গেও ব্যবহার ক'রতে পাব না, এই যদি মুক্তি হয় ত এমন মুক্তি না পাওয়াই ভাল। আপনার আপনির প্রাণের এ ভাব খুবই স্বাভাবিক।

আপনার আপনির প্রাণের যোগে মুক্তিতে এই বিরক্তি ঘ'টতে পারে বুঝেই এক শ্রেণির মহাপণ্ডিত ঐ বিরক্তির মূল উপড়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রেছেন, বুঝিয়েছেন এক ছাড়া দুই নেই, মুক্ত প্রাণের আর জাতি ভাই নেই, সে একাই সব, সত্যি সত্যিই সে নিজেই নিজের সর্ব্বস্ব, আর কোথাও কিছু তার জানবার নেই, কারও সঙ্গে তার সম্পর্ক পাতাবার নেই, কারুর সঙ্গ পেয়ে তাকে আনন্দ পেতে হবে না, সে নিজেই নিজে, নিজেই পূর্ণ, এক মাত্র প্রাণ। প্রাণকে এই রকম বুঝিয়ে সেই যোগে তাকে জগৎ ছাড়িয়ে তোল, অবশ্যই তুলতে পারবে; তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ছাড়া পেয়ে এই ভাবে কি সে থাকতে পার্ব্বে? বাঁচনের মূলতোলা বাঁচনে, জ্ঞানের মূলতোলা জ্ঞানে, সুখের মূল-তোলা সুখে সে আপনাকে বিড়ম্বিত ব'লেই ভাববে। যদি কোথাও কিছু আর না থাকে ত কাজের তাড়া, জানবার ঝোঁক, সুখের খোঁজ প্রাণে ওঠে কেন? প্রাণ নিজেকে অবশ্যই প্রবঞ্চনা ক'রতে চায় না। প্রাণের নিজের ভাব যদি ফেলতে হয় তবে সে ত শূন্যই হ'ল। নিজের

ভাব প্রাণ ফেলবেনা, ছাড়া পেয়ে তা ফেলতে হ'লে ছাড়া পাওয়ার ভাবই ছাড়বে।

(১৮)

ব্যস্ত প্রাণ

এটা এই রকমের, এটা ও রকমের নয়, এটা এই জাতির, এটা ওই জাতির নয়, এটায় এই এই বিশেষ আছে, ওই ওই বিশেষ নেই, এই ভাবে যে জিনিষকে জানা যায়, সেই জিনিষের সেই জানাটাই ঠিক জানা হয়। প্রাণ যখন আপনাকে ঠিক জানবে তখন তা হ'লে ঠিক এই রকম ক'রেই জানবে। জগতের জানা কিন্তু কখনও পূর্ণ হ'তে পায় না। যে জিনিষ তুমি জগতে জানতে যাবে, তার সমান জাতির কতকগুলা মাত্র তোমার জানা আছে বা জানবার মতন ভাবে আছে, আর তার সমান যারা নয় তাদেরও মধ্যে খুব সামান্যই তোমার জানা শুনা মত আছে। যত কিছু সমান, যত কিছু সমান নয়, পূরোপূরি ভাবে জগতের ছোট প্রাণ কখনও তা আয়ত্ত ক'রতে পারে না। কাজেই কোনও জানাটাই জগতে জানার মতন হয় না। জানবার চেষ্টা, জানবার ঝোঁক, সকল সময়ই থাকে বটে, কিন্তু স্থির ভাবে, ধ্রুব সত্যের ভাবে, জগতের প্রাণের কখনও জানবার উপায় নেই। তা ছাড়া যেখানে জানবার প্রাণ দু ধারেই অদল বদলের, যে জানে যাকে জানে এ দুইই যেখানে ভোল ফিরুচ্চে, সেখানে জানছি ব'লে যে ভাবি এইটাই আশ্চর্য্যের। জ্ঞানের প্রতি ধারাতেই আমি ঐটা জানছি এই দুটা দিক্। একটা দিক্‌ও যদি এর কোন রকমে অন্য ভাব ধরে ত সেই

জ্ঞানের ধারাটা অমনি ব'দলে গেল ব'লতেই হবে। জগতের নকল সাজের আমি এই মুহূর্ত্তে যে সাজে, যে সব ভাব নিয়ে, আমি পরের মুহূর্ত্তে আর সেই সব ভাব নিয়ে, সেই সাজে সেজে নেই। আমার জানবার জিনিষ যেটা সেটাতে ঐ রকম পলে পলে ভাবের রকম ফের। তবে আর জ্ঞান কখন জগতে সত্য হ'য়ে, অচল অটল হ'য়ে, দাঁড়াতে পায় বল' ? প্রাণ কিন্তু যখন প্রাণের স্বর্গে উঠে, চারিদিকে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাণ, আর সকল প্রাণের টানের শেষ সীমায় মহাপ্রাণকে পায়, তখন প্রাণ সত্য জ্ঞান, ধ্রুব জ্ঞান, অচল, অটল জ্ঞান আয়ত্ত করবার অধিকারী হয়। শুদ্ধ প্রাণের সব ভাবই নিত্য, তার থাকবার ভাব, জানবার ভাব, আনন্দ করবার ভাব, সবই অটল অচল, কাজেই শুদ্ধ প্রাণ যখন শুদ্ধ প্রাণের সন্ধান পায়, তখন তার জ্ঞানে টলবার ভাব কিছুই থাকতে পায় না। তা ছাড়া তার জানবার প্রাণের একটাকেও জানতে বাকী থাকে না। যেখানে সব প্রাণ গিয়ে মিশেছে, সেই খানে তাঁর প্রাণের ভাগে দাঁড়িয়ে, কোন্ প্রাণটা সে না দেখতে না জানতে পারবে ? সব প্রাণ নিয়ে মহাপ্রাণের থাকার জানার আনন্দ করবার নিত্যরীতি। এই প্রতি প্রাণে থাকবার জানবার আনন্দ করবার এক এক পৃথক্ মহাভাব। আর মহাপ্রাণে সেই সব মহাভাবের এক সঙ্গে সমাবেশ। সমানের মধ্যে সবাইকে এক একটা আলাদা ভাবে ভাবিয়ে তোলাই লীলার রহস্য, ন'ইলে প্রাণের কোনও খেলাই খেলা হয় না। তাই প্রত্যেক শুদ্ধ প্রাণ আলাদা আলাদা ভাবে প্রতি প্রাণের বিশেষ বুঝতে পারে, সেই সেই বিশেষ বুঝে জানার ভাবটাকে পূর্ণ ক'রতে পারে। এই সব বিশেষ সকল অবস্থাতেই সেই শুদ্ধসত্ত্ব লোকে শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে প্রাণের মহালীলার কাজ ক'রে যায়।

প্রাণের স্বর্গে থেকে, বা জগতের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণের স্বর্গে উঠে, যে প্রাণ মহাপ্রাণকে পায় না, চারিদিকে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাণকে পায় না, পেয়েও চিনতে পারে না, জানতে চায় না, সেই প্রাণ

জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানে পড়ে, মোহে পড়ে, প্রাণের অভাবের ভাবে পড়ে। প্রাণই জ্ঞান, জ্ঞানই প্রাণ, জ্ঞানের অভাবে কাজেই প্রাণেরই অভাব। প্রাণের এই অপ্রাণ হওয়াই মূল মোহ, আর সব ভুল ভ্রান্তি জগতে যা কিছু বলা যায় সব এই গোড়ায় প্রাণে অপ্রাণ ভাবারই ডালা পালা। জগতের প্রাণ ত ঘুরে ফিরে এই মোহেই প'ড়ে আছে, মুক্ত প্রাণও মুক্তির ভাবের দোষে এই মোহে এসে প'ড়ে জগতে ঘুরতে ফিরতে থাকে। জগতের যেখানে যে সব জীব জগতের হ'য়ে আছে কেউ তাদের এই মোহ ছাড়া নয়। মোহ ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে কারুরই জগৎ ছাড়া হবে না, প্রাণের রাজ্যে যাওয়া হবে না। প্রাণকে নস্যাৎ করবার এই মোহ বড় বিষম মোহ। একে ধরা বড় কঠিন। যে প্রাণের ভাবে প্রাণ নয় তাকে বুঝবে কি ক'রে বল। সে সকল সময়ে সকল অবস্থায় সকল রকমে হয়কে নয় ক'রবে, আবার নয়কে হয় ক'রবে। সে সব জিনিষ একটা ভুলের আবরণ ঢাকা দিয়ে রাখবে। শুধু অপরকে এই রকম ঢেকে রেখেই সে তৃপ্তি পাবে না। নিজেকেও সে নিজে ঢেকে রাখবে। ভুলকে ভুল ব'লে বোঝা যাবে না ছলনাকে ছলনা ব'লে ধরা যাবে না। সে নিজেও নিজেকে ঠকায়, নিজেও নিজেকে ভুল বোঝায়। সে জগতের প্রাণকে আসল ভেবে, আসল প্রাণকে জগতের প্রাণ ভেবে, প্রাণে অপ্রাণের খেলায়, অপ্রাণে প্রাণের খেলায়, নিজের মহিমা জাহির করে। প্রাণের আলোর সামনে মস্ত পর্দা টেনে দিয়ে তার আবছায়াটাকে প্রাণের মতন ক'রে প্রাণের সামনে একটা নকল প্রাণ সে গ'ড়ে তোলে। জগতের জীবের নকল প্রাণে মায়ার প্রাণ, মোহের প্রাণ, ভুলের প্রাণ। সে পদে পদে ভুলই বোঝে, ঠিক বোঝে না। জগৎ ভ'রে জীব, তাই জগৎ জুড়ে এই মায়া মোহের ছলনার অধিকার। সৃষ্টিকর্ত্তা থেকে আরম্ভ ক'রে ছোট কীটানুকীট পর্য্যন্ত এই মায়া মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। জগৎটাকে সৃষ্টি ক'রতে ব'সেও, বিধাতা পুরুষকে হ'য়ে হ'য়ে এটা হ'ল না হ'ল না ভেবে কেবলই ভাঙতে গড়তে হয়। এ ভাঙা গড়ার আর বিরাম নেই। নেই কেন না

মোহ তাঁকে প্রতি পদেই ঠকাবে। এইবার ঠিক গড়া হবে, এই ভাবে তাঁকে ভাবিয়ে, শেষে সে গড়া যে ঠিক গড়া হয়নি এটা বেশ বুঝিয়ে দেবে। নীচের স্তরের জীবের ত কথাই নেই। সবাই ভাঙা গড়ার কাজে ব্যস্ত। যখনই বুঝছে ঠিক ক'রতে পারব, তখনই কাজে কর্ম্মে ক'রে দেখছে ঠিক হয় নি। মোহও জীবকে ছাড়ে না, ভাঙা গড়ার আকুলি বিকুলি ভাবও জীবের ঘোচে না।

এই ভাঙা গড়ার মোহে প'ড়েই জীব ম'রে ম'রে উদ্ব্যস্ত, মরণের ভয়ে সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জগতের বিধাতা যখন জগৎটাকে ভাঙছেন গ'ড়ছেন, তখন তিনি নিজের দেহটাই অদল বদল ক'রছেন মাত্র। জগৎটাই তাঁর দেহ, সেই দেহ ধ'রে তার আড়ালে আসল প্রাণ, সৃষ্টির ভাবকে যে প্রাণ চিরকাল অটল অচল ক'রে বজায় রাখতে পারে সেই প্রাণ। নীচের জীবগুলা, দেবতা মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এরাও সবাই, ঐ বড় দেহের মাঝে নিজের নিজের দেহ, নিজের চেয়ে খুব ছোট ছোট জীব 'জড়' ক'রে সাজিয়ে, সেই সেই দেহও ঐ রকম মোহে প'ড়ে মাঝে মাঝেই বদল ক'রছে। দেহের এই অদল বদলই জীবের মৃত্যু। বিধাতার দেহের জগৎ ভাঙা মৃত্যু ছাড়া, দেহের মাঝে সাজান জগতেও ছোট ছোট জীবে এই মৃত্যুর খেলা সকল সময়েই চ'লেছে। কে কখন ম'রছে তার ঠিকানা ক'রে কে? আবার ছোটর সাজান দেহে অতি ছোটর মরণের খেলাও অনবরত চ'লছে। মোহের বশে এই মৃত্যু জীবের দেহকে ঘিরে রেখেছে। জীব যখন না মরে, তখনও সে পদে পদে ছোট মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না। মহাপ্রলয়ের মধ্যে খণ্ড প্রলয় জীব জগতের আগা গোড়া সব জায়গায় সব সময়েই ঘ'টচে। যখনই যার দেহ পছন্দ মত হয় না, ভোগ করবার মতন থাকে না, চারিদিকের দেহের সঙ্গে খাপ খায় না, তখনই তার দেহ, মোহের প্রাণের,ভাঙ্গাগড়া প্রাণের, নিজের ভাব বজায় ক'রতে, ভাঙতে বসে। সেই ভাঙনে ম'রে, আবার নূতন গড়ন নিয়ে, মোহের প্রাণ ঘুরে এসে,আবার কাল ফুরুলে,

বে-পছন্দর হ'লে, ভেঙে গড়ে। এই রকম বুঝি অনন্ত কাল ধ'রেই চ'লতে থাকে। একটা ব্রহ্মাণ্ডও হয়ত যখন অন্য অন্য ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে খাপ খায় না, নিজের প্রাণের বেপছন্দর হয়, তখন ভেঙে যায়, আবার নূতন হ'য়ে কালে আবার ভেঙ্গে পড়ে। কখন যে কার দেহ চারি পাশের দেহর সঙ্গে এই রকম খাপ না খেয়ে, নিজের প্রাণের মতন না হ'য়ে, ভাঙতে ব'সবে, তা কে ব'লবে বল ? মরণের ভয় কাজেই জীবের সকল সময়েই। তবে গড়নের রীতির গতিকে, যে রকম দেহ হ'লে চারিদিকের সঙ্গে খাপ খাবে সেইটা বোঝবার গতিকে, কোন দেহে প্রাণের ভাব স্ফূর্ত্তি পাবে সেইটা ঠিক করবার গতিকে, দেহের মোটামুটি একটা এক ভাবে থাকবার কাল ঠিক হয় বটে। কিন্তু তা হ'লেও জগতের সবই যখন সব সময়ে বদলাবে,তখন সবদিকে সামঞ্জস্য রেখে দেহ ধরবার কাজ কখনই ঠিক থাকতে পারে না। আর মরণের ভেতরে মরণ, দেহের ভেতরে জীবের সাজান দেহের সাজের ভাঙন, তার ভেতর, তার ভেতর, সেই সেই জীবের আবায় দেহের পতন, এত ধ'রে ওঠাই যায় না। মরণের জ্বালায়, মরণের ভয়ে, কতরকমে ভেতরে ভেতরে জীবকে যে এই ভাবে ব্যাকুল হ'তে হয়, তা জীব প্রাণে প্রাণে বোঝে, কিন্তু এ জ্বালা এ ভয় প্রাণ খুলে ব্যক্ত ক'রতে পারে না। মোহের বশে প্রাণের মরণ বুঝেই প্রাণের উল্টা ভাবে প্রাণে জীব এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়।

জড় দেহের সম্পর্কে জীবের যত রোগ শোক তাপ বিপদ্ আপদ্ সবই এই মরণের মোহের আলাদা আলাদা ধারা। জীব যখন রোগে পড়ে, অসুস্থ হয়, তার শরীর ভেঙে পড়বার মত হয়, তখন ভাব দেখি আসল ব্যাপারটা কি ? তার দেহের সমস্ত যন্ত্রটা কোটি কোটি ছোট ছোট জীব, তাদের দেহের ভেতর আবার কোটি কোটি আরও কত ছোট ছোট জীব, আবার তাদের ভেতর, আবার তাদের ভেতর, এই রকম ক'রে অগুণতি স্তরে স্তরে, এমনি ক'রে সাজিয়ে গড়া, যে তার অতি ছোট শেষ স্তরগুলার খোঁজ পেয়ে ওটাও অসাধ্য অসম্ভব, এদিকে এক একটা

স্তরের ছোট ছোট জীবগুলার, জীবাণুগুলার, আন্দাজ পাওয়াও একরূপ অসাধ্য অসম্ভব। মনে রাখতে হবে এরা সবাই, এদের ছোট বড় প্রত্যেক জীব, মোটামুটি এক রকম সমান প্রাণের ভাবে, সমান-টানে প'ড়েছে, এক সঙ্গে মিশেছে, মিশেগুশে সবাই মিলে, আর একটা বড় প্রাণের, যে জীবের দেহে সবাই এসে মিশেছে, সেই জীবের প্রাণের, ভাবটুকু কাজে দাঁড় করাতে আছে। আমার দেহে যে সব ছোট ছোট জীব এসে বাসা পাতিয়েছে, তারা সেখানে এসেছে, কেন না এক দিকে আমার জগতের প্রাণের যাওয়া আসায়, সেই প্রাণে যে সব ভাব হ'য়েছে, সেই সব ভাবগুলা ধারার ধারায় ফুটিয়ে তুলতে হ'লে তাদের আমার সঙ্গে এক যোগ না হ'লে হবে না, আবার অন্য দিকে তাদেরও আগে আগে জগতের যাওয়া আসার যে সব ভাব প্রাণে আছে, সেই সব ভাবগুলার আমার সঙ্গে আমার দেহ হ'য়ে সম্পর্ক পাতাতে পারলেই একটা কাজের গতি হবে, ন'ইলে হবে না। সেই সব ছোট জীবের ভেতরে আবার ছোট ছোট জীবাণুগুলার ঐ রকম ভাবের সম্পর্ক। জড় দেহের, জীবাণু জড় করা জীবের, দেহের গড়নের আসল রহস্যটুকু এই। বাইরে সমস্ত জীবজগৎটা আমার প্রাণের জড়' করা ভাব, আমার দেহের প্রত্যেক জীবের জড়' করা ভাব, যাতে ফুটতে পারে, কাজে কর্ম্মে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে পারে, সেই রকম ভাবে ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের দেহে সাজান আছে। আমার সমস্ত দেহটা সেই মস্ত বড় জীবের দেহের একটা ছোট ভাগে, সেই বড় দেহের প্রাণের কাজের ভাবে, আপনার ভাব মিশিয়ে দিয়ে, কাজ ক'রতে আছে। আমার দেহের জীবাণুগুলার আমার সঙ্গে যে সম্পর্ক, বড় পুরুষের সঙ্গে আমার জীবদেহের সেই সম্পর্ক। এই রকমে এক হিসাবে জীবজগতের কোনও ভাগই অপর ভাগের সঙ্গে বিনা সম্পর্কে নেই বলা যেতে পারে,তবে সম্পর্কের দূর নিকট ভাব ধ'রে জগতে সম্পর্ক থাকা না থাকার কথা বলা হয় এই মাত্র। যাই হোক আমার দেহের কতকগুলা এক ধারায় জড়' করা ভাবের কাজ যখন হ'য়ে যাবে, তখন

জগতের বড় জীবের দেহের ভেতরে আমার দেহ ভেঙে প'ড়ে ছ'ড়িয়ে পড়বে, কেননা প্রাণের ভাবের যেটানে যে ঝোঁকে সেগুলো এক হ'য়েছিল, সেটান, সেঝোঁক, সেই একক'রে ধ'রে রাখবার বল, দেহে আর থাকবে না। আমাব মরণ যে রকমে হয়, আমার দেহ যে নিয়মে ভাঙে, জড় হয়, আমার ভেতরের সব জীবের দেহ সেই রকমের নিয়মেই ভেঙে থাকে। ভেতরের অল্প স্বল্প জীবের দেহে এমনি ভাঙন হ'লেই আমার রোগ, আমি সুস্থ নই, আর সব জীব নিয়ে ভাঙন হ'লেই আমার মৃত্যু। ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের দেহের অল্প স্বল্প স্থান জুড়ে যখন ভাঙন, তখন সেটা আমরা বলি দৈব দুর্বিপাক। তাঁর বড় দেহের ভেতরে ছোট জীবগুলার প্রাণের ভাব, কাজে কর্ম্মে ফোটাবার জন্যেই, সেই সেই ভাবে নিজের প্রাণ মিশিয়ে, বড় জীব নীচের স্তরের ভোগ এই রকমেই সাঙ্গ ক'রে। সেই বড় দেবতার ছোট ভাবের কোন ভোগ শেষ হ'লেই, সেই ভোগের ভাবের টানে জড়' করা জীবগুলা, টান না থাকাতে, অন্য রকমে ছ'ড়িয়ে প'ড়ে, ছোট রকম একটা মরণের খেলা দেখায়। ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষের বড় ভাব যখন কাজে কর্ম্মে সাঙ্গ হ'য়ে যাবে, তখন সেই ভাবের সঙ্গে স্তরে স্তরে জড়ান সব জগতের জীব ভেঙে প'ড়বে, জগতে প্রলয়ের মহামারী উপস্থিত হবে। মানুষের দেহে,জীবের দেহে, তাদের নিজেদের হিসাবে ছোট মরণেই, তাদের দেহের কতকগুলা জীবের মিলিয়ে মিশিয়ে থাকবার ভাব ভেঙে যাওয়াতেই, ছোট খাট দুর্ভোগ দুর্বিপাক ব্যাধি ঘটে। কিন্তু এই দুর্ভোগের, এই রোগের যাতনার, এ অসুস্থ ভাবের মূল কথাটা ত বুঝলে ভাই। এর মধ্যে মরণের নামও নেই। জড়' করা জীবগুলা ছ'ড়িয়ে প'ড়ে ছোট মরণের ভুলটি প্রাণের চোখের সামনে কেবল ধ'রচে মাত্র। যে রকমেই হ'ক মরণ বা মরণের ভয় ছাড়া রোগ নেই, শোক নেই, তাপ নেই, বিপদ্ নেই, আপদ্ নেই। কোথাও আপনার দেহের মরণ, আর মরণের ভয়, কোথাও বা আপনার দেহের যার সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্ক পাতিয়ে তোলা হ'য়েছে, পাতিয়ে তুলে বাহিরের সে দেহটাকেও যেন নিজের দেহেরই একটা ভাগ ব'ল মনে, বোঝা

হ'য়েছে, সেই দেহটার মরণ বা মরণের ভয় এই সব দুর্ভোগ জীবের প্রাণে জুটিয়ে দেয়। জীবের দেহ যেখানে অপর দেহের সঙ্গে কাছাকাছি সম্পর্ক পাতিয়ে নিজের প্রাণের ভাব চরিতার্থ ক'রতে চায়, সেখানে সেই সম্পর্ক এক দিকে মরণের ভয় এলেই ভাঙতে বসে, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রাণের ভাবেও ভাঙন ধরে। কখনও কখনও এই রকম কাছা কাছি সম্পর্ক ভেঙে গেলেই জীবের নিজের প্রাণের ভাব একবারে ভেঙে যায়, সে প্রাণে জীব আর জড় করা জীবদেহ নিয়ে থাকবার কোনও টান অনুভব ক'রতে পারে না, সে দেহ তখন পাঁচ ভূতে মিশে যেতে বসে। ফল, জগতের জীব সদা সর্ব্বদাই ছোট বড় আকারের মরণেই ম'রে আছে, তাতেই তার প্রাণ সদাই আনচান।

প্রাণের সকল সময়ে মরণের আনচানানি আছে ব'লেই, যে সব জীব ভাল ক'রে বুঝতে শুঝতে পারে, তারা কি ক'রে ছোট বড় মরণের হাত থেকে এড়ান পাওয়া যায়, সেই উপায় জানবার জন্যেই ব্যস্ত। প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় জানবার গোড়ার ধারণাতেই কিন্তু মস্ত গলদ। যে মরেনা তাকে বাঁচাবার আবার চেষ্টা যত্ন কিসের? চেষ্টা যত্ন ক'রলেও যে ভাবে জীবের মরণ হয়, প্রাণের যে ভাব যে টান ফুরিয়ে গেলে জীবের দেহে জড়' করা ছোট ছোট জীবগুলা ছড়িয়ে প'ড়বে, সে টান সে ভাব প্রাণের নিজের কাজের তাড়াতেই ত ফুরিয়ে যাবে। জগতে বেঁচে থাকবার মতন হ'য়ে থাকতে গেলে, বাঁচনের কাজ ক'রতে গেলেই সুতরাং প্রাণের বড় ভাবের কাজ শেষ হ'লে ম'রতে হবে, দেহটাকে ভেঙে চুরে ছ'ড়িয়ে ফেলতে হবে, এটা বুঝে নিতেই হবে। প্রাণের আসল মরণ নেই, যে মরণ আছে তা বাঁচনের কামনাতেই ডেকে আনতে হবে। বড় মরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে নয় বাঁচনের কামনাটা, যে বাসনা নিয়ে বাঁচতে এসেছে সেই বাসনাটা, প্রাণ থেকে উপড়ে ফেলে দিতে হবে, না হয় সে বাসনাটা ফুটতে যাতে না পারে তাই ক'রতে হবে। জগতে বাঁচনের বাসনাগুলা দুর্ভোগের বুঝে আসল প্রাণের ভাবে আসল বাঁচনের

ভাব জাগিয়ে তুলতে পারলে, আসলের জ্ঞানে নকলের জ্ঞান আপনিই ঘুচে যাবে, তাই এই আসল জ্ঞান দেবার জন্যে নানান্ রকমে জ্ঞানের যোগের উপদেশ আছে। যারা অতটা এগুতে না পারে, তারা ছোট খাট রকম যোগে, প্রাণকে বাসনার কাজ ক'রতে না দিয়ে, বাসনাকে দেবে রাখতে পারে, বাঁচতেও কাজেই যতদিন ইচ্ছে তত দিন পারে। এই জন্যেই বলে যোগীরা 'ইচ্ছামৃত্যু'। বড় যোগে, আসল প্রাণের যোগে, উঠতে না পারলে, কিন্তু, ছোট যোগে, নিজের প্রাণের সম্পর্কে কতকগুলা দেহ জড় ক'রেও, এক সময়ে তাদের সব বাসনার ভোগ-গুলা ভুগে নিয়ে তবে ম'রতে হয়। বড় যোগে বাসনা আপনা আপনি উড়ে যায় ব'লে, যে ভাবে যে টানে জড়' করা দেহ গ'ড়ে উঠেছিল, সেই ভাবের,সেই টানের, অভাবে অমনিই দেহ ভাঙতে থাকে,সময় মত ভেঙে যায়। এই সার কথা অনেকে না বুঝে মরণ কিসে না হয় এইটা জানতে গিয়ে অনর্থক প্রাণকে এটা ওটা জানতে ব্যাকুল করে। জড় বিজ্ঞান কিন্তু কখনই প্রাণকে মরণের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারবে না। মরণের প্রাণ নিয়েই যার নাড়া চাড়া, মরণের প্রাণের নিয়ম যে বোঝাতে ব্যস্ত, সে নিজেকে নিজে নষ্ট ক'রবে কেমন ক'রে। মরণ হয় কি ক'রে সে তাই বোঝাবে, মরণ হবে না কিসে সে জ্ঞান তার এলেকায় নয়। এক বারে মরণ থেকে নিষ্কৃতি দিতে না পারলেও, কিন্তু যতটা পারা যায়, জড় বিজ্ঞান ততটা নিষ্কৃতি দেবার চেষ্টা ক'রতে পারে, এবং সেই চেষ্টাই তার আসল কাজ। মরণের নিয়ম যে জানবে, সে মরণের ভেতর দিয়ে বাঁচনের. নিয়মও জানবে, কেননা মরণ বাঁচনেরই একটা ধারা। যে রকমে, যে ভাবে, দেহের পতন হ'তে পারে, সে ভাবটা জানতে পারলে, সেটা রোধ করবার চেষ্টাই প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখবার জগতের চেষ্টা। মরণ,মরণের বাঁচন, আবার বাঁচনের মরণ ব'লে, জগতের মরণের প্রাণের বিজ্ঞান, মরাবাঁচার দুটা রাস্তাই দেখাবার উপায় খুঁজবে। দেহ মরবার ভাবে ঝুঁকলেই, তাকে বাঁচবার ভাবে নিয়ে যাবার জন্যে বিজ্ঞান

উপদেশ দেবে। যদি বল ভাই যে কামনার ভাবে বেঁচে ছিল, সেই কামনার ভাবটি যেই যাবে, তখনই ত দেহ ভাঙবেই ভাঙবে, তখন আর মিছে বাঁচাবার প্রয়াস বিজ্ঞানের কেন? মিছে নয় ভাই, এ চেষ্টায় ফল আছে। কাজেই বাঁচন, আর কামনায় কাজ, সুতরাং একটা কামনার কাজ হ'য়ে গেলেই বাঁচার একটা ঝোঁক গেল বটে, কিন্তু জগতে আমার প্রাণে ত একটা কামনা নিয়ে আমি আসিনি। আবার যাতে অন্য কামনা উঠে অন্য কাজে আমার প্রাণ বাঁচে, সেই রকম ক'রে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে যেতে হবে,সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার দেহে যাতে ঐসব আশা আকাঙ্ক্ষার কাজ ক'রতে পারা যায় দেহটাকে সেই রকম ক'রে বজায় রাখতে হবে। দেহটা যখন গড়া হ'য়েছিল, তখন তাই নিয়ে এই রকম আগের আগের জীবনের কতক গুলা আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাবার উপায় হবে এই ভাবেই গড়া হ'য়েছিল, সেই ভাবে দেহ গড়ায় জীবাণুগুলা জড় হ'য়ে ছিল, কিন্তু আমার বাঁচনের রকমের গতিকে আরও কতকগুলা কামনা ঐ দেহ ধ'রে মিটাবার জন্যে উঠতে পারে এবং উঠেও থাকে, আর দেহটাও সেই গুলা মিটাবার মতন নিজেকে ভেতরে ভেতরে জীবাণুগুলার কতক কতক আলাদা রকম সাজান গোজানয় গ'ড়ে তুলতে পারে। বিজ্ঞানের এই খানেই কাজ দেখাবার অবকাশ আছে। অন্য দিকে উল্টা রকমটাও হ'তে পারে। যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জ'ন্মেছিলাম, বাঁচনের দোষে সেগুলা হয়ত অনেকই ছাড়তে হয়, দেহটাও সেই সব মিটবার মতন হ'য়ে জগতে আস্‌লেও কালে ভেতরে ভেতরে নিজেকে একটু কম বেশী অদল বদল ক'রে অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়ায়। জন্মাবার সময়ের বাঁচবার ঝোঁক তাতে থাকে না কাজেই সে প'ড়ে যায়। বিজ্ঞান এপথও দেখিয়ে দিতে পারে। মোটের ওপর বিজ্ঞান সাধারণতঃ জীবকে বেশী বাঁচতে ব্যস্ত রাখে, আর ভাল রকম বাঁচতে, আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার মতন হ'য়ে বাঁচতে ব্যস্ত রাখে। মরণের ভয়ে জড়' সড়' হ'য়েই কিন্তু জীবের এই বাঁচবার জন্যে ব্যস্ত হওয়া।

বিজ্ঞানের জ্ঞানে মোটামুটি নিজের দেহের ভাঙনের সময় জানতে পারলেও প্রতিপদে মরণের ভয় ঘোচে না। এই জন্মে, আগের আগের জন্মে, জগতের সম্পর্কে যে সব ভাব প্রাণে জেগেছে, সেই সব ভাবের মধ্যে কোথায় হঠাৎ কোন মরণের ভাব লুকিয়ে আছে, তা কে ব'লতে পারে ? ধর একজন অপরের প্রতি খুনের ভাব মনে জাগিয়েছে, সে তা হ'লে সেই ভাবে নিজেকেও প্রাণে মেরেছে, কেননা প্রাণে মরার ভাব ধরাই প্রাণে মারার ভাব জাগান। এখন বাঁচতে গিয়ে যখন হঠাৎ এই পরের মারে মরার ভাব নিজের কর্ম্মের ফলে জীবের দেহ ধ'রে ফে'লবে, তখন বাইরের জগতের সম্পর্কে কি রকমে এই মারটা ঘ'টবে, বিজ্ঞান সে সূক্ষ্ম খবরটি দিতে কিছুতেই পারে না। জীবের প্রাণের ভেতর জীবজগতের এই রকম প্রতিশোধের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, জীবজগতের কাজের আড়ালেও এই ভাব কোথাও না কোথাও লুকান আছে এটাও ঠিক কথা, জড়বিজ্ঞান কিন্তু এখনও জড় জগতে প্রাণের ভাবের শক্তি বা কাজ আলোচনা ক'রতে আরম্ভ করেনি, এক হিসাবে সেটা ক'রতেও পারে না, কেননা প্রাণের যোগে প্রাণের জ্ঞানেই প্রাণের ভাব বুঝতে পারা যায়। জগতের জীবের প্রাণের ভেতর কি আছে তা জানতে হ'লেও তোমার ভাই জ্ঞানের যোগকে জীবের প্রাণ যে প্রাণকে ধ'রে আছে সেই জগতের প্রাণে টেনে তুলতে হবে। তবেই জড়বিজ্ঞানের যোগ স্বয়ং জীবজগতের প্রতিহিংসায় মরণের দেশ কাল জানাতে অক্ষম। ঐ জ্ঞানে থেকে দেহ হারাবার ভয় পদে পদে জীবের নিজের প্রাণের ভাবেই ঘটে, কেননা জগতে 'পরহিংসার' ভাব প্রাণে কত রকমেই যেন জ্বল জ্ব'লে হ'য়ে র'য়েছে। মানুষিক অমানুষিক বড় বিপদ্‌গুলা আস্ত প্রাণকে হঠাৎই ভাঙে। সেগুলা যখন ঘ'টতে আরম্ভ হয় তখনই বোঝা যায়, আগে বড় নয়। যাই হোক তবু এরকম বিপদেও সম্ভব মত দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে বিজ্ঞানের জ্ঞানের আশ্রয় নিতে লোক ব্যস্ত হয়। বড়মরণের হাত থেকে নিজে বা নিজের সম্পর্কের লোককে বাঁচাবার উপায় জানতে

সবাই যেমন ব্যস্ত, ছোট মরণের হাত থেকেও, আধিব্যাধি হ'তেও নিজেকে আর নিজের যারা তাদের বাঁচাবার উপায় জানতেও সবাই তেমনি ব্যস্ত।

মোহের বশে প্রাণে ম'রে, প্রাণের মরণ দেখে, মরণের বাঁচবার উপায়, বাঁচাবার উপায়, জানতে থেকে, জীবের প্রাণ যখন ব্যস্ত হ'তে থাকে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাণে মরণের দুঃখ দেখা যায়, আর সেই দুঃখ প্রাণ থেকে স'রিয়ে সুখ পাবার জন্যে জীব কিসে সুখ, কিসে সুখ, ব'লে পাঁতি পাঁতি খুঁজতে থাকে। প্রাণ হারিয়ে, প্রাণের নিত্য সুখ হারিয়ে, মরণের প্রাণের অসুখ মাখান সুখ জীবের তখন আরাধনার জিনিষ হয়। প্রাণের ভেতরে বুঝছি আমি আছি, সেই আছি জেনেই আমি সুখী, তবু পলে পলে প্রমাদ গুণছি, ভাবছি ঐ বুঝি আমার থাকা হ'চ্ছে না, ঐ বুঝি আর থাকব ব'লে জানতে পারছিনে, পারব না, ঐ বুঝি বেঁচে আছি জানার সুখ আমার ঘুচে গেল। যে কাজে আমি আছি থাকছি, যা আমি জানছি, যে সুখের মুখ আমি দেখছি, তাদের সবটাতেই না থাকা, না জানা, না সুখ পাবার ভাব জ'ড়িয়ে ধ'রে রেখেছে। কাজটাও প্রাণের মতন কখনও ক'রে উঠতে পারছিনে, জানাটাও প্রাণের মতন জানা হ'চ্চে না, কাজেই সুখটাও নিছক প্রাণের সুখের মত হ'য়ে দাঁড়াচ্চে না। তবু কিছু বাঁচতে জানতে আর তাতে সুখ পেতে প্রাণ ব্যস্ত হ'চ্চে। প্রাণ থেকে খ'সে প'ড়ে প্রাণে ফিরে ওঠবার জন্যেই প্রাণের এই ব্যস্ত ভাব। ফিরে উঠতে পারছে না কেবল নিজেকে নিজে বুঝতে চাইছে না ব'লেই। যে ভাব নিজের নয় সে ভাবে নিজের আনন্দের ভাব প্রাণ পাবে কেন? তবু যে একটু আনন্দ তলায় তলায় পায় সেটা নিজের ভাব ছাড়তে পারা যায় না ব'লেই পায়। পেলেও কিন্তু প্রাণ সেটা ধ'রে রাখতে পারে না, কেননা জগতের সমস্ত কাজের আর জ্ঞানের ভেতরে নিজেকে স্থিরভাবে পায় না ব'লে। প্রাণই একমাত্র যখন আনন্দের, তখন যেখানে প্রাণের মৃত্যু, সেইখানে আনন্দেরও মৃত্যু। জগৎ জুড়ে এই অসুখের

যাতনায় জীব সদাই কাতর, অসুখের ভয়ে সদাই বিব্রত, অথচ অসুখের মাঝে সুখ পেতে, একাজ ওকাজ ক'রতে, এটা ওটা জানতে ব্যস্ত। গোড়ায় উল্টে এমনি ওলট পালটই প্রাণকে জগতে ঢুকে প্রতি পদে খেতে হয়। যতক্ষণ না সে সোজা টানে প'ড়বে ততক্ষণ প্রাণের এই ওলট পালট ব্যস্ত ভাব।

প্রাণের নিজের স্বাধীন ভাব, সুস্থ ভাব, সুব্যবস্থার ভাব, প্রাণের প্রাণ ব'য়ে থাকবার ভাব, স্বইচ্ছায় জানবার দোষে বিসর্জ্জন দিয়ে, প্রাণ প্রাণ ছাড়া ভুলের জগতে ঢুকে, সকল রকমে থাকবার বোঝবার সুখ পাবার অব্যবস্থায় প'ড়ে, কখনও নিজেকে স্থির ক'রতে পারে না। যে নিজে প্রাণ হ'য়ে প্রাণ হারিয়েছে, যার চারিদিকে প্রাণহারাণ প্রাণ স্তরে স্তরে সাজান, যার সমস্ত সম্পর্ক এই হারাণ প্রাণের সঙ্গে, সে যে ব্যবস্থা স্থির প্রাণে সে ব্যবস্থা পাবে কি ক'রে? প্রাণের স্বভাবে তবু সে ব্যবস্থা পেতে যায়। ব্যবস্থা চায় ব'লেই হারাণ প্রাণে মরণ থেকে বাঁচতে চায়,বাঁচাতে চায়,না জানা থেকে জানাতে চায় জানতে চায়, অসুখ থেকে সুখ পেতে চায় পাওয়াতে চায়। এই রকম ভুলের ওপর চাওয়া গুলাই তার মূল বাসনা, ভুল কামনা। নিজেকে গোড়ায় নিজে নয় ভেবে নেওয়ার ওপর এই বাসনা জীবের জগতে আসবার সময় প্রাণ অধিকার ক'রেছে। অস্থির ভাবের ওপর প'ড়ে এই বাসনা জগতে শত মুখে ছুটেছে। জানবার জিনিষ জানায় এক রকমই জানবার কামনা হ'তে পারে। প্রাণ এক মাত্র জানবার জিনিষ, কাজেই প্রাণ জানবার কামনাও এক ধারায় মাত্র। যে প্রাণ নয় সে যে কি তা ত স্থির করা যায় না, তাকে জানবার কামনার কাজেই শতেক ধারা। কখনও ভাবি এই রকমে জানব, কখনও ভাবি ঐ রকমে জানব। প্রাণে থাকব, বাঁচবার এই কামনা এই রকম এক; কিন্তু প্রাণ ছাড়া ভাবে কি ভাবে থাকব, তা বোঝা যায় না ব'লে বাঁচবার সে কামনা অনেক। প্রাণেই সুখ আছে জানলে মানুষ এক দিকেই ছুটবে, প্রাণ ছেড়ে যদি সুখ খুঁজতে হয় ত কোন্ দিকে ছুটবে, কতদিকে ছুটবে! সে সুখের

কামনা কত আকার ধ'রবে? থাকায়, জানায় সুখে, প্রাণ ছাড়া প্রাণ মূল কামনাকে অনেক মূর্ত্তিতে গ'ড়ে তোলে, কিন্তু কোন কামনাতেই প্রাণ পাবার কামনা দাঁড় করাতে পারে না। কাজে কর্ম্মে প্রাণছাড়া প্রাণ প্রাণছাড়া অগুণতি কামনার ভাব বুকে ধ'রে সকল রকমেই বিষম ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে। জগতের কোনও কামনাতেই এই ব্যস্ত ভাবের হাত থেকে প্রাণকে অব্যাহতি দিতে পারা যায় না। দিশেহারা প্রাণ ক্রমেই কামনা বাড়াতে থাকে। কামনায় জীব যতই ঘেরাও হ'য়ে পড়ে, ততই যে মরণের ভয়ে সে জগতে ঢোকবার সময় ব্যস্ত হয়, সেই মরণই উল্‌টে পাল্‌টে চেপে ধ'রে তাকে আরও ব্যস্ত ক'রে তোলে। এ রকমে থাকতে জানতে সুখ পেতে এলাম, এতে হ'ল না অন্য রকম হ'য়ে এসে থাকা জানা সুখ পাওয়া হবে, তাতেও হয় না, আবার অন্য রকম হবার বাসনা ওঠে, তার পর আর এক রকম, আবার অন্য রকম, এই রকম বাসনার ধারা, আর প্রাণ ছাড়া প্রাণের মরণের পর বাঁচনের ধারা। এর ওপর আবার এক এক বাঁচনের ধারায় একটা বাসনার কোলে কত ছোট আকারের বাসনা নিয়ে, সেই জীবনের মূল বাসনাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে, কত রকম মিছে কাজে, মিছে জ্ঞানে, মিছে আনন্দে, পদে পদে কাজে, জ্ঞানে, আনন্দে, হ'য়ে ম'রতে ম'রতেই জীব প্রাণ বাইয়ে যায়।

জীবের যত দুঃখ, যত শাস্তি, যত পাপ, শেষে সবই এই বাসনার গতিকেই ঘটে। একমাত্র যার নিয়মে, যার শাসনে থাকবার কথা, সেই প্রাণের শাসন না মেনে, প্রাণের কামনা ছেড়ে অস্থির প্রাণ ছাড়া বিষয়ের ভোগে প্রাণের ভোগ হবে বুঝে, নানা রকমে বিষয় ভোগ ক'রতে গিয়ে, বিষয়ের শত ধারার কামনায় জীব প্রাণের কাছে অপরাধী হয়। সেই অপরাধে প্রাণ না পাওয়ার যত শাস্তি, যত দুর্গতি, সবই জীবকে ভোগ ক'রতে হয়। তখন জীবের দুঃখের আর সীমা থাকে না। প্রাণ ছেড়ে যে ধারে যা ধ'রতে যায়, সেই ধারেই তাতে তার বিষম অনর্থ, বিষম অমঙ্গল ঘটে। প্রাণই জীবের এক মাত্র মঙ্গলের

জিনিষ, তাকে ছেড়ে কোন্ মঙ্গল পাওয়া যাবে? মরণের ভাব একবার প্রাণে ঢুকলে কি আর রক্ষা আছে? জগতে সে তখন নানান্ রকমে মরণের ভাব ছ'ড়িয়ে ফেলবে, জগতের সকল কামনায় প্রাণছাড়া ভাব প্রাণে বুঝে নিজেও ব্যস্ত হবে, জগৎকেও ব্যস্ত ক'রবে। সব জিনিষ জগতের জীবের কাছে মরা, রূপে প্রাণের রূপ নেই, রসে প্রাণের রস নেই, গন্ধে প্রাণের গন্ধ নেই, শব্দে প্রাণের শব্দ নেই, স্পর্শে প্রাণের স্পর্শ নেই। এমন ব্যস্ত প্রাণকে কেন সুস্থ না কর ভাই?

(১৯)

মরণের ক্ষমতা

এক কামনার জায়গায়, শুধু নিজেকে ধ'রে থাকবার কামনার জায়গায়, হাজার কামনা জুটিয়ে, কামনার কোলে কামনা, তার ভেতরে আবার ছোট ছোট কামনা নিয়ে, অগুণতি কামনার হ'য়ে, জগতে জীবের প্রাণ খুব বড় হয় ব'লেই হয়ত মনে হ'তে পারে, কিন্তু সেটা বড়ই ভুল। জগতে এসে জীবের প্রাণ ছোট হয়, আকষ্ট বন্ধনে বাঁধা পড়ে, তাই ব'লেই এক বাঁচবার কামনাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে, মরণের কাটারীতে টুকরা টুকরা ক'রে, সেই সেই ছোট ছোট কামনা একে একে ধ'রে, জীব ছোট হ'য়ে বাঁচবার কাজগুলা জগ'তে ক'রতে যায়। জগতের যত কিছু কামনা, বাঁচনের কামনার ভেতরে মোহের বশে মরণের কামনা টেনে নিয়েই, নানান্ রকমে উল্টা ভাবে মিশে, ছোট ছোট আকারে দেখা দেয়। স্বর্গের নদী, প্রাণের দেশের নদী, গঙ্গার সঙ্গে, যমের দেশের মরণের নদা মিশে, সাদার পাশে কাল, কালর

পাশে সাদা জলের রেখা দেখিয়ে, যেমন অনন্ত অসংখ্য সরু সরু ছোট ছোট আলাদা আলাদা রেখা, সেই উল্টা ধাতের দুটা নদীর মেশাল-গোসাল জলের স্রোতে এঁকে দেয়, জীবনের স্রোতে মরণের স্রোত মিশে, এক মিশুলি বাঁচা মরার প্রাণে তেমনি অনন্ত অসংখ্য ছোট আকারের কামনার দাগ পাড়তে থাকে। এক টানা জীবনে এখানে ওখানে সেখানে কত কত বড় বড় মরণের ছেঁড়া ভাঙা কাটার লক্ষণ, আবার সেই এক একটা খণ্ড জীবনে কত কত ছোট্ট ছোট্ট মরণের ভাঙার ছেঁড়ার কাটার চিহ্ন। এক একটা ছোট বড় কামনা, বাঁচবার কামনা, এক একটা ছোট বড় জীবন ধ'রে থাকে। মরণের প্রাণের যত বড় কামনাই হ'ক না কেন, সে কামনা একটানা বাঁচনের কামনার একটা মরণের ঘা খাওয়া ছোট্ট ভাগ মাত্র। সেই কামনাটার ভেতর আরও ছোট কামনা ওঠে পড়ে, একটা বাঁচনের ভেতরে এরকম ওরকম কতরকম বাঁচনেরই ইচ্ছে হয়, তা হ'লেও মোটের ওপর সেই কামনাটা ছোট, সেটার প্রাণও ছোট।

আসল প্রাণের, জগৎ ছাড়া প্রাণের, মোহের ওপরের প্রাণের, পূরাপূরি একটানা জীবনে কোনও ধারেই একটা সীমানা বাঁধা নেই, কোনও দিকেই তার আয়তনকে খর্ব্ব করবার কিছু নেই। সকল ভাবেই সে অনন্ত অসীম, বড়'র বড়, মস্ত বড়। প্রাণের প্রাণের ভাগে থেকেই সে কোথাও ছিন্ন ভিন্ন খণ্ড বিখণ্ড হয় না। প্রাণের ভাগে থাকা তার প্রাণেরই একটা অনন্ত ভাবে থাকা। অনন্তের বুকের ওপর কোটি কোটি অনন্ত থাকতে পারে, তাদের ছেঁড়বার কাটবার ভাঙবার কিছু যদি না থাকে। অনন্ত প্রাণ যখন শুধুই প্রাণ, তখন তাকে ছিঁড়বে কাটবে ভাঙ্‌বে কে? মরণের যেখানে নামও নেই, সেখানে প্রাণ কোনও ভাবে কোনও অবস্থাতেই সীমানার ধার ধারে না। মরণ ছাড়া প্রাণকে ছোট করবার আর কেউ নেই। মরণই তাকে কেটে কুটে শেষে আশ মোড়া পাশ মোড়া ক'রে চারি দিকে বাঁধে,। জগতে ঢোকবার সময় খণ্ডে খণ্ডে প্রাণ এমনি বাঁধা প'ড়েই ঢুকতে

পায়। নিজের দেশে আসল প্রাণ নিজের তিন ধারাতেই পরিপূর্ণ। তার থাকার ভাব থেকে কখনও কিছু খ'সে যায় না, তার জানবার ভাবে কোথাও কিছুর অভাব হয় না, তার সুখের কোনও কিছু ত্রুটি হয় না। দেশ কাল পাত্র এ সবের ধরাবাঁধা ছাড়িয়ে, সেখানে সে সব জায়গায় সব সময়ে সব ঘটে আছে, সব জানে, সকল রকমের সুখ পায়। যে প্রাণ মহাপ্রাণের ভাগীদার হ'তে পেরেছে, সে প্রাণ মহাপ্রাণের সকল ভাবেই মিশতে পারে ব'লে, সব অবস্থায় এক হ'য়েও সব, আবার সব হ'য়েও এক। জ্ঞানময়ের প্রাণে জ্ঞানের ভাবে মিশে, তাঁর প্রাণের ভাগীদার অনায়াসেই সমস্ত জ্ঞানের রহস্য বোঝবার অধিকারী হয়। আনন্দময়ের আনন্দের ভাবে নিজের প্রাণকে ভাবিয়ে সে সমস্ত আনন্দ ভোগ ক'রতে পারে। নিজের প্রাণে তাঁর থাকবার ভাব এনে পূরে দিয়ে সে প্রাণের সকল রকম থাকার ভাবেই ইচ্ছে হ'লেই থাকে।

অপ্রাণের মোহে মরণের বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে কিন্তু প্রাণ এই পূর্ণভাব সক রকমই নষ্ট ক'রতে বসে। কিসের জন্যে যে তার মোহ ঘটে, ঘ'টিয়ে তাকে বাঁধে, এটা বড়ই কঠিন সমস্যা, সহজে এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। অবশ্য নিজের স্বাধীন ইচ্ছেয় প্রাণ মোহে পড়ে এটা ঠিক কথাই। নিজের ইচ্ছে না হ'লে স্বাধীন প্রাণকে মোহে ফেলবে কে? কিন্তু এই ইচ্ছেই বা হয় কেন? সোজাসুজি সকলেই ব'লবে আসল না জানার জন্যেই মোহের দিকে প্রাণ ঝাঁপিয়ে যায়। কিন্তু এ উত্তরে কি সন্তুষ্ট হ'তে পারা যায়? আসল না জানাই ত মোহ, সুতরাং মোহের জন্যেই মোহ হয় ব'ললে, যে মোহের জন্য মোহ হয়, সেই মোহটা আসে কোথা থেকে? প্রাণ প্রথমে শুধু প্রাণই ত ছিল সে অপ্রাণের ভাব পেলে কোথা থেকে? প্রাণের দেশে প্রাণের রাজ্যে মহাপ্রাণের যদি একভাগেই সে থেকে থাকে, তা হ'লে তার থাকবার, জানবার, সুখ পাবার কোনও বিড়ম্বনাই ত ঘটে নি, তবে সে বিড়ম্বনা ভোগ ক'রতে নিজের ইচ্ছেয় উৎসুক হ'ল? এর একটা উত্তর পণ্ডিতদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, সেটা এই যে প্রথম মোহ

যে কেন হ'য়েছিল, সেটা বুঝতে চেষ্টা করাই বিড়ম্বনা। মোহের আদি পাবার জো নেই। যেখানে আদি ধ'রতে যাবে সেইখানেই ঐ গোলযোগ। সুতরাং মোহের আদি নেই এইটাই ধ'রতে হবে। এই উত্তরে অবশ্য মানুষের যুক্তির প্রাণ চুপ ক'রে থাকতে পারে না, অথচ পণ্ডিত মহাশয়েরা বলেন যে এর চেয়ে আর ভাল উত্তর খুঁজে বার ক'রতেও পারা যায় না। জীবনের প্রথমটা এ রকম মোহে প'ড়ল কেন, এটা তাঁরা বলেন জীবনের মস্ত হেঁয়ালী। তার ওপর আরও একটু পণ্ডিতি ক'রে কেউ কেউ ব'লেছেন, কাজ দেখেই কারণ খুঁজতে হয়, গোড়ায় কারণ কেন অমন কাজ দেখাবার মতন হয়,সেটা ভাবতে যাওয়া সুযুক্তি নয়। সুযুক্তি নয় ব'লেও কিন্তু মানুষের যুক্তিকে এ পর্য্যন্ত গোড়ার কারণের নিজের ভাবের হেতু বিচার করা থেকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারে নি; কেন না মানুষের জ্ঞান জানতে পারলাম না ব'লে কখনও জানবার প্রয়াস ছাড়তে চায় না; জ্ঞান প্রাণের জিনিষ; জ্ঞানের চেষ্টা ছাড়া আর বাঁচনের চেষ্টা ছাড়া একই কথা। কেন জীবের মরণে ঢোকবার প্রথম মোহ হ'য়েছিল এটা জানতে চেও না ব'ললে সুতরাং মনে প্রাণে কেউ সে কথা গ্রাহ্য ক'রবে না, মুখে যাই ব'লুক। তাই ধীর ভাবে কথাটা আলোচনা ক'রে শেষে আর এক রকমে আদি মোহের সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টাও হ'য়েছে। সমস্যাটা স্বীকার ক'রে সমস্যার ভাবেই সমস্যাটার এই সমাধান। মোহের আদি না বুঝে পারা যায় না, অথচ আদি মোহ ধ'রতে পারাও যায় না। এই খানেই ত এর হেতু প'ড়ে র'য়েছে। যার আদি আছে অথচ নেই সেইটাই ত একটা মস্ত মোহ। আদি মোহটা,' আগা গোড়া মোহটা, সুতরাং মোহের কাজ। মোহ পরকে ত ঠকাবেই, নিজেকেও নিজে ঠকায়। তবেই ঐ যে মরণ নিয়ে মোহ সেটা মরণই নয়,বাঁচনের একটা ভাব মাত্র। কেউ কোথাও মরে না, প্রাণ হারায় না, কোথাও প্রাণ ছাড়া মরা নেই। সব সত্যির, কিছুই মিছের নয়। সত্যির বোঝবার একটা ভাবকে বলা হয় মিছে, এই মাত্র। প্রাণ যখন

গোড়ায় মরণে ঢুকেছে বলি, তখন স্বইচ্ছায় বাঁধা প'ড়ে নিজেকে ছোট ছোট ক'রে অনেক ধারায় প্রাণের কাজ ক'রতে চ'লেছে মাত্র। সে খণ্ড খণ্ড করবার গতিকে প্রাণকে সে মাঝে মাঝে মারার দাগে, কাটার দাগে, দেগে দেয় মত, কিন্তু এক খণ্ডের সঙ্গে অপর খণ্ডের একটানা বাঁধন, সব খণ্ডের প্রাণ একটানা প্রাণই। তাই এ জীবনে, ও জীবনে, জীব এক প্রাণেই থাকে। এই হ'ল সার করা। তাই ধ'রেই যে ভাবে খণ্ড খণ্ড হয় সেই ভাবকে মরণের ভাব বলা হয়। একে সত্যি প্রাণছাড়া ভাব বলাই মোহ। সে মোহটাও কিন্তু প্রাণকে জানারই একটা ভাব, জগতের ভাবে জানার ভাব। মোহের বাঁধনে ছোট হবার ভাবে প্রাণ বাঁধা থাকে ব'ললে, এই রকম জানার ভাবের বাঁধনে বাঁধা থাকে এইটাই ধ'রে নিতে হবে।

মোহের বাঁধন ছোট জানার বাঁধন ব'লে প্রথম মোহের সমস্যা উড়িয়ে দিলেও কিন্তু আর একটা সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে এসে জোটে। গোড়ায় প্রাণ ছোট হ'তেই বা চায় কেন, ছোট জানার বাঁধনেই বা নিজেকে বাঁধতে চায় কেন ? যদি বল, যার ইচ্ছা স্বাধীন, সে যে রকম খুসী সেই রকমই ক'র্বে, তাতে আবার বাধা কি ? আর বাধা ভাবলে ত ইচ্ছেকে স্বাধীনই বলা হ'বে না। ইচ্ছে যার স্বাধীন নয় সে প্রাণই নয়। একমাত্র শুদ্ধ প্রাণেই স্বাধীন ইচ্ছে থাকতে পাবে। এ কথা ব'ললেও একটু খটকা থেকে যায়। ইচ্ছে ক'রে বড় কি ছোট হ'তে চায় ? যদি বল ছোট হওয়াত বড়র একটা খেলা মাত্র, তা হ'লে ছোট ভাব থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে প্রাণের এতটা আগ্রহ কেন ? বড়র ভার পাবার আগ্রহ নিয়েই প্রাণ ছোট হ'য়েছে, এটা তা হলে ব'লতেই হবে। এটুকু মেনে নিতে পারলে ধ'রতে হয়, যে বড় হ'তে চেয়েও, বড় থাকতে চেয়েও, কি জানি কেন প্রাণ ভ'রে বড় হ'তে না পেরেই, সেই ভাব নিয়েই ছোটর খেলায় প্রাণ মেতেছে। এইবার তা হ'লে বুঝতে হবে, প্রাণ শুদ্ধ হ'য়ে থাকলেও, কোনও রকমে শুদ্ধ হ'য়ে উঠলেও প্রাণ ভ'রে বড় নাও হ'তে পারে। এ কথা থেকে তা

হ'লে আবার এই কথা আসে, যে প্রাণের দেশে মহাপ্রাণের ভাগে থেকেও মহাপ্রাণের সব ভাগই যে আপনাকে আপনি বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রাণকে বোঝে আর মহাপ্রাণের ভাগ ব'লে আপনাদের বোঝে, তা নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন, তাঁরা বলেন, সত্যি সত্যিই জগতের বাঁধন থেকে ছাড়া পাওয়া প্রাণগুলা, আর মহাপ্রাণের ভাগ ব'লে আপনাদের বোঝবার অবসর যাদের হয় নি সেই প্রাণগুলা, ছোট বাঁধনে, মরণের মোহের বাঁধনে পড়ে। মহাপ্রাণ নিজের অসংখ্য ভাগকে নিজের বড় প্রাণের অসংখ্য খেলার সঙ্গীর মতন ক'রে রেখে, অসংখ্য অন্য ভাগকে প্রাণে প্রাণে বড় প্রাণের খেলার ভাব দিয়ে, তাদের স্বাধীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছেন। তারা বড় খেলায় প্রথমে না ঢুকতে পেলেও, ছোট খেলায় ঢুকে বড় খেলার ভাব ক্রমে ক্রমে জাগিয়ে জাগিয়ে, শেষে যাতে বড় খেলুড়েদের দলে, তাদের প্রাণে মিশতে পারে, সেইটাই লক্ষ্য রেখে, ছোট ছোট খেলা খেলে যাবে, যখন বড় খেলার দলে ঢোকবার মতন হবে, তখন ঢুকবে। মরণের মোহের গণ্ডির ভেতরে জীবের এই সব ছোট ছোট খেলা। তার থাকা জানা আনন্দ সবেতেই ছোট ছোট ভাব।

মরণের মোহ প্রাণকে ছোট ক'রতে যখন পারে, তখন নিশ্চয়ই তার ছোট করবার ক্ষমতা আছে, তাতে এমন কতকগুলা গুণ আছে, এমন কতকগুলা শক্তি আছে, যাদের বলে সে প্রাণকে ছোট ক'রে থাকে। ভাব দেখি ভাই, বিচার কর দেখি ভাই, এই গুণ, এই শক্তিগুলা কি? বিচার ক'রতে হ'লে প্রথমেই তোমায় দেখতে হবে মরণে জীবের হয় কি? কোন্ রীতিতে, কোন্ পদ্ধতিতে, মরণ জীবের সম্বন্ধে নিজের পরিচয় দেয়? একথা সবাই জানে যে মরণের জগতে জীব হয়, যায়, আর হওয়া যাওয়ার ভেতর দিকে, হওয়া যাওয়া ধ'রে, নিজেতে নিজে থাকতে চায়, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তা হ'লে ঐ হওয়ার ক্ষমতা, যাওয়ার ক্ষমতা, আর তার মাঝে থাকবার ক্ষমতাই হ'চ্চে মরণের তিনটা শক্তি।

প্রাণের জগতে ঢুকে সব ভাবেই এই হওয়ার যাওয়ার থাকার শক্তি নিজের নিজের পরিচয় দেয়। এই তিনটা শক্তির জোড়েই, এই তিনটা 'গুণের' ফাঁসেই, জগতের প্রাণকে আশমোড়া পাশমোড়া দিয়ে বাঁধা হয়। জগতের এমন কিছু নেই, যাতে এই তিন রকমের মরণের ক্ষমতা সব সময়ে কাজ ক'রছে না। জগৎ জুড়ে প্রাণ, জগতের সবখানেই প্রাণ, মরণের এই তিন রকমের ক্ষমতাও সব প্রাণে নিজেদের প্রভাব দেখাচ্চে। সব জিনিষই হ'চ্ছে, ম'রছে, থাকছে। কোথাও কিছু এক রকম হ'য়ে সেই ভাবে স্থির থাকছে না, অথচ একবারে অস্থির হ'য়ে লোপ পাচ্চেও না। এই হওয়া মরা থাকাতেই জীবনের এক একটা ছেদ, এক একটা ভাগ, আর অন্য ছেদ, অন্য ভাগের সঙ্গে সম্পর্ক। জ'ন্মে ম'রে জীব যে থেকে যায়, তাতেই সে জীবনের একটা খণ্ড দেখিয়ে আর একটা খণ্ড দেখাতে প্রস্তুত হয়। ছোট ছোট মরণের পক্ষেও এই হওয়া মরা থাকার খেলা, তবে ছোট ছোট রকমে। একবারে দেহ বদলান'র মাঝেও যে সকল সময়েই প্রতি জীবে, প্রত্যেক জিনিষে, কেবলই ছোট খাট অদল বদল হ'চ্চে, তাও এই হওয়া, মরা, থাকার গুণেই, তাদের ক্ষমতাতেই। নতুন কখনও নতুন থাকে না, পলে পলে পুরাণ হয়, আবার নতুন হ'তে যায়, এই হওয়া মরা থাকার শক্তির গতিকেই। যারা বলে সব 'ক্ষণ-ভঙ্গুর,' তারা এই প্রতি মুহূর্তের হওয়া মরার থাকার দিক্ চেয়েই বলে, কিন্তু থাকার দিক্‌টেতে বেশ না তাকিয়েই বলে। হ'চ্চে যাচ্চে সব সময়ে সব জিনিষ, এত' ঠিক কথাই, কিন্তু যে হ'চ্চে যাচ্চে, সেই যে আবার হ'চ্চে যাচ্চে এটা না বুঝলে চ'লবে কেন? তা যদি বুঝতে হয়, তবে প্রতি হওয়া যাওয়ায় সে নিজেতে নিজে থেকে যাচ্চে, এটাও স্বীকার ক'রতে হয়। ছোট মরণের এই তিন ধাত বুঝে বড় মরণেও এই তিন ধাত বুঝে নেওয়া যেতে পারে। কোনও হওয়া যাওয়াতেই যখন কোনও জিনিষ নিজের অস্তিত্বটা লোপ ক'রে দেয় না, তখন এক একটা দেহ ধ'রে হ'য়ে গিয়ে জীবটা লোপ পাবে কেন? এ যুক্তি ত অসদ্‌যুক্তি

হ'তে পারে না। সুতরাং মেনে নিতে হবে, জগতে সব জীবকে ধ'রে, জগতের প্রত্যেক বস্তু ধ'রে, হওয়ার মরার থাকার গুণ সকল সময়ে সকল অবস্থায় বোঝা যেতে পারবেই পারবে।

এই হওয়া মরা থাকার গুণের দিকে বেশ ক'রে তাকিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় আসলকে ধ'রে এরা থাকতে পায় না, আসল যে হ'তে চায় তাকে ধ'রেই এরা থাকে। যে জিনিষ ঠিক ভাবটুকু পেয়েছে, যে ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে আর বদলাবে কেন, নিজেকে বদলাতে চাইবে কেন? জগতে প্রত্যেক জিনিষ, প্রত্যেক জীব, যখন ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্চে, তখন বুঝতে হবে আসল হ'তে পায়নি, তাই আসল হ'তে পাবার চেষ্টাতেই বদলাচ্চে। কিন্তু আসল হ'তে যে চায়, তার ভেতরে আসলের ভাব না থাকলে সে বদলাবার চেষ্টাই বা ক'র্ব্বে কেন? সুতরাং ব'লতে হবে, আসল জিনিষ আসল ভাব কোনও রকমে হারিয়ে, ফের সেই আসল ভাবে ফিরে যাবার জন্যেই কেবল ফিরে ঘুরে হ'য়ে ম'রেও নিজেকে ধ'রে থাকছে। প্রাণ ছাড়া প্রাণে জগতে তাই এই হওয়া মরা থাকার বল। এই তিন শক্তির চালনায় প্রতি জিনিষের প্রতি ভাবে কেবল অদল বদল। ফুলটা যখন ফুটল তখন তার এক রকম গন্ধ, তার পর সে গন্ধ বাসি হ'ল, আর তেমন র'ইল না, ফুলের প্রাণ গন্ধে প্রাণভরা গন্ধ ছ'ড়িয়ে দিতে পারলে না, ফুল গন্ধ দেবার জন্যে গন্ধ দিয়েও সার গন্ধ দিতে না পেরে শুকুল, ম'ল, নিজের প্রাণ গুটিয়ে নিয়ে রেখে দিয়ে আবার কোনও রকমে প্রাণ ভ'রে নিজের প্রাণের পরিচয় দেবার আশায় র'ইল। ফুলের গন্ধের যে গতি, প্রতি জিনিষের রূপ রস শব্দ স্পর্শেরও সেই গতি। কোনটাই কোনও খানে প্রাণের মতন হ'য়ে নিজেকে দেখাতেও পাচ্চে না, কিন্তু দেখাবার জন্যে চেষ্টা করতেও ছাড়ছে না। জগতের সব জিনিষের প্রাণই সকল রকমে নিজের ভাবকে ভাল ক'রে দেখাতেই সর্ব্বদা যত্ন ক'রছে। কিন্তু জগতে থেকে নিখুঁত ভাল হ'য়ে কেউ কখনও জন্মাতে পারছে না, কাজেই জন্মের পর মরণ প্রত্যেকেরই

ঘটে। ম'রে ম'রেও সবাই থেকে যায়, আবার জ'ন্মে আবার কোনও রকমে প্রাণের ভাব পূর'পূরি পেতে পারব, এই ধারণাটা সকল জন্মেই প্রাণ ধ'রে থাকে।

হওয়া যাওয়া থাকার গুণে প্রাণ জগতে নিজে থাকবার ভাবে, কাজ করবার ভাবে, সকল দিকেই নিজেকে খাট দেখতে বাধ্য হয়। কোন জীব কখনও সব জুড়ে থাকতে পারে না, সবাইকে নিয়ে কাজ ক'রতে পারে না। জগতের বিধাতার পুরুষের পদ পেলেও, 'ব্রহ্মা' হ'লেও, সবাইকে কোলগত করা জীবের ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে না। কোটি কোটি বাঁধা প্রাণে জগতের প্রাণ বাঁধা বটে, কিন্তু সর্ব্বময়ের দেশের অনন্ত কোটি কোটি শুদ্ধ প্রাণ ত জগতের প্রাণের আয়ত্ত হ'তে পারে না। যারা জগতে এসে প'ড়েছে তাদের নিয়েই বিধাতার কাজ কর্ম্ম। জগতের ওপরে যারা তাদের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। জগৎ জুড়ে ব'সেও তিনি সব জোড়া নন। তা ছাড়া একটা জগৎই জীবের লীলা খেলার জন্যে যথেষ্ট মনে করবার কোনও কারণ নেই। কোটি কোটি জগৎ, কোটি কোটি ব্রহ্মা। কত ব্রহ্মাণ্ড ভাঙছে, কত ব্রহ্মাণ্ড গ'ড়ে উঠছে। জগৎ যখন হওয়া মরা থাকার অধীন, তখন কোটি কোটি জগৎ না ভাবলে, জগতের প্রাণের হওয়া মরা থাকার ভাব কাজে লাগতে পারে না। তবে ভাই বোঝ দেখি ব্রহ্মা হ'লেও জীবের কাজের পরিসর কতটুকু। তাঁর দেহের ভেতরে, তাঁর জগৎটার ভেতরে, তাঁর কাজের ধারা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্য ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কাজ কি? নিজের কাজ ক'রতে যদি অন্য দু দশটা ব্রহ্মাণ্ড-পুরুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তা হলেও সকল সময়ে সকলের সঙ্গে পরিচয় ত সম্ভবে না। সত্যি সত্যিই এ রকম গল্প আছে যে কোনও ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা কোনও সময়ে অনন্ত লোকে নিজের যোগবলে উঠে, কোটি কোটি অন্য ব্রহ্মা দেখে আশ্চর্য্য মানেন। ফল মানুষ যেমন জগতের কাজে আপনার বাইরে অতি অল্প স্বল্প পরিচয় করে, ব্রহ্মাণ্ডের মানুষের সম্বন্ধেও সেইটুকু মনে করা ছাড়া

অন্য কিছু মনে করা যেতে পারে না। সব জুড়ে বা সবাইকের হ'য়ে থাকা সকল জীবের পক্ষেই অসম্ভব।

কাজের ভাবে জীব যেমন নিজের পরিসরকে, নিজের থাকাটাকে, নিজের খাঁটি প্রাণের মত অনন্ত অসীম ক'রতে পারেনা, তেমনি তার নিজের জন্মকেও, নিজের হওয়াকেও, অনন্ত অসীমে ফেলতে পারে না। নিজের সব ভাবের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে ইচ্ছে ক'রলে সে শত দেহ নিয়ে জন্মাতে পারে না, এক দেহ ধ'রেই তাকে এক এক বারে জন্মাতে হয়। প্রাণকে যোগের বলে পঞ্চভূত ছাড়িয়ে তুলতে পারলে তার পর একবারে শতধারা বাসনা ভোগে চরিতার্থ করবার জন্যে, শত দেহের মধ্যে যোগী পুরুষ ঢুকতে পারে, কিন্তু সাধারণ জীব তা পারে না। ইচ্ছে হ'লে যোগী পুরুষ অন্য অন্য জীবের প্রাণে নিজের প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে জগতের কামনার ভোগ ভোগ ক'রতে পারে, আবার ইচ্ছে হ'লে নিজেই প্রাণের টানে দেহ সাজাবার জীবগুলা টেনে নিয়ে কতকগুলা দেহ গ'ড়ে তুলে, সেই সব দেহ দিয়ে বাসনার ভোগগুলা ভুগতে পারে। জগতের যে গুলাকে মানুষ যোগের বলে কোলে টানতে পারে, সেইগুলাই তার আয়ত্ত হয়, সে গুলাকে যেমন ক'রে ইচ্ছে সে তখন নিজের প্রাণের সম্পর্কে সাজাতে সমর্থ হয়। যে যোগে সমস্ত পঞ্চভূতের জগতের প্রাণে প্রাণ মিশিয়েছে,সে তখন সেই প্রাণের এক ভাব,এক ধারা হ'য়ে,অনায়া-সেই পঞ্চ ভূতের জগতের জিনিষ নিয়ে যে খেলা ইচ্ছে সেই খেলা খেলতে পারে। যার যোগবল নেই সেই জীবের অতি ছোট ভাবে এ শক্তি নেই, তার এক একটা বাসনার ধারায় এক একটা জন্ম। অতি ছোট শক্তি তার বাসনার একের বেশী ধারা পূর্ণ করবার জন্যে একের বেশী দেহ ঘ'টিয়ে তুলতে অক্ষম। একে একেই তার জন্ম অনন্তের দিকে যায়। যার যোগবল আছে, সে কম বেশী বল অনুসারে, একবারে কতকগুলা জন্ম জ'ন্মে নিতে পারে মাত্র। তবু কিন্তু অনন্ত বাসনার অনন্ত জন্ম যোগীরও ঘটে না, অনন্ত প্রাণের

যোগ ছাড়া তা অসম্ভব। জগতের যোগী তা পারে না। অযোগীর ত কথাই নেই।

জগতে বাঁচনের ভাবে থাকা হওয়ার মত যাওয়া মরার বা বদলাবার শক্তিও বড় হ'তে পারে না, কখনও অনন্তের ভাবে উঠতে পারে না। জগতের সঙ্গে প্রাণের একটা সম্পর্ককে যত রকমে বদলান আমার প্রাণের ইচ্ছা, কখনই সেই সব রকম বদলানর ভাব প্রাণে নিয়ে আমি ম'রতে পারব না। আমার দেশ কাল দেহ অন্তঃকরণ কোনটাই প্রাণের মতন কোনও জন্মে হয় না, প্রাণের ভোগ তাদের ধ'রে ভুগতে পাইনে, তাই সেগুলা ছেড়ে অন্য রকম সব পেতে চাই। কিন্তু যত রকমেই সেগুলায় আমার তৃপ্তি না হ'ক, কোন জন্মেই দেশ কাল দেহ অন্তঃকরণ ছেড়ে ভোগ ক'রব, এটা ভাবতে পারিনে। প্রাণে বুঝি এমন মরা ম'রতে চাই, এমন দেহ বদলাতে চাই, জগতের সম্পর্ক এমন ক'রে তুলে দিতে চাই, যে সব জগতের, সব দেহের, সব মরণের ভোগ, অথবা জগৎ ছাড়া, দেহ ছাড়া, মন ছাড়া, সব জোড়া ভোগ, যেন পাবার অধিকার পাই। কাজে কর্ম্মে ভাববার সময় তবু ছোট রকম মরণই ভাবি।

শুদ্ধ ভাবে, নিজের ভাবে, বাঁচাই যার স্বভাব, বাঁচা ছাড়া অন্য ভাব যাতে ভাবতেই পারা যায় না, সেই অমর প্রাণ জগতে বাঁচবার ধারা ছড়াতে গিয়ে, হওয়া যাওয়া থাকার শক্তিতে তিন রকমে নিজেকে খর্ব্ব করে। জগতের ওপরে তার হওয়া নেই যাওয়া নেই, হওয়া যাওয়ার মাঝে থাকা নেই। তার যে থাকা আছে সে বাঁচনেরই থাকা। সে থাকা এক খণ্ডকে আর এক খণ্ডের সঙ্গে জুড়ে রাখবার থাকা নয়, যে শুধুই থাকা, এক ভাবে, এক ধারায়, এক অখণ্ড থাকা। এই খাঁটি থাকার শক্তিতে শুদ্ধ প্রাণ অনন্ত অসীম হ'য়ে অনন্ত অসীমের ধারে তাঁরই এক ভাগে প'ড়ে থাকে। এই থাকার শক্তিই শুদ্ধ 'সত্ত্ব,' জগতে হওয়া মরার সঙ্গে থাকার শক্তি অশুদ্ধ 'সত্ত্ব'। একটা খাঁটি প্রাণের 'গুণ,' অপরটা মোহের প্রাণের মরণের 'গুণ'। একটা গুণ

বাড়িয়ে দেয়, ছ'ড়িয়ে দেয়, আর একটা গুণ ছোট করে, বাঁধে। একটা গুণ এই টুকু ঐ টুকুর মধ্যে, অপরটা অনন্তের সঙ্গে। তা হ'লেও ব'লতে হবে অশুদ্ধটা শুদ্ধেরই ভাবের খুব কাছাকাছি। জগতে থাকাটা খণ্ড খণ্ড হ'লেও, সব খণ্ডের মধ্যে এই এক থাকার শক্তিটেই অনন্তের আভাস দেয়। হওয়া মরার ভেতর দিয়ে এই এক থাকাটা প্রাণকে আসল টানে নিয়ে যায়। অশুদ্ধ সত্ত্বের টানও শুদ্ধেরই দিকে, এতে আর দ্বিধা করবার কিছুই নেই।

মোহের প্রাণে বাঁচনে যেমন হওয়া থাকা মরার ক্ষমতা, অন্য অন্য ধারাতেও ঠিক সেই রকমই হবার কথা, হয় ও তাই। জীবের জ্ঞান আর জীবের সুখও হয় যায় থাকে। সকল ভাবেই জ্ঞানে সুখে হওয়া যাওয়া থাকার প্রভাব। জ্ঞান আর সুখ তাই ছোট ছোট ভাগেই জীবের প্রাণে জগতে প্রকাশ পায়। জগতে যে জানাটা জানা হয়, তাতেই বুঝছি, বুঝতে পারছিনে, সেই বোঝা না বোঝার মতন, এক রকমে জেনে যাচ্ছি, এই ভাবটা বেশ স্পষ্ট ধ'রতে পারা যায়। সমস্ত জগৎ, জগতের ভাব, কখনই জানতে পারলাম না, সমস্তের ভেতরে কখনও ঢুকতে পারলাম না, তাও ধারণা হয়। প্রতি জ্ঞানে এক একটা খণ্ড জ্ঞানের বেশী সাধারণতঃ বড় জ্ঞান হয় না। যোগীরাও বড় জোড় কতকগুলা জ্ঞান একবারে আয়ত্ত ক'রতে পারে এই পর্য্যন্ত ; কিন্তু অনন্ত জ্ঞান,ব্রহ্মাণ্ডছাড়া সমস্ত প্রাণের জ্ঞান,তাদেরও জগতের যোগে আয়ত্ত করবার উপায় নেই। একটা জীবনে কতক গুলা জ্ঞানের ধারা, জগতের সম্বন্ধের ধারা, মানুষ জানতে পারলেও, জগতের অনন্ত সম্বন্ধ জানবার জন্যে অনন্ত জীবনেরই অপেক্ষা ক'রতে হবে। জগতের সম্পর্কে এর ওর সম্বন্ধে, একে ওকে আপনার ক'রে প্রাণে তৃপ্তির সুখ পেতে হ'লেও ঠিক এই সব ভাবেরই বিভ্রাট্। একে আপনার ক'রলাম, হারালাম, আবার ওকে ক'রলাম, হারালাম, এমনি ক'রে সুখের জন্ম মৃত্যু। তার মাঝ দিয়েই অপরকে আপনার ক'রে বুকে টেনে নিয়ে প্রাণের টান অনুভব ক'রে সুখী হবার

অধিকারটা কখনও হারাইনে। হওয়া মরার মধ্যে সুখ এমনি ভাবে থেকে যায়। থেকে গেলেও কিন্তু এক একটা ধ'রে খণ্ড খণ্ড হ'য়েই থেকে যায়। সমস্ত জগৎকে আপনার ক'রে সবাইকের সঙ্গে নিজের প্রাণের টান বুঝে, আপনাকে জগতের প্রত্যেকের প্রাণে মিলিয়ে মিশিয়ে নিতে, জগতের প্রাণ কখনও পারে না, কাজেই, জগৎ ভরা সুখ, বড় সুখ পায় না। আলাদা আলাদা জীবনে আলাদা আলাদা সুখের ধারা ভোগ ক'রেই অনন্ত সুখের ভোগের বাসনা জীব চরিতার্থ ক'রতেই বুক বাঁধে। জগতের যোগী একবারে কতকগুলা নকল প্রাণ ক'রে সেইগুলাতে অনেক জগতের অনেক সম্বন্ধ ভোগ ক'রতে পারে বটে, তবু অনন্ত সম্বন্ধ ভোগের সুখ তার ভাগ্যেও ঘটে না।

শুদ্ধ প্রাণে, অনন্ত প্রাণে, অখণ্ড সত্বের প্রাণে, জ্ঞানে বা সুখে এই ছোট ভাব কখনই স্থান পায় না। সেখানে জ্ঞানের বা সুখের হওয়া যাওয়া নেই, শুধুই থাকা। অনন্ত প্রাণ সেখানে সমস্ত অনন্ত প্রাণের কাছে, সবাই সবাইকের আপনার, সবাইকের সঙ্গে সবাইকের টান। সেখানকার জানায় কি জানব তা ভাবতে হয়না, জানতে পারলাম না এ ধারণা ক'রতে হয় না। সেখানকার সুখে কোথায় সুখ পাব তা খুঁজে বেড়াতে হয় না, সুখ পেয়ে সুখ হারাতে হয় না। প্রাণের জ্ঞানে শুদ্ধ থাকা,প্রাণের আনন্দেও শুদ্ধ থাকা। প্রাণের শুদ্ধ সত্ব তা হ'লে কেবলই থাকার বা করার, জানার আর আনন্দেরই শক্তি। এই সত্বে রোগ নাই, মোহ নাই, দুঃখ নাই—এদের কারও লেশ মাত্রও নাই। শুদ্ধ সত্বই শুদ্ধ প্রাণ।

অশুদ্ধ সত্ব মরা বাঁচার খেলাতেও প্রাণকে ধ'রে রেখে যায়। 'থাকায়' সেই হিসাবে প্রাণের টানেই নিজেকে ছেড়ে দেয় ব'লে, খণ্ড প্রাণেও সে জীবকে রোগ মোহ দুঃখের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দেবার চেষ্টাতেই থাকে। জগতে হওয়া যাওয়ার শক্তি প্রতিপদে তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে ব'লে রোগের মধ্যে সুস্থ ভাব, মোহের মধ্যে জানবার ভাব, দুঃখের মধ্যে সুখের ভাব সে দেয়। জগতে এমন

কিছুই নেই যে হ'চ্ছে যাচ্ছে থাকবে এই ভাবে ছাড়া অন্যভাবে আছে। যে ভোগ করে সেও এই তিন ভাবে, যা দিয়ে ভোগ করে তাও এই তিন ভাবে, যা ভোগ করে তাও এই তিন ভাবে। সবেতেই হওয়া, যাওয়া থাকার শক্তি; বাঁচনে, জ্ঞানে, আনন্দে, প্রাণের এই তিন ভাবেই। জগৎ জুড়ে, জগতের প্রতিভাগে, বাঁচার জানার সুখের ভাব মিশে মিশে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা হ'চ্ছে যাচ্ছে থাকছে।

জগৎ ছেড়ে প্রাণে হওয়ার আর যাওয়ার শক্তির কোনও কাজ নেই। জগতেই কেবল সেই দুটা শক্তির খুব প্রভাব। বাঁচনে হওয়ার শক্তির, জন্মানর শক্তির, যে প্রভাব, তাতে জীব জন্মে, কাজে লাগে। একটা জীবনের হওয়া ধ'রলে সেই জীবনে জীব জ'ন্মে জীবনের কাজে লেগেছে বুঝতে হয়। ছোট ছোট মরণগুলা ধ'রলে প্রতি পদেই জীব নতূন নতূন হ'চ্ছে, নতূন নতূন কাজ ক'রছে। নতূন ক'রে কাজে লাগাই জগতে 'হওয়া'। জানবার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে জানতে বা জানাতে চেষ্টা করাই হওয়ার শক্তির পরিচয় দেওয়া। আনন্দের হিসাবে আনন্দ ক'রতে লাগাই, বা আনন্দ করাতে ব্যস্ত হওয়াই, হওয়ার শক্তিকে ফুটান। থাকা, জানা, আনন্দের যে ভাবই ধর, হওয়ার শক্তি, কাজে লাগবার শক্তি, ক'রতে অনুরক্ত হবার ঝোঁক। হওয়ার শক্তির তাই লাগনের বা অনুরাগের গুণ ব'লে সংস্কৃত নাম 'রজোগুণ'। যাওয়ার শক্তি অবশ্য মরণের শক্তি। এক জীবনের শেষে একটা মরণ, পদে পদে ছোট খাট ভাবে কেবল মরণ। জানবার দিকে মরণের ক্রিয়ায় উঁহু এ নয়, উঁহু ও নয়, এই মোহ ভুল ভ্রান্তি। বড়' বড়' জ্ঞানেও মোহ, খণ্ড খণ্ড জ্ঞানেও মোহ। কোনটাই কোনও রকমে ঠিক জানা হয় না, কোনটাই কোন রকমে ঠিক জানতে দেয় না। আনন্দের মরণে বিষাদ, দুঃখ, জন্ম ভ'রে দুঃখ, প্রতি কাজে দুঃখ, সমস্ত জীবনটাই জগতে দুঃখের, সবাই দুঃখ দেয়, সবাই দুঃখ পায়, কেউ সুখের হ'য়ে থাকে না, কেউ কোনটাকে ধ'রে চির সুখ পায় না। জীবনকে মারে, জীবনকে

'থামিয়ে' 'থামিয়ে' দেয় ব'লে, যাওয়ার শক্তি, থামানর গুণ, সংস্কৃত ভাষার কথায় 'তমোগুণ'।

'সত্বগুণ' 'রজোগুণ' আর 'তমোগুণ' জগতের সব জায়গায়, আর জগৎটা যখন জীবময়, তখন ব'লতে পারা যায় এই গুণ 'কটা জগতের সব জীবকে সব সময়ে ধ'রেই আছে। সবাই কাজে লাগতে পারে, লাগাতে পারে, কাজ থেকে থামতে পারে, কাজে ধ'রে থাকতে পারে। সবাই জানতে চেষ্টা ক'রতে পারে, জানাতে চেষ্টা করাতে পারে, জানা হ'ল না বুঝতে পারে, জানান হ'ল না বোঝাতে পারে, জানতে আছি ধারণা ক'রতে পারে, জানাতে আছি ধারণা করাতে পারে। সবাই সুখ পেতে, সুখ দিতে, চেষ্টা ক'রতে পারে, সবাই সুখ কেড়ে নিতে, সুখ হারাতে পারে,সবাই সুখে থাকতে পারে, সুখে রাখতে পারে। যে গুণটা যে ভাবে যেখানে প্রকট হয় সে ভাবে সেই গুণটার সেখানে কাজ দেখা যায়। ভোগ ক'রতে গিয়ে যার প্রাণে সত্ব গুণটা বেশী জেগে উঠেছে, তার ভোগের কাজে বেশ উৎসাহ, ভোগের জিনিষ সে বেশ বোঝে, সেই ভোগে তার বেশ আনন্দ। যে জিনিষটায় সত্ব গুণটা বেশী জেগেছে, সেই জিনিষটা কাজে লাগাতে, সেইটা জানতে, সেইটা নিয়ে আনন্দ পেতে, বেশী মাত্রাতেই পারা যায়। এই রকম যে ভোগ করে তাতে রজোগুণ বাড়লে, তার কাজ কেবলই নতুন হ'চ্চে, জ্ঞান কেবলই নতুন হ'চ্চে, সুখ কেবলই নতুন হ'চ্চে, সবই অস্থির চঞ্চল। যা ভোগ করা যায়, তাতে রজোগুণ বাড়লে, তার সম্পর্কে কাজে জ্ঞানে সুখে প্রাণকে সে অস্থির করে, বিব্রত করে। বেশী তমোগুণের ভাগে, যে ভোগ করে সে যেন অসাড় হ'য়ে ঘুমিয়েই থাকে, মোহে আচ্ছন্ন হয়, দুঃখই পায়, আর যা ভোগ করে সে অসাড় করে, মোহে ঢাকে, দুঃখ দেয়।

তিন গুণে জগতের সব ভাব ব'লে, প্রাণের তিন ধারা, বাঁচার, জানার, সুখের ধারা, জগতের জীবের বুদ্ধি প্রাণের ঐ তিন গুণ ধ'রেই বুঝতে চায়। সেই হিসাবে বাঁচা আর জানাকে হওয়া আর হওয়া

থেকে সরান মনে ক'রে সুখে থাকাকেই থাকা ব'লে ধরা যেতে পারে। বাঁচনটা হওয়ার ভাবে অনেকটা বোঝা যায়। জানাকে সরার ভাবে ফেলতে হ'লে মনে রাখতে হয়, জানতে গেলেই বিষয়টাকে স'রিয়ে এনে, টেনে এনে, প্রাণের দিকে গুটিয়ে নিতে হয়। সুখে থাকা যে স্থির হ'য়ে থাকার ভাব এতে বিশেষ আপত্তি করবার নেই। জগতের গুণের হিসাবে বাঁচা জানা সুখকে এই রকম বুঝতে হয় বোঝ, কিন্তু আসলে বাঁচাই জানা, জানাই সুখ, সুখ জানা বাঁচা সবই এক, একেরই তিন অখণ্ড ভাব। যেখানে নতুন হবার কিছু নেই, সবই এক প্রাণে টেনে ধরা, সেখানে হওয়া যাওয়া নেই, এক স্থির ভাব, শুধু সত্ত্ব,। জগতের সত্ত্বের মত খণ্ডে খণ্ডে তাতে স্থির ভাব ধ'রতে হয় না। সত্ত্বই জ্ঞান, সত্ত্বই সুখ, সত্ত্বই জীবন, সত্ত্বই পূর্ণ প্রাণ।

(২০)

মরণের ধরণ

জগৎটা কি রকম ক'রে হয়, কি থেকে হয়, এই কথাটা আলোচনা ক'রলে, হওয়া যাওয়া থাকা, মরণের এই তিন গুণের, তিন শক্তির, জগতের ওপর কতটা প্রভাব, জগতের সমস্ত অন্ধি সন্ধিতে, জগতের সব দিক্ ঘেরাও ক'রে, তারা কেমন ক'রে কাজ করে, তা বেশ বোঝা যায়। কোনও একটা জিনিষ, কোনও একটা ভাব, কোথা থেকে হয়, এইটা জানতে যখন আমরা চাই, তখন তার 'কারণ' কি এই ব'লে সেই 'কারণ' খুঁজি। যেটা হয় সেটা কার্য্য বা ফল, যা থেকে হয় সেটা 'কারণ' বা হেতু। হেতু থেকে ফল সবাই মানে, কিন্তু কি রকম হেতু

থেকে কি রকম ফল হয়, হেতুরই বা ধরণ কি, ফলেরই বা ধরণ কি, সেই কথাটা নানা রকমে বোঝা হয়, বোঝান হয়। বোঝবার আর বোঝাবার রকমের ফের ফার হয় ব'লে বলা হয় এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ধীর ভাবে ভাবলে বোঝা যায়, আসলে মতে বড় ভেদ নেই, মতটা ব্যক্ত করবার ধরণেই ভেদ। জগতের সব ঘটনায় তিন গুণের কাজ আছে বলেই হেতু আর ফলের বিচারে তিনটা ভাব আপনা আপনিই এসে পড়ে।

হেতু আর ফলের বিচার ক'রতে ব'সে কেউ বলেন যখন কিছু হয় তখন যা নেই তাই হয়। যা আছে তা আবার হবে কি? মাটী যখন ঘট হয়, তখন বেশ দেখা যায়, ঘট ছিল না, ঘট হ'ল। কোথাও কোনও শব্দ হ'লে ব'লি শব্দটা ছিল না শব্দটা হ'ল'। ফুলটা ফুটলে ফুলের যে গন্ধ ছিলনা সেই গন্ধ ছ'ড়িয়ে প'ড়ল। আম পাকলে আমের যে রস ছিলনা, যে সোয়াদ ছিলনা, সেই সোয়াদ আম খেলে টের পাওয়া গেল। ঋতু বদল হ'ল, গরম গিয়ে ঠাণ্ডা প'ড়ল, শীতের বাতাস ব'ইতে লাগল, যে ঠাণ্ডা স্পর্শটা ছিল না, বাতাসে সেই ঠাণ্ডা স্পর্শটা মালুম হ'তে থাকল। গাছের কচি কচি পাতাগুলার কচি ভাব গিয়ে তরুণ ভাব এল, অমনি তাদের আর সেই একটু লাল্‌চে লাল্‌চে রঙটা আর থাকল না, বেশ তারা সবুজ রূপ দেখাতে আরম্ভ ক'রলে। এই রকম যে দিকেই দেখা যায়, সেই দিকে, সেই খানেই পুরাণ ভাবের অভাব, নতুন ভাবের আমদানি। সুতরাং অভাব থেকেই ভাব এই কথা বল্‌লেই ঠিক বলা হয় কি না বল দেখি? সব ভাবেই ত দেখলে ফলটা হেতুতে থাকে না, হেতু ধ'রে আসে এই মাত্র। যা ধ'রে আসে সেইটা তার হেতু বটে, কিন্তু হেতু আর ফল আলাদা রকমের, হেতুতে ফলের ভাবের অভাব সুস্পষ্ট।

আর এক শ্রেণির পণ্ডিত আছেন তাঁরা বলেন, যা হয় সেটা অস্থায়ী, যা থেকে হয় সেটাই স্থায়ী। যেটা অস্থায়ী, যেটা এই আছে এই নেই, সেটা আসল ভাব নয়, আসল ভাবের অভাব। শব্দ হ'ল, আবার

কোথায় মিশে গেল, তার ঠিকানা নেই। ফুলের গন্ধ চার দিকে খুব ছড়িয়ে প'ড়ল দেখা গেল, কিন্তু সে গন্ধ কতটুকু সময়ের জন্যে বল দেখি? আজকের গন্ধ আর কাল নেই। পাকা আমে যে সোয়াদটা পেলে সে সোয়াদটা আম একটু বেশী ম'জলেই গেল। আজ কন ক'নে বাতাস, কিছু দিক যেতে না যেতেই গরমে তিষ্ঠুতে পারা যাবে না। পাতার সবুজ রঙ পাতায় পাক ধ'রলেই যাবে। মাটীর ঘট এখনি ভেঙে যেতে পারে, ইচ্ছে ক'রলেই তাকে ভাঙা যায়। মাটী কিন্তু মাটীই থাকবে। ঘট ভাঙলে যে মাটী সেই মাটীই। তবেই বেশ বোঝা যায় যেটা হয় সেটা যাবার ধারায়, যা থেকে হয় সেইটাই থাকবার ধারায়। ভাব থেকে অভাব, অভাব থেকে ভাব নয়।

আর এক রকমেও কিন্তু এই হেতু আর ফলের সম্বন্ধটা বোঝা যেতে পারে, বোঝান যেতে পারে। যা নেই তা হয় না, যা থাকে তা যায় না, যা আছে তাই হয়। কেবল ভাবের তফাৎ মাত্র। মাটী থেকে ঘট হয়, কিন্তু ঘট মাটীই, মাটীরই একটা আকার, ভাঙুক চূরুক, মাটী ঘটে যাবার নয়। সোণায় কখনও মাটীর ঘট হয় না, মাটীতে সোণার ঘটও হয় না। আকাশের শব্দ আকাশেই, বাতাসের স্পর্শ বাতাসেই, তেজের রূপ তেজেই, জলের রস জলেই, আর পৃথিবীর গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে, কখনও কিছু একবারে লোপ পায় না, যার যা তার তা ছাড়াও হয় না। যে সব ভাবের প্রাণের অসংখ্য স্পন্দনের কণা জ'ড় ক'রে আকাশ, তাদের কতকগুলা কণিকার এক রকম মেলা মেশায় এক রকম শব্দ, অন্য রকম মেলা মেশায় অন্য রকম শব্দ। শব্দ হ'ক যাক আকাশেরই জিনিষ। শব্দের মূল 'আকাশ'। যে শব্দের যে সব আকাশ কণা, তা আকাশ ছাড়া কখনই হবে না। এই রকম জগৎজুড়ে আলাদা আলাদা ভাবের প্রাণের নাড়াচাড়ার কণা নানান্ স্তরে এক বায়ুর আয়তন, নানান্ স্তরে একটা তেজের আয়তন, নানান্ স্তরে একটা পৃথিবীর আয়তন, নানান্ স্তরে একটা জলের আয়তন জগতের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে। যেখানে সোয়াদের জিনিষ, যেখানে রস, সেইখানেই 'জল,' জগতে নানা

ভাবে জল। যেখানে রূপ, যেখানে দেখবার কিছু, সেইখানেই তেজ, জগতে অনেক রকমের তেজ বা জ্যোতি। গন্ধে গন্ধে পৃথিবীর কণা, স্পর্শে স্পর্শে বাতাসের কণা, শব্দে শব্দে আকাশের কণা। রকম রকম 'জড়' হওয়ার গতিকে রকম রকম 'গুণ'। যে রকম জড়' হ'লে যে জিনিষের ভাগে যা হয়, সেই জিনিষের সেই রকম জড়' করা ভাগে তাই হবে। যা হয় তা যা থেকে হয় তারই গায়ে লুকিয়ে থাকে মাত্র, হবার সময় বেড়িয়ে পড়ে, যাবার সময় তাতেই যায়।

হেতু আর ফলের সম্বন্ধ বেশ দেখা গেল তিন রকমেই পরিষ্কার ভাবে বুঝতে বোঝাতে পারা যায়। কোনটাই যখন অসংগত ব'লে মনে হয় না তখন এদের ভেতর বিরোধ থাকবে কেন? বিরোধ আছে মনে করাই ভুল। আসল ব্যাপারটা এই যে হেতু আর ফল দুই হওয়া যাওয়া থাকার ভাবে বাঁধা ব'লে এদের সম্বন্ধটা ঐ রকমে তিন ভাবেই ব্যক্ত ক'রতে পারা যায়। কারণ আর কাজ, হেতু আর ফল, এদের দুয়ে আসলে কোনও ভেদ নেই বটে, কিন্তু রকমে এদের ভেদ দাঁড়ায়। ভেদ দাঁড়ায় ব'লেই হেতু হেতুই, ফল ফলই, ফলকে হেতু ব'লে কেউ ধরে না, হেতুকেও ফল ব'লে কেউ ধরে না। মাটী ঘট হ'ল সুতরাং মাটী আর ঘট ভেতরে একই, যা ছিল তাই র'ইল, যা হ'ল তা ছিলই। কিন্তু ঘট হবার আগে ঘটের মাটী যে আকারে ছিল, ঘট হ'তে গিয়ে সে আকারটা মাটীর ঘুচে গেল, অন্য আকার হ'ল। এক আকারের মাটী মাটীই অন্য আকারের মাটী ঘট। ঘটের আকারে না হওয়া থেকে ঘটের আকারে হওয়ার ভাবে মাটী কারণ আর কাজের ভেদটা দেখালে। ঐ ভেদটা দেখিয়েও, নিজের ভাব, ভেতরে মাটী ছাড়া অন্য কিছু না হওয়ার ভাব, মাটী বজায় রেখে গেল। এই রকমে বোঝা যায় অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তিতে, না হওয়া থেকে হওয়াতে, থাকা থেকেই থাকা আছে। আবার যখন ঘটটা ভেঙে গিয়ে মাটী হয় এই ভাবটার দিকে তাকিয়ে দেখি, তখন বুঝি মাটীই ঘটের স্থির দশা, ঘটের দশা অস্থির দশা। তাই বুঝে বলি মাটী থেকে, কারণ থেকে,

যখন কাজটা, যখন ঘটটা হ'য়েছিল, তখন যা রয় তা থেকে যা রয় না, কাজেই যা নয়, তারই সৃষ্টি হ'য়েছিল। কিন্তু যেটা রয়না সেটাতেও যেটা রয় সেই মাটীটেই ছিল। কাজেই থাকার জিনিষ থেকে যাওয়ার জিনিষ হ'লেও, সেই যাওয়ার জিনিষে থাকার জিনিষ থাকে ব'লে, যাবার জিনিষ থেকেই থাকার জিনিষ হয়, এ সত্যটা ঠিকই থাকে। থাকার জিনিষ হবার সময় থাকাটা যেন না থাকার মতন হয় ব'লে, কারণ কাজ হ'য়ে জন্মালে বুঝি কারণ আর কারণ রইল না, কারণের ভাব ধ্বংস পেলে, তবে কাজ হ'ল। কারণে 'হবার' ভাবটি ঢুকে কারণের স্বভাবটি নষ্ট করে। স্বভাব নষ্ট হ'লেও কাজের প্রাণে প্রাণে কারণ। কাজের প্রাণে থেকে, কাজের ভাব ছেড়ে নিজেতে ফিরে যাবার সময়, ত'লিয়ে বুঝি, কাজটা যাবারই জিনিষ, মরবার জন্যেই হ'য়েছিল, হওয়াটা মরণেরই হওয়া। কাজের হওয়া যাওয়া, জন্ম মৃত্যু, ধ'রে, আর সেই জন্ম মৃত্যুতে কারণটুকু বজায় থাকাতে, কার্য্যে আর কারণের সম্বন্ধে জ্ঞানটা তিন রকমে ঘটে।

অনেক সময়ে হওয়া যাওয়া থেকে থাকার ভাবটা বুঝতে ঠিক পারা যায়না। কতকগুলা সূত জড়' ক'রে কাপড়খানা হ'ল। সূতয় সূতয় কাপড়খানা ছিল একথা কি ক'রে বলা যায় বল? আবার দেখ তিল থেকে তেল হ'য়ে, সেই তেলের তেলের আকার যখন কোন রকমে ঘুচে যায়, তেল ধর পুড়ে যায়, তখন তেল পুড়ে কি তিল হ'ল ব'লতে পারি? যে রকমের মাটী থেকে ঘট হ'ল, ঘট ভেঙে ঠিক সেই রকমের মাটীই যে হয় তা বলাও কঠিন। যে রূপ, যে রস, যে গন্ধ, যে স্পর্শ এটা ওটা জিনিষ ধ'রে হয়, ঘুচে গিয়ে তাদের আগেকার ভাবই যে হয়, এই বা কি ক'রে বোঝা যেতে পারে? ফল হবার ধারায়, আর যাবার ধারায়, থাকার ভাব থাকলেও, যে রকমের থাকা ধ'রে কিছু হয়, ম'রে সেই রকমের থাকাটাই যে সেটা জাগায়, এ কথা ব'লতে গেলে অনেক সময়েই হাসির কথা হয়। সব জিনিষের উৎপত্তিতেই এমনি এক রকম থাকার ভাবই মনে হয়। এক রঙ্

অন্য রঙে বদলাবে, এক রস অন্য রসে, এক গন্ধ অন্য গন্ধে, সকল বিষয়েই এই এক ধারা। কাঁচা আম পাকলে অন্য রঙের, কাঁচার রসে পাকার রসে অনেক তফাৎ, অফুটন্ত গন্ধ ফুটন্ত গন্ধ নয়। তবেই যা থাকে তাই হয়, আবার তাতেই সেটা যায়, একথা কি ক'রে ঠিক কথা হ'তে পারে? সন্দেহটা এই রকম মনে ওঠে বটে, কিন্তু বুঝে দেখলে সন্দেহটা থাকে না। জড় জগতে হবার যাবার রহস্যটা ভাই ভাব দেখি। সবই জড়' হ'য়ে হয়, জড় হ'য়েই যায়। মাটীর সঙ্গে কত কি জড়' হ'য়ে ঘট হ'য়েছে। পৃথিবীর মাটীতে জল আগুন বাতাস লাগিয়ে, আকাশের যে ভাগটা যেমন ক'রে জুড়ে ব'সলে ঘট হ'তে পারে তেমনি ক'রে ব'সলে, পাঁচ রকমের জিনিষ জড়' ক'রে তবে ঘটটী তৈরী হ'য়েছে। শুধু কতকগুলা সূত' জড় ক'রেই কাপড় হয়নি, রাশি করা সূত' কাপড় নয়। যেমন যেমন দরকার তেমনি তেমনি আকাশের ভাগ জুড়ে তূল' সূত' হ'য়েছে, আবার সূত' কাপড় হ'য়েছে। হবার সময় তূল'য় বা সূত'য় রূপের রসের কত বদলও হ'য়েছে। কাঁচা তূল শুকিয়ে এ রঙ্ ও রঙ্ দিয়ে তূল থেকে কাপড়ের সূত। এই রকম সূত' থেকে কাপড় বুনতে রঙের জলের ব্যবহার কত রকমে হ'য়েছে। ফল জড় কারণ থেকে জড় কাজ যা হয়, তাতেই জড়' করা ভাব না থেকে পারে না। পাঁচ রকম জ'ড়িয়ে একটা হয়, একটা ভেঙে পাঁচ রকম হয়। সব জিনিষই পাঁচ ভূত থেকে আসে, পাঁচ ভূতে মেশে। যেমন আকারের ভূত থেকে আসে, তেমন আকারের ভূতেই যে মেশে, তা নয়। কাপড় ছিঁড়ে সূত' হয়, কিন্তু যেমন সূত' বুনে কাপড় হ'য়েছিল, তেমনি সূত' ছেঁড়া কাপড় থেকে পাওয়া যায় না। তিলের পাঁচ ভূতে অন্য রকমে পাঁচ ভূত মিশে তেল হ'য়েছিল, তেল শুকিয়ে পুড়ে পাঁচভূতে যাবে ব'লে ঠিক তিলের আকারে গিয়ে মিশবে না। যখন একটা গন্ধ থেকে আর একটা গন্ধ হয়, একটা রস ছেকে আর একটা রস হয়, তখনও এই জড়' করার ভাব ঠিক থাকে। কাঁচা আমে যে রকম রসের কণা, জলের কণা, জড়

হ'য়ে কষা রঙ্ হ'য়েছিল, পাকা আমে সে রকম জলের কণা রসের কণা আর নেই। আগেকার জলে, আগেকার রসে, আমের দশা বদলান'র সঙ্গে সঙ্গে, অন্য রকম জিনিষের রস এসে, রসের তফাৎ ক'রে দিয়েছে। জগতে জল আগুন বাতাস মাটী আকাশ কিছুই একলা একলা থাকে না, জলে পাঁচ রকম, আগুনেও পাঁচ রকম, বাতাসেও পাঁচ রকম, মাটীতেও পাঁচ রকম, আকাশেও পাঁচ রকম ভূত। কাঁচা আম পাকলে আমের ভেতরে জড়' করা পাঁচ ভূত নতূন দল বেঁধে জড়' হ'য়েছে বুঝতে হবে। এর ভেতরে মাটীর ভাগে কত নতূন মাটীর কণা, জলের ভাগে কত নতূন জলের কণা, এই রকম সব ভূতের ভাগেই কত নতূন নতূন ভূতের কণা এসে জুটেছে, কতক পুরাণ চ'লে গেছে। প্রত্যেক ভূতের প্রত্যেক কণায় আবার পাঁচ রকম ভূত মিশেছে। এইবার ভাই বোঝ দেখি এতে আর আমের রস বদলাবে না কেন? দেখবার রূপ, সোঁকবার গন্ধ, ছোঁবার স্পর্শ, বাজাবার শব্দ, এসবও এই কারণেই বদলায়, এক হিসাবে প্রতি পলেই বদলায়। সবই এক রকম জড়' ভাব থেকে আর এক রকম জড়' ভাবেই বদলায়। হওয়া যাওয়ার ভাবে নানান্ রকমের জড়' করা ভাব জোটে ব'লেই একটা জিনিষ থেকে একটা জিনিষ হ'ল, আর সে জিনিষটা লোপ পাবার সময় তাতেই মিশল, একথা পূরা পূরি ভাবে বলা চলে না। যতগুলা কারণ জড় হ'য়ে জিনিষ হয়, ততগুলা কারণে জিনিষ যাবার সময় মেশে, এই আসল কথা। কিন্তু জিনিষের প্রতি ভাগ, ভাগের ভাগ, সকল সময়েই হ'চ্ছে যাচ্ছে ব'লে, মোটের ওপর জিনিষটা যাবার সময় আগেকার কারণগুলায় ঠিক মিশে যাবার অবকাশ পায় না। জগতে, মরবার আগে, দেহ বদলাবার আগে, ভাগে ভাগে কত বার ম'রতে হয়, তার ঠিকানা করা যায় না। হেতু থেকে ফল হয়, ফল হেতুতে যায়, এটা মোটা কথা। হেতুও একটা অন্য নয়, ফলও একটা অন্য নয়, সবই জড়, সবই পাঁচ ভুত মিশিয়ে। কতকগুলা জড় করা ভুতে নতূন নতূন মেশানি গোশানি হ'য়ে নতূন নতূন জড় বস্তু হয়, এ ছাড়া

আর হেতু ফলের অন্য ভাব নেই। যে জড় ভাবটা আগে ছিল তাকে হেতু ব'লে, আর যেটা পরে হ'ল সেটাকে ফল ব'লে, অনেক ধাঁদায় পড়'তে হয়। হেতু আর ফল এতে তফাৎ হ'য়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তবিক ধ'রতে গেলে দেখবে ফলে অন্য রকম হেতু জড় হ'য়েছে। আসল হেতুকে আসল ফল কখনও কোনও রকমেই লঙ্ঘন ক'রতে পারে না।

জগতে যা যা কিছু হয়, চার রকমে তাদের ভাবা যায়। ঐ ধর ঐ মাঠে আমার ভূতি ব'লে সাদা গাইটে চ'রতে যাচ্ছে। এখন ঐ জিনিষটের দিকে তাকিয়ে বল দেখি ওটাকে কত রকমে আমি ভাবছি? প্রথম দফায় ধর ওটাকে বুঝছি যে গোরু ব'লে যে পশুর জাত আছে ওটা সেই জাতের পশু। দ্বিতীয় দফায় ওর সাদা রঙটা আমার ভাববার মধ্যে। এটা ওই গোরুর গোরু হ'য়ে থাকার ভাবকে জাপটে ধ'রে আছে। সাদা ভাবটা ঐ গোরুর ধর্ম্ম। এক রকম ক'রে গোরুটার পরিচয় দেয় ব'লে 'সাদা ঐ গোরুর গুণও বলা যায়। গোরুটা চ'লছে, সুতরাং ওর চলা ব্যাপারটা তৃতীয় দফায় ঐ গোরুকে বুঝতে ব'সে আমি বুঝছি। তার পর ওটাকে ভূতি ব'লে যে ডাকা হয়, সেটা আমার মনে জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে। চতুর্থ দফায় গোরুর এই নামটা ঐ গোরুর বিষয়ে আমার জ্ঞানের সঙ্গেই জাগছে। জাত, গুণ, কাজ, নাম, সব জিনিষের এই চার ভাব থাকে। নামটা বিশেষ ভাবে অন্য জিনিষ থেকে আলাদা করার ভাবে একটা জিনিষের পরিচয় দেয়, সুতরাং নামটা বস্তুর জন্যই। 'বস্তুর' নাম যেখানে বিশেষ ভাবে একটা বলা হয় না, সেখানেও এক রকমে না এক রকমে বিশেষ ভাবে তাকে বোঝান হয়। আমাদের সেই সাদা গোরুটা ব'লেও বিশেষ ভাবে ঐ ভূতি গোরুকে দেখাতে হয়। জাত, গুণ, কাজ, আর বস্তু এই চার ভাবে তা হ'লে জিনিষ। জিনিষে এই চার ভাব থাকায় সংক্ষেপে পরিচয় দেবার সময় কখনও কখনও একটা ভাব ধ'রে পরিচয় দেওয়া হয়। প্রধান ভাবে জিনিষের সেই ভাবটা সে সময়ে ভাবার দরকার ব'লেই তেমনটা করা হয়। যখন বলি রাস্তায়

একটা গোরু দেখে এলাম, তখন সেই গোরুর যে জাতটা দেখেছি তা নয়, গোরুজাতের বিশেষ বিশেষ গুণের, বিশেষ বিশেষ কাজের, বিশেষ একটা বস্তু দেখেছি। সেটা হয়ত একটা কৈলে গোরু, দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে, আর আমারই এক প্রতিবেশীর একটা বিশেষ গোরু, এসব মনে না এনে আমি জাতটাই তখন বিশেষ ভাবে বলবার ব'লে মাত্র বলি গোরু দেখে এলাম। এই রকম যখন বলি, বেশ মিষ্ট শব্দ শুনেছি, সুগন্ধ পেয়েছি, তখন সেই গুণের ভাবটা বেশী ক'রে ভাবার দরকার ব'লে তাই বলি, নইলে আমার জানার জিনিষ সেই সেই গুণের, বিশেষ বিশেষ জাতের, বিশেষ বিশেষ কাজের, বিশেষ বিশেষ জিনিষ। হয়ত গন্ধটা বা শব্দটা কোথা থেকে আসছে তা না ধ'রতে পারি, তা হ'লেও বুঝি গন্ধটা বা শব্দটা জিনিষ নয়, জিনিষ হ'ল যাতে গন্ধ বা শব্দ আছে। শুধু কাজের পরিচয়েও এই রকম বুঝতে হবে। এই সত্য টুকু ভুলে গিয়ে অনেক সময়ে আমরা কারণ বুঝতে গিয়ে বড় গোলে পড়ি। প্রায়ই শোনা যায় অমুক ঘটনার কারণ কি? ওখানে অমুক শব্দ হ'ল কেন? অমুক জাতটা কি ক'রে এল? যে সব বস্তুকে ধ'রে সেই ঘটনা, সেই শব্দ, সেই সেই জাতি হ'য়েছে, সেই সব বস্তুরই বিষয় ধ'রে এসব জায়গায় কারণ খুঁজতে হয়। ইউরোপের বিষম যুদ্ধ হ'ল কেন, না জর্ম্মণজাতির সেটা দম্ভের ফল। এখানে দম্ভের ধর্ম্ম ধ'রে দম্ভের কাজ ক'রে, জর্ম্মণজাতির মানুষগুলা যুদ্ধের পূর্ব্বের সেই সেই ভাবে জড়' হ'য়ে, জড়' ক'রে, যুদ্ধ ঘ'টিয়েছিল, এইরূপ কার্য্যকারণ ভাব বুঝতে হয়। ফল জড় করা বস্তুর ভাবে হেতু আর ফল এ নিয়মের বাধা কোথাও নেই।

কাজের ভাব দেখেই জিনিষকে প্রধান ভাবে বুঝতে হয় ব'লে, কাজই বস্তুর থাকবার পরিচয়, একরকম প্রাণের পরিচয় দেয় ব'লে, কাজ ধ'রেই লোকে প্রায় হেতু আর ফল বিচার করে। ফলকে তাই 'কাজই' বলে। যা করা হয় তাই 'কাজ'। আর যা 'করায়,' কাজ যা

থেকে হয়, ঐ হেতুও সেই হিসাবেই কারণ। জড়' করা বস্তু কিন্তু শুধু থাকার জিনিষ ধ'রেই থাকে না, জানবার ভাবের জিনিষ, আনন্দ পাবার ভাবের জিনিষ ধ'রেও থাকে। জানতে চেষ্টা করা, জানতে না পারা, জানার ভাবে এই হয় নয়ের মধ্যে দিয়ে যত রকমের জানা, সেইগুলা এই হয় নয় ভাবের নানান্ ধারার জানা জড়' ক'রে ঘটতে থাকে। এই জানছি জানিনের জানা শুনা সুতরাং জড় বস্তুরই, হওয়ার যাওয়ার থাকার জিনিষ, মরণের এলেকার সামগ্রীই। এই জড় বস্তুগুলা জীবের ভেতরের জড় বস্তু,বাহিরের নয়। অন্তঃকরণ ধ'রে এই সব জড় বস্তুর অধিষ্ঠান। জগতের নানান্ রকমের জানা নানান্ রকমের ফল। এই রকম সুখ পাচ্ছি পেলামনার মাঝ দিয়ে সুখের ভাবগুলাও নানান্ রকমে জড়' করা ভাব। এরাও অন্তঃকরণের জড় বস্তু। হেতু ফল ভাব জগতের জ্ঞানের ধারায় আর সুখের ধারাতেও সুতরাং আছে, কেননা এ দু ধারাতেও হওয়া যাওয়ায় থাকা। এই হিসাবে এগুলাও কাজ। জড় বস্তু থেকে জড় বস্তু হয় ব'ললে শুধু বাইরে জগতের দিকেই তাকিয়ে বলা হয় না। ভেতরের জগতের দিকেও তাকিয়ে বলা হয়। যখন বলি মোহ থেকে বিস্মৃতি হয়, তখন বুঝি যে সব মনের ভাব জড়' হ'য়ে মোহ, সেই সব ভাবের কতক স'রিয়ে দিয়ে, তাতেই কতক নূতন ভাব এনে দিয়ে বিস্মৃতি। মোটের উপর মোহে আর বিস্মরণে বস্তুর হিসাবে, যা ধ'রে মোহ, যা ধ'রে বিস্মৃতি, সেই হিসাবে তফাৎ নেই। কাজ আর কারণে এই দুই বস্তুর এক রকমের প্রাণ ঠিক থাকে। মোহের মূলেও যা আপনার হয়নি তাই আপনার ব'লে ভাবতে যাওয়ার বিড়ম্বনা, ভুলে যাওয়ার মূলেও তাই। মোটামুটি যে সব ভাব জড়' করে শোক হয়, সেইগুলা একটু আধটু স'রিয়ে ন'ড়িয়ে দুই একটী নতুন ভাব এনে দিয়ে, 'বিষাদ' জন্মায়। দুয়ের ভেতরই কিন্তু এক প্রাণ, এক বড় ভাব যা পেয়ে সুখ পাবার আশা তাকে হারান। অন্তঃকরণের জড়' করা ভাবগুলাকে জড় বস্তু জড় কার্য্য ব'লতে মনে খটকা লাগবার কোনও কথাই নেই। কপিল থেকে আরম্ভ ক'রে

ভারতের সমস্ত ভাবুক পণ্ডিতই জগতের কাজ জ্ঞান সুখের ধারায় জড়ের অধিকারই সাব্যস্ত ক'রেছেন।

হয় নয়ের অধিকার অনেক ব'লে জগতের ভেতরে বাইরে সর্ব্বত্রই কাজের ধারা। ফলও 'কাজ' হেতুও 'কাজ'। যেটা একটা ফলের হিসাবে হেতু, আর একটা হেতুর হিসাবে সেটা ফল। জলকণা একভাবে জড়' হ'য়ে বাষ্প, বাষ্প একভাবে জড়' হয়ে মেঘ, মেঘ এক-ভাবে জড়' হ'য়ে বৃষ্টি। বিষয়ের চিন্তা থেকে তাতে আসক্তি জুড়ে কামনা, কামনা থেকে কামনার জিনিষ না পাওয়ার অভিমানে মোহ, মোহ থেকে বিস্মরণ। ভালবাসা থেকে ঈর্ষা, ঈর্ষা থেকে অভিমান, অভিমান থেকে মনের খেদ, খেদ থেকে নৈরাশ্য, নৈরাশ্য থেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য থেকে শান্তি। কাজ আর কারণ এই রকমে জগতের সব ভাব জুড়ে। উদাহরণ দেবার জন্য যে সব জগতের ভাব' গুলা দেখান হ'ল, তাদের আগে শেষে জু-ভাব নেই বটে, কিন্তু ত'লিয়ে বুঝলে বুঝবে শেষ আর গোড়া কোথাও নেই। কোনটাই আপনি হয়নি, কোন ভাবই এক ভাবে থাকে না। কোনও বিশেষ জ্ঞানের ধারা থেকেই 'চিন্তা'। বিস্মরণেও অন্য জ্ঞান এসে জোটে। কারু প্রতি ভালবাসা কত রকম সুখের আশা থেকে ওঠে। শান্তিতেও কত রকম সুখের খোঁজ পড়ে। কত রকমের বস্তু মিশে জল হ'য়েছে। বৃষ্টি থেকে কত কি হ'য়ে থাকে।

যখন একটা জড় ভাব আর একটা ভাবে দাঁড়ায়, তখন দ্বিতীয় ভাবটি প্রথম ভাবটির হিসাবে অস্থির, আর প্রথম ভাবটি দ্বিতীয় ভাবটির হিসাবে স্থির, কেননা যেটা হয়, সেটা যাবার জন্যেই হয়, আর এক ভাবে দাঁড়াবার জন্যেই হয়। জগতে হওয়া যাওয়ার গতিকে ভাবের বদল সকল সময়েই হ'চ্চে, তবে কখনও উৎকট ভাবে, কখনও সামান্য ভাবে। জগতের স্থির অস্থির সবই বদলের জিনিষ, বদলের হাত থেকে, হওয়া মরার হাত থেকে, কেউ নিষ্কৃতি পায় না। কারণই হ'ক, আর কাজই হ'ক, হবার জিনিষই হ'ক, আর সরবার

জিনিষই হ'ক, যে অবস্থায় যখন যে জিনিষ জ'ড় হ'য়ে থাকে, সেই অবস্থাতেই কিন্তু সেই তার বদলের ভাবের আড়ালে, সেই ভাবকে জড়' ক'রে রাখবার একটা শক্তি, একটা সামর্থ্য, থাকে। বাইরের ভাবটা সেই জড় শক্তির প্রকাশ মাত্র। যদি সেটা জীবন্ত হয়, তাতে যদি প্রাণের অধিষ্ঠান থাকে, তবে সেই প্রাণটা, সেই জীব শক্তিটেই, তার সমস্ত জড় শক্তিটে জুড়ে থাকে। মরা হ'লে জড় শক্তিটে শুধুই জড় শক্তি, নিজের ভেতরে সমস্তটা নিয়ে, অন্য সবের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে, সে আছি ব'লেও ভাবে না, চারিদিকে প্রাণের টানে, আপনার প্রাণে আপনি থাকবার সুখও সে পায় না। তা হ'লেও কিন্তু মরা জিনিষের জড় শক্তিও প্রাণের সম্পর্ক একেবারে ছেড়ে থাকে না। তার প্রত্যেক খণ্ড ভাগ, অণু জীব, জগৎ জোড়া জীবের প্রাণের অধিষ্ঠানের সমান সমান ভাবের অণু জীবের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। যেখানে প্রাণের অধিষ্ঠান আছে, সেই জিনিষের, সেই জীবের, জড় দেহও, এই জগৎ জোড়া জীবের প্রাণের অধিষ্ঠান মেনে চ'লতে বাধ্য হয়। বেশীর ভাগ জীবন্ত জিনিষের ভেতর ছোট প্রাণের অধিষ্ঠানও জীবন্ত জিনিষের জড় দেহকে মানতে হয়।

এইবার এখন আমাদের ভাবতে হয় সমস্ত জড় শক্তির আড়ালে জগৎজোড়া যে প্রাণের শক্তিটে আছে সে কোন্ ধরণের শক্তি ? এটা ভেবে বুঝতে মোটামুটি আমাদের বিশেষ কষ্ট হবার কারণ কিছুই নেই। জড় হ'লেও, জড়' করবার শক্তি থাকলেও, জগতের প্রাণ প্রাণেরই ধারা। সে জড়' করবার ভাবেই, হওয়া মরার থাকার ভাবেই, অনন্ত ভাগে ভাগেও এক অনন্ত একটানা হ'য়ে থাকবে। জগতের প্রাণের সেইটেই মহাসত্তার মহাভাব, এক অসীম থাকবার টানে থাকার মস্ত ভাব। অনন্ত জোড়া লাগান ভাবে থেকে, সেই প্রাণ এই এই রকমে অনন্ত হ'য়ে আছি ব'লে আপনাকে জানবে। সেই অনন্ত খণ্ড খণ্ড জোড়া লাগান জ্ঞানই জগতের প্রাণের মহাজ্ঞানের মহাভাব।

অনন্ত খণ্ডে খণ্ডে থেকে জেনে সেই প্রাণ বেঁচে আছি জানার সুখ অনন্ত খণ্ডেও অখণ্ড ভাবে পাবে। ফল, থাকার ধারায়, জানবার ধারায়, আনন্দ পাবার ধারায়, যেখানে যত ভাগই থাকুক না কেন, হওয়া মরার যত রঙ্গই ঘটুক না কেন, থাকায় থাকায়, জানায় জানায়, সুখে সুখে গাঁথা ভাবটার কখনই ত্রুটি হয় না। থাকার হওয়া মরাতেও প্রাণ থাকবে, জানার হওয়া মরাতেও প্রাণে প্রাণ জানবে, আনন্দের হওয়া মরাতেও প্রাণে প্রাণ আছি জানার সুখ পাবে। জগতে যা কিছু যখনই যে রকমে জড় হ'ক না কেন, সবাইকের আড়ালের মহাশক্তিতে প্রাণে প্রাণে আছি বুঝ্ছি সুখ পাচ্ছি এ ভাব ঘুচতে পারে না।

জগতের আড়ালে এই মহা জড়শক্তির জগৎ জোড়া 'আছির' ভাবে, মরণের হওয়া যাওয়ার ভাব ঢুকেই, তাকে থাকবার টা'নের রকম ভেদে, নানান্ প্রকারের ক'রে তোলবার মতন ক'রেছে। হবার যাবার আছি ব'লেই সে নানান্ 'প্রকারে'র আছি। তার থাকবার ভাব মস্ত একটা 'প্রকারে'র। সেই জন্যেই থাকবার ভাবে সেই জড় শক্তির নাম 'প্রকৃতি'। থাকবার ভাবেও মরণই এর স্বভাব। মারামারি কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ির শক্তি এই ম'রে থাকবার শক্তির ভেতর লুক'ন। সেই 'নিধন' 'প্রধনের' দিক্ দিয়ে বুঝতে গেলে, এই প্রকৃতিকে প্রধান বৈ আর কিছু বলা চলে না। এই ভাবটাই জগতের থাকবার শক্তির নিজস্ব ভাব, তাই এটা 'স্বভাব'। হ'য়ে মরার শক্তি নিয়েই, বিকারের শক্তি নিয়েই, 'প্রকৃতি' প্রকৃতি। এ জীবন পেয়ে, জ'ন্মে, বিকৃত হয়। মরণে এ নিজের ভাবে, নিজের প্রকৃতিতে, ফেরে। জগতে প্রাণীর দেহ যখনই ভাঙ্গে, তখনই প্রকৃতির দিকে ছোটে। যখন দেহ গ'ড়ে ওটে, তখন সে মরণের, প্রকৃতির উল্টা ভাবের টানে, বিকারের টানে, পড়ে।

জগৎজোড়া নানান্ খণ্ড ভাবের আছি 'জানবার' প্রাণে, মরণের হওয়া যাওয়ার উল্টা বাতাস বয় ব'লে, জগতের মহাশক্তির জ্ঞানও

ওলট পালট খেয়ে হয় অবিদ্যা। জানব জানব ক'রে ঠিক জানতে পারব না, তবু জানতে ছাড়ব না, জগতের জড় শক্তির জানবার অবিদ্যায় এই না জানার ভাব জড়ান থাকবে, আর না জানার আড়ালে যা হ'ক কিছু জানলাম, জানবার শক্তিটের পরিচয় দিলাম, এই ভাব অটুট থাকবে। জড় শক্তির বিকারের জ্ঞানে, জগতের ঘটনার সম্পর্কের জ্ঞানে, জগতের জিনিষের অদল বদল ভাবের জ্ঞানে, মরণের জ্ঞানে, এই অবিদ্যা জন্মায়, বিকারের জ্ঞান হয়। বিকারের জ্ঞানের মরণে, খণ্ড সম্বন্ধের জ্ঞানের উচ্ছেদে, অবিদ্যা নিজের ধাতে যায়, য়া জেনেছি ব'লে মনে ক'রেছিলাম সেটা ঠিক জানা হয়নি এটা জানতে পারে। অজ্ঞানের যতই প্রকারভেদ হ'তে থাকে, ততই অজ্ঞান গাঢ় হ'তে থাকে, বেকরাতে থাকে। প্রকার ভেদ ঘুচে গেল অজ্ঞান ছেঁড়া জানা জানা হয়নি এই জ্ঞানের মূল অজ্ঞানে দাঁড়ায়। অবিদ্যা জড় শক্তির ওপরের খাঁটি জ্ঞানের শক্তি হওয়া যাওয়ার শক্তি নিয়ে আচ্ছন্ন করে ব'লে মোহের শক্তি। কিন্তু হওয়ার শক্তির বিকাশেই সে ঘোর বিকারে, যাওয়ার শক্তির বিকাশে সে বিকারের জ্ঞানের অভাব মাত্র। জড় শক্তিকে সত্যি সত্যিই জড় শক্তি ভেবে অবিদ্যা নিজেকে নিজে ঠকায়, ছলনা করে, সুতরাং সে মায়া। বিকারের জ্ঞান যত বাড়তে থাকে ততই সেই মায়া নিজেকে বেশী ঠকাতে থাকে, জীবকে জানছি ব'লে বোঝাতে থাকে। সেই বিকারের জ্ঞান নষ্ট হ'লেই মায়ার ছলনার কাজ থেকে এড়ান পাওয়া যায়। তখন মায়া নিজে যে ছলা কলা বিস্তার ক'রতেই এসেছে এটা বুঝতে দেয়।

জড় শক্তির জগতের প্রাণের অখণ্ড সুখের ধারায় অনন্ত খণ্ড ভাব হওয়া মরার টানে জুটে, সুখ পেতে যাচ্ছি, সুখই খুঁজছি, কৈ সুখ পেলাম না, সুখ খোঁজার কষ্টই সার হ'ল, এই ভাবটা জাগাবার যোগাড় ক'রে, আসল সুখকে, জড় শক্তির মূল প্রাণের নিজস্ব সুখকে, দুঃখের ধারায় দাঁড় করায়। জগতের প্রাণ সেই থেকে দুঃখের পথে। দুঃখের পথে হ'লেও সুখ খোঁজবার যত্ন চেষ্টার কষ্টটা আছে,

'যাতনাটা' আছে, সুখের জন্যে পরিশ্রমের ক্লেশটা আছে। জগতের মূলে জড় শক্তির সুখের প্রাণ কাজেই, 'দুঃখের' 'যাতনার' 'ক্লেশের।' জড় শক্তির প্রকৃতি যেমন থাকার হওয়ার মরার খেলা দেখায়, অবিদ্যা যেমন জানবার হওয়া মরার খেলা দেখায়, 'যাতনা' তেমনি আনন্দের হওয়া মরার খেলা দেখায়। জীবের ভবের লীলা, শরীর ধারণ ক'রে প্রাণের তাড়ায় সুখের যত চেষ্টা, এই মূল যাতনাকেই, দুঃখের প্রেরণাকেই, বিছরে বিছরে বুঝিয়ে দেয়। সুখ পাওয়া কখনই যায় না, কিন্তু সুখ পাবার ভ্রমও ঘোচেনা। মূল দুঃখ সুখের ভ্রমে এ জগতে জীবের চেষ্টায় আরও বিক্রে যায়। সুখ পাবার আশায় দুঃখের কাজের নিবৃত্তি হ'লে, শান্তি হ'লে, সুখের কাজ কাজের সুখ ছাড়লে, জীব কতকটা যেন আরাম পায়, যেন সুখ পায়। আসল কথা সেই সময়ে প্রাণে জাগে, জীব বুঝতে পারে, সুখ জগতের কাজে খুঁজতে যাওয়া যাতনারই ভোগ বাড়ান। সুখের চেষ্টায় যাতনার বিকাশ বিকার, সে চেষ্টার বিরামে যাতনা তটস্থ নিশ্চেষ্ট।

হওয়ার যাওয়ার মরণের টানে প'ড়ে, সচ্চিদানন্দ প্রাণ এই রকম জগতে 'প্রকারের' 'অবিদ্যার' আর 'যাতনার'। জগতের প্রতি খণ্ডেই, প্রতি স্তরেই, ছোট বড় সব জীবেই, বিজ্ঞতম ব্রহ্মা থেকে মূঢ়তম স্থাবর পর্য্যন্ত, সকলের প্রাণেই এই তিন শক্তির চালনা।

(২১)

সাধের মরণ

প্রাণে প্রাণে জগৎ ছেয়ে আছে, অথচ সব প্রাণই জগতে ম'রতে এসেছে, নয় হ'তে এসেছে। এত কোটি কোটি প্রাণ হয় নয় হ'তে

এসেছে কেন ? এদের জগতের লীলা খেলা হয় নয়ের গতিকে, কিন্তু হয় নয়ের লীলা কিসের গতিকে ? জিনিষ এই জন্মায় এই মরে কেন ? জানা শুনা আজ এক রকম কাল আর এক রকম হয় কেন ? প্রাণের স্ফূর্তি উঠেই প'ড়ে যায় কেন ? থাকার বিকার, ভাবনার বিকার, ভালবাসার বিকার, প্রতিক্ষণেই জগৎ জুড়ে ঘটে কেন ? এই সান্নিপাতিক দোষ কোন্ দোষে, কার দোষে, কিসের দোষে, জগতের সব প্রাণকে আকুল ক'রে রেখেছে ? একজন নয়, পাঁচজন নয়, দশ জন নয়, যে যেখানে আছে, সবাই জগতে কোথা থেকে এমন বিষম ব্যাধির কোপে প'ড়ল ? জগতের প্রাণের গোড়ায় এই বিষম সমস্যা। যুগে যুগে বড় বড় ভাবুক এই সমস্যার সমাধান ক'রতে ব'সেছেন। নানা মুনি নানা মত প্রচার ক'রেছেন। নানা মত প্রচার ক'রেছেন দেখেই মনে হ'তে পারে যে, সমস্যাটা যেমন জটিল তেমনিই থেকে গেছে, নইলে একটা সমাধান হ'য়ে যাবার পর আবার সমাধানের চেষ্টা কেন হবে ? কোন উত্তরই বোধ হয় সদুত্তর হয়নি, সন্দেহ দূর ক'রতে পারে নি। তা হলে ত বিষম কথা ! প্রাণের সমস্যার প্রাণেই ত সমাধান হবে, যদি না হয়, তবে সমস্যাই হ'তে পারে না। তা হ'লে ফিরে দাঁড়িয়ে ব'লতে হয়, যিনি প্রাণ থেকে এই সমস্যার যে উত্তর দিয়েছেন, তাঁর সেই উত্তরই ঠিক, প্রাণে বোঝবার গতিকে সেটা ভুল হয় মাত্র। সব উত্তরই ভেবে দেখলে এক উত্তর, একই সমাধানের নানান্ ভাব। একে একে মোটামুটি উত্তরগুলার আলোচনা ক'রলে বোঝা যাবে যে একথা ঠিকই।

সমস্যার একটা উত্তর এই যে সমস্যাটাই নেই। হয় নয় হ'তে আসার নামই আসা, সুতরাং হয় নয় হবারই জিনিষ, হয় নয় হয় কেন এ প্রশ্ন পাগলের প্রশ্ন। গাছকে গাছ বলি কেন, মানুষকে মানুষ বলি কেন, আকাশকে আকাশ বলি কেন, এ রকমের প্রশ্ন হয় না। যখনই বুঝি, যখনই বলি, অমুক জিনিষ জগতের, তখনই বুঝি সেই জিনিষ হবে যাবে। হবা যাবার ভাবই জগতের ভাব, জগতের ভাবই হবা যাবার

ভাব। এ উত্তরে আপত্তি করা বড় কঠিন কথা। তবু কিন্তু উত্তরে প্রাণটা ঠাণ্ডা হয় না। এ উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে সন্দেহ জেগে উঠে, প্রাণে জগতের ভাব ওঠে কেন? যাবার ভাব, মরণের ভাবই জগতের ভাব হ'ক, কিন্তু থাকবার প্রাণে সে ভাব আসে কেন? এতেও যিনি ব'লবেন এ সমস্যা হয় না, তাঁর প্রাণের কথা এই যে, ম'রতে আসা প্রাণের খোস রুচি, প্রাণের খুসী। স্বাধীন ইচ্ছের প্রাণে, যা ইচ্ছে করবার প্রাণে, যা করে তাই করবার, তা না হ'লে ইচ্ছে আর স্বাধীন কোথায়? কাজেই যা ইচ্ছে তাই যে ক'রবে, সে অমুকটা কেন ক'রলে, এ সমস্যা আবার হয় কি? নিজের ইচ্ছাতেই প্রাণ নিজেকে উল্টে দেয়, উল্টে দিয়েও কিন্তু ধাতে থাকে। প্রাণ নিজেকে ছেড়ে বার হ'তে ইচ্ছা ক'রে, স্বাধীন ভাবের পরিচয় দিতে গেলেই, আপনহারা মরণের ভাব ছাড়া আর অন্য ইচ্ছে ক'রবেই বা কি? ফল জীব জগতের সৃষ্টির গোড়ায় জীবের আপন খুসিতে মরণের ফাঁসি পড়াই সৃষ্টির মর্ম্ম কথা, তাই জীবের হবার যাবার জগৎ হয় কেন এ প্রশ্ন চলে না।

সমস্যার আর এক উত্তর জীবের জগৎই নেই, হওয়ার যাওয়ার ভাবই নেই, ও রকম সবাই ভাবে বটে, কিন্তু সে ভাবনাটা মস্ত ভুল, হওয়া যাওয়ার ভাবটা ঐ ভুলেই। জীবের যখন আছি ভাব কখনও ঘোচে না, সেই ভাবে নিজেকে জানা কখনো ঘোচে না, আছি জেনে প্রাণে আনন্দ পাওয়াও যখন কখনও ঘোচে না, তখন সেই হিসাবে, জগতের ভাব, আসা যাওয়ার ভাব, মরণের ভাব নেই, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু ও রকম ভুলটাও যে হয়, সেটাও ত খাঁটি সত্য। থাকবার জানবার সুখ পাবার প্রাণ থাকতে যেন পাচ্চে না, জানতে যেন পাচ্ছে না, সুখ যেন পাচ্ছে না, এই বেড়া ভুলে প'ড়ে যে ঘুরপাক খায় সে কথাটা ত উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। জীবের জগৎ হ'ক না হ'ক, জীব ম'রুক না ম'রুক, জীব মরণের ভুলে যে উদ্ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে, ভুল হয় স্বীকার ক'রলেই ত সেটা স্বীকার করা হ'ল। প্রশ্নটা তখন আর

এক আকারে দাঁড়াবে। ভুলে ম'রতে এ জগতের ভাবটা জীবের হয় কেন ? তা হ'লেই ব'লতে হবে, ইচ্ছে ক'রে, নিজের খুসীতে যে ভুলে ম'রবে, তাকে আটকাবে কে ? ইচ্ছে ক'রে ভুল করার, আপনাকে ভোলবার, এক্তার জীবের স্বাধীন ইচ্ছের প্রাণে আছে। প্রাণের আপনাকে ভোলা মানেই প্রাণে মরা। তবেই মরণের ভুল করা আর মরা একই কথা। ফল কথা দাঁড়াল প্রাণ মরে নিজের ইচ্ছেয়। সুতরাং যাঁরা বলেন প্রাণ মরণের ভুল করে, তাঁদেরও প্রাণের কথা মরণের সৃষ্টি প্রাণের স্ব-ইচ্ছায়।

সমস্যার অন্য উত্তর এই, থাকবার জানবার সুখ পাবার প্রাণই নেই, যা কিছু আছে হওয়া যাওয়ারই ভাব, জগতের ভাব, সুতরাং প্রাণ জগতের ভাবে আসে কেন এ প্রশ্ন মিথ্যা প্রশ্ন। একটা ভাব হ'য়ে গেল, আর একটা ভাব হ'য়ে গেল, এই রকমে সবই হ'য়ে গেল, হ'য়ে গেল, হ'য়েই, ফুরিয়ে যায়। থাকাই হ'ক, আর না থাকাই হ'ক, জানাই হ'ক আর না জানাই হ'ক, সুখই হ'ক আর দুঃখই হ'ক, যা হবার তা হ'ল, কেউ ফেরেনা, কেউ থাকেনা, কেউ পেছু তাকায় না। হ'ল গেলর ভেতরে একটা কিছু র'ইল এটা মনে করা লোকের বড়ই ভুল, তবে ভুলটা সবাই করে এটা ঠিক। ঐ যে ব'লি আমি হাঁসলাম, কথা কইলাম, চ'লে এলাম, এসব বড় ভুল। এক ভাবের হাঁসি হ'য়েছে, কথা হ'য়েছে, চলা হ'য়েছে, এই মাত্র। সেই সব কাজগুলার পেছুনে একটা প্রাণ জুড়ে দিয়ে যে 'আমি' হ'য়ে বসি ওটা ভুলক্রমে বসি। পাখীটা গাছে ব'সল, গান ক'রলে, উড়ে গেল, এসব যে ব'লি, তাতে এক ভাবের বসা, গান করা, ওড়া, এই সব কাজ মাত্র আছে। একটা প্রাণের ঘাড়ে ওসব চাপাবার কোন কারণই নেই। সে রকম করাটা ভুল করা। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁরা অবশ্যই প্রাণে প্রাণে ভুল বোঝবার আর বোঝাবার একটা কিছু স্বীকার করেন। হওয়া যাওয়া ভাবটাকে সত্য বলা হয় হ'ক, কিন্তু ভুল বোঝবার বোঝাবার সেই ভাবটা হ'য়ে গেল ভাবের উল্টা ভাব তাতে আর কথাটি নেই। তবেই

হয়না যায় না এমন একটা কিছু র'য়ে গেল। তারই ভাবে, তারই ইচ্ছেয়, হওয়া যাওয়া ভাবটা ঘ'টতে হবে। সে হয় নয়ের অতীত হ'য়ে, হয় নয়কে কোলে ক'রে না ব'সতে চাইলে, হয় নয় হবে কোথা থেকে? বল আর না বল, সেই হয় নয়ের অতীতই হয় নয়ের 'প্রাণ'। তার ঝোঁকে, তার ইচ্ছেয়, তার তাড়াতেই, হয় নয়।

কেউ কেউ ব'লবেন স্বভাবের তাড়াতেই জগতের হওয়া যাওয়া হয়। প্রাণকে ধ'রে, প্রাণকে আড়ালে রেখে, হওয়া যাওয়ার খেলা দেখানই জগতের নিজস্ব ভাব। ছোট থেকে বড় পর্য্যন্ত সব প্রাণ, ব্রহ্মার প্রাণ থেকে কীটানুকীটের প্রাণ, সবাই নিজের নিজের মতন বাঁচবার ভাবকে দাঁড় করাবার জন্যে ঐ ভাব বজায় করাবার যোগ্য প্রাণগুলাকে জড় ক'রে ছোট বড় রকমের 'আমি' হ'য়ে জগৎ সাজিয়ে তুলেছে। পরকে নিয়ে কেউ নিজের ক'রতে পারছে না, পারবার কথাও নয়, তাই জড় ভাবটাকে সবাই কেবলই নানান্ রকমে ভাঙছে আর গ'ড়ছে। প্রাণের তাড়াতেই বাঁচতে হবে ব'লেই, প্রাণের স্বভাবেই ঐ জড় ভাবের ভাঙন গড়ন অবিরাম চ'লছে। জগতের ভাবটা হ'ল জীবের জড় বিকারের প্রকার। চল অচল যা কিছু ভাঙছে চূরছে, সবই সেই সেই জীবের বাঁচবার স্বভাবের গতিকে। ব্রহ্মা এক রকম ক'রে প্রাণধারণ ক'রতে হবে ব'লে কোটি কোটি জীব যারা সেই রকম প্রাণ ধারণ করাতে পারে, তাদের সবাইকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সাজিয়ে ব'সেছেন। সেই জীব গুলাও নিজের নিজের বাঁচবার ধারাতে ঐ রকম সাজে ঢুকছে। যোগ্যে যোগ্যে, যে প্রাণের যে মতন, সেই প্রাণের সঙ্গেই সেই প্রাণের টান, প্রাণের স্বভাবেই ঘটে। কিন্তু যতই মিল মিশ হ'ক, বেকরান প্রাণ একটির সঙ্গে মেশবার মতন আর একটি হ'তেই পারে না। তাই জড় বিকারে সদাই বিকার, জড়ের কেবলই ভাঙা গড়া। জগতের প্রাণে জড় বিকারে যাঁরা এই রকম প্রাণের স্বভাবের দোহাই দেন, তাঁদের ব'লতেই হবে জগতের বিকারে ঢোকাও প্রাণের

স্বভাব। নির্ভাঁজ শুদ্ধ প্রাণ যখন প্রাণের মতনটি আপনার প্রাণের কাছে জড়' ক'রতে না পারবে, তখন আর উপায় না দেখে, অবশ্যই কম বেশী রকমের আপনার প্রাণের মতন আর সবাইকে জড়' ক'রতে চাবে, কেননা, আপনার মতন আপনার কাছে টেনে এনে সুখ পাওয়াই প্রাণের কাজ। যে প্রাণ মহাপ্রাণের আর আর ভাগ নিজের প্রাণের মতন ব'লে ধ'রতে পারেনি, সেই প্রাণই জগতের বিকারের ঘূর্ণীতে প'ড়েছে। মহাপ্রাণের অনন্ত ভাগে সর্ব্বত্রই অনন্ত ভাগ আপনার ক'রে নেবার শক্তিও আছে, স্বাধীন অধিকারও আছে। স্বাধীন ইচ্ছা জানিয়ে সমস্তকে আপনার ক'রে নিতে পারলে তবে স্বাধীন অধিকারের পরিচয় দেওয়া হয়। অমনি অমনিই যদি শুদ্ধ প্রাণে সব আপনার হ'য়ে বসে, তবে আর আপনার করবার স্বাধীন অধিকার র'ইল কোথা? যেটা ইচ্ছে ক'রলে পাবে, ইচ্ছে না ক'রলে পাবে না, সেইটা পাওয়া না পাওয়াতেই স্বাধীন অধিকারের ভাব বজায় হয়। তাই শুধু খাঁটি প্রাণে পাবনার ইচ্ছেটা জাগিয়ে, তার ভেতরে পাবার ইচ্ছেটা লুকিয়ে রেখে, স্বাধীন ভাবটা মহাপ্রাণের নিয়মেই জাহির হ'তে চায়। তাই গোড়ায় কেবল শুদ্ধ জীবের জগতের ভাবে আসা, আর সঙ্গে সঙ্গে জগতের ভাব ছাড়বার চেষ্টা। প্রাণের স্বভাবে জগতের ভাব, প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছেয় জগতের ভাব এই কথারই অন্য রূপ। শুদ্ধ প্রাণ স্ব ইচ্ছেয় একবার জগতে ঢুকে যতদিন না সব প্রাণকে আপনার করার ভাব প্রাণে জাগাতে পারে, ততদিন নানান্ দেহ ধ'রে জগতে ঘোরে ফেরে। গোড়াকার ইচ্ছের বশে, স্বাধীন স্বভাবের তাড়ায়, এই ঘুরপাক।

অপরে বলেন, বুঝতে না পেরে, চারিদিকে অনন্ত আসল প্রাণের ভাব চিনতে না পেরে, জ্ঞানের প্রাণ অজ্ঞানে প'ড়েই, জগতের ভাবে নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে জগতে আসে। অবশ্য যে জগতে আসতে চায় সে যে চারিদিকে আপনার ধাতের আসল প্রাণের সন্ধান পায়নি এটা ঠিকই, ন'ইলে আপনার ধারার সঙ্গে যারা পূরাপূরি মিশ খাবে না

তাদের আপনার ক'রতে সে লালায়িত হবে কেন? কিন্তু কথা হ'চ্চে জ্ঞানের প্রাণে অজ্ঞান আসে কোথা থেকে? আপনার জনকে যে জানতে না পারে তার জ্ঞান কোথায়? অথচ প্রাণ ত জ্ঞানের না হ'য়ে পারে না। সুতরাং জ্ঞানে অজ্ঞান কি ক'রে আসে না বুঝতে পারলে, প্রাণের জগতে আসার হেতু কিছুতেই বোঝা যাবে না। জগতের হয় নয়ের জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে দেখলেই জ্ঞানে অজ্ঞান কি ক'রে গোড়ায় আসে তা বুঝতে পারা যায়। জগতে যা জানতে যাই তাই পূরাপূরি জানতে না পেরেও, এই জানাটা ঠিক্ রেখে যাই, যে আমি আছি জানছি, আর যেটা জানতে চাচ্চি সেটা আছে জানছি। সব জ্ঞানের গোড়ায়, এই 'আছি' আর 'আছে' ভাব। জগতের আসবার আগে এই 'আছি' আর 'আছে' ভাবটুকু মাত্র প্রাণে জেগে থাকে, অন্য কিছু নয়। আমি কি রকমে আছি, আমার সব কে কোথায় কেমন আছে, নিভাঁজ জ্ঞানে এতটা জানবার উপায় নেই। নেই ব'লেই ব'লতে পারা যায়, জগতের মূল জ্ঞান অজ্ঞানে ঢাকা। এই অজ্ঞানের ভাবটা শুদ্ধ প্রাণের স্বাধীন ভাবেই জাগ্রত। আমি যা জানিনে তাই জানব প্রাণের এই স্বাধীন ইচ্ছেটুকু কাজে দাঁড় করাবার জন্যেই জ্ঞানে অজ্ঞান। সব অমনি অমনি জানা হ'লে জানবার ইচ্ছেকে কি স্বাধীন বলা যায়? মহাপ্রাণের প্রতি ভাগে জানবার স্বাধীন অধিকার আছে ব'লেই, প্রতি প্রাণ ইচ্ছে ক'রে আগে অজ্ঞ হ'য়ে তবে বিজ্ঞ হ'তে চায়। এই অজ্ঞ হ'তে যাবার ফলেই জীবের জগৎ। অজ্ঞ হ'য়ে জগতে ঢুকে সবাইকে জানবার জন্যে জীবের প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু সারা জগতে সবাই এই কেমন ক'রে আছি আর আছে তা না জানার ভাবে। জগতে কাজেই জীব জানবার ইচ্ছেটা জাগন্ত পেলেও পূরো জানতে কখনই পারে না, কিছুতেই পারে না। ঘুরে ফিরে যত রকমেই জীব জ্ঞান পূরন্ত ক'রতে যায় তত রকমেই বিড়ম্বিত হয়।

কারু কারু এই মত, যে কাজের গতিকে, জীবের নিজের নিজের

কর্ম্ম ফলে, জগতের ভাব। কথাটা বলা যত সোজা বোঝা তত সোজা নয়। সোজাসুজি বুঝতে গেলে কিছুই বোঝা যায় না। জগতে আসবার আগে প্রাণের কাজ কি ছিল যাতে প্রাণকে জগতে টেনে এনে ফেলেছে? জগতে সবাই এক রকমের জীব হ'য়ে না ঢুকে নানান্ রকমের জীব হ'য়ে ঢুকেছে কেন? জগতের গোড়া থেকেই ছোট বড় ভাব এসেছে কেন? ফল ভোগ করবার কাজে অধিকার কার? শুধু 'মানুষের' না সব জীবের? মানুষেরই যদি হয় ত প্রথমে মানুষ ছাড়া অন্য জীব কি ক'রে জগতে এল? কাজের গতিকে জগৎ ব'ললে এই সব কথার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়ার দরকার। স্পষ্ট জবাব দিতে হ'লে কাজের গতিকওয়ালাকে ব'লতেই হবে, যে প্রাণ দায়িত্ব রেখে, ফল ভোগ করবার অধিকার রেখে, কাজ করবার জীবের ভাব অন্তরে ধ'রেই জগতে আসে। বিবেচনা ক'রে দায়িত্ব বুঝে কাজ ক'রতে এক মানুষই পারে। সুতরাং প্রাণ ভেতরে মানুষের ভাব জাগিয়ে জগতে আসে। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মাটী, জীবাণু, কৃমি, কীট, গাছ, পাখী, পশু, এইরকম সব আকারে প্রাণ আগে ঢুকে মানুষের আকারের দিকে এগুতে থাকে। কাজের জীব মানুষ হ'তে হবে ব'লেই যে প্রাণ একেবারে মানুষ হ'য়ে প'ড়তে পারে তা নয়। নয় নয় ক'রে হয় হ'তে এসে প্রাণে মানুষের ভাব থাকলেও হ'তে একেবারে পারবে কেন? প্রথম অবস্থায় শুদ্ধ প্রাণ অশুদ্ধ হ'য়ে, খাঁটী প্রাণ মানুষের দেহ 'জড়' করবার চেষ্টায় ব্যস্ত হ'য়ে, অতি ছোট জীবাণু থেকে আরম্ভ ক'রে সব ইতর প্রাণীর দেহ সাজিয়ে সাজিয়ে, ঠিক বিবেচনা ক'রে কাজ করবার দেহ হ'ল না ব'লে, সেই সব ইতর প্রাণীর দেহ কেবলই বদল সদল ক'রে, তবে প্রাণ মানুষ হয়। বলে চোরাশী লক্ষ যোনি ঘুরে তবে দুর্লভ মানুষ জন্ম পায়। ইতর প্রাণী থেকে মানুষের দেহ, প্রাণের বুঝে শুঝে কাজ করবার দেহ, ক্রমে গ'ড়ে ওঠে। জগতের সৃষ্টির সঙ্গেই মানুষের ভাব জন্মালেও মানুষ গ'ড়ে উঠতে জগতে তাই দেরী

হ'য়েছে। কোটী কোটি জীব স্বইচ্ছেয় মানুষ হ'য়ে কাজ ক'রতে জগতে অবিরতই আসছে। এখন তাই জগতে সব রকমের জীব। যুগ যুগান্তর ধ'রে জগতের ভাবে প্রাণ ঢুকছে, সুতরাং এখন সকল স্তরের প্রাণই, সকল রকম দেহের প্রাণই, সম্ভব হ'য়েছে। হয় নয় হ'য়ে কাজের মানুষ হবার প্রথম ইচ্ছেটাই জীবের প্রথম কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের ফলে, সেই ইচ্ছের ফলে, প্রথম জীবজগৎ। মানুষ হ'য়ে বিবেচনা ক'রে কাজ করবার অধিকারটা পূরাপূরি পেলেই, মানুষ হবার ইচ্ছেটার ভেতরে, সেইটাকে জ'ড়িয়ে ধ'রে, আবার নানান রকমের ছোট বড় ইচ্ছে, মানুষ হওয়া না হওয়ার মতন ভাবে জেগে ওঠে। সেই সব ছোট বড় ইচ্ছে মানুষের প্রাণের 'বাসনা'। তারা মানুষের প্রাণকে মানুষ হওয়া না হওয়ার রকমে আবার টেনে ফেলে। সেই সব বাসনার ফলে মানুষ হয়ত আবার ইতর জীবের আকারে ফিরতে পারে, চাই কি ভোগের হিসাবে বড় রকম জীবের দেহও ধ'রতে পারে। কাজের জ্ঞানের আনন্দের প্রাণ মানুষ হ'য়ে খুব কাজ ক'রতে ক'রতে এমন ভাব প্রাণে তুলতে পারে যে, কাজ বেশী না ক'রে সুখ আর জ্ঞানই বেশী যাতে পেতে পারি তেমনি দেহটি চাই। যদি তার কাজ যথার্থই প্রাণের সেই রকম ইচ্ছের পরিচয় দেয়, তা হ'লে অবশ্যই তার প্রাণ সেই বড় বড় রকম ভোগের আর বুদ্ধির দেহ জড়' ক'রে তুলতে পারবে। প্রাণের রাজ্যে প্রাণের ইচ্ছে কখনই অপূর্ণ থাকতে পারে না। মানুষ এই রকমে কাজের জোরে সুখের শক্তি সঞ্চয় ক'রে 'গদিয়ান' হ'তে পারে। এই গদিয়ান ভাবে থাকবার জানবার সুখ পাবার ভাব সবই বাড়ে। এই ভাব দেবতার ভাব। দেবতারা বড় প্রাণী। এঁরা মানুষের চেয়ে বাঁচেন বেশী, জানেন বেশী, সুখী বেশী। অবশ্য এঁদেরও ছোট বড় আছে, থাকবারই কথা। মানুষের মধ্যেও তা আছে, ইতর প্রাণীর প্রত্যেকের মধ্যেই তা আছে। দেবতা হ'য়ে কিন্তু ঠিক কাজের প্রাণ আর থাকে না। কাজের ভাব ছাড়বার জন্যেই দেবতার ভাব। ইতর প্রাণীরও ঠিক

কাজের ভাব নেই। কাজের ভাব জাগাবার জন্যেই ইতর প্রাণীর ভাব। এই রকমে বোঝা গেল মানুষের নীচের জীব কাজের ভাব জাগায়, ওপরের জীব কাজের ভাব ছাড়ে, আর মানুষই এক কাজের ভাবে থাকে। তাই সোজাসুজি বলা হয় মানুষের কাজের গতিকে সমস্ত জীবজগৎ, ইতর জীব মানুষ দেবতা সব। যাই হ'ক কাজের মানুষ দেবতাই হ'ক আর ইতর জীবই হ'ক, মূল কাজের ভাব, কাজের ইচ্ছে, প্রাণ থেকে উপড়ে ফেলতে না পারলে, আবার ঘুরে ফিরে মানুষই হবে। অন্য ছোট বড় বাসনার ভোগ হ'য়ে গেলেই কাজের প্রাণ নিয়ে মানুষ আবার মানুষই।

শুধু কাজের ফলে জগতের ভাব ঘটা অসম্ভব মনে ক'রে বড় বড় পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে প্রাণে প্রাণে জড় ক'রে জড় জগতের সব ঘটাবার শক্তি ধ'রে কেউ একজন আছেন। তাঁরই ইচ্ছেয় জীব জগৎ। জীবজগৎ নিয়ে তিনি খেলা করেন, ভাঙেন, গড়েন, তাঁর খেয়ালেই সব ভাঙা গড়া। তিনিই জীব জগতের নায়ক, পরিচালক, ঈশ্বর। মতটা শুনলে প্রথমেই মনে হবে বুঝি জীবের জগৎ জীবের নিজের ইচ্ছেয় নয়, অপরের ইচ্ছেয়, নিজের কাজের ফলে নয়, অপরের খেয়ালের বশে। ঈশ্বর যাঁরা মানেন তাঁরা কিন্তু একথা কিছুতেই ব'লবেন না। বলবার উপায়ও নেই। প্রাণে প্রাণ ছাড়া অপর জিনিষ কি ক'রে স্বীকার করা যাবে? যেখানেই যে থাক, যে যাই করুক, সে প্রাণই। প্রাণে প্রাণ জড় করবার শক্তি যদি কারু থাকে ত সে প্রাণেরই। যে আমার নয়, আমি যার নই, সে কখনই আমাকে তার শাসনে নিয়ে যেতে পারে না। জগতের এক একটা ভাব, জগতের পূর' ভাব, যে জড় ক'রে তুলতে পারে, সে সব জীবের, সব জীব তার। সে নিজে প্রাণ, জগতের প্রাণ। জগতের প্রাণই জগতের দেহ নিজের নিয়মে সাজায়। জগতের সব প্রাণের ভেতরের সমস্ত ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই এই জগতের প্রাণের নিয়ম। জগতের প্রাণই জগতের ঈশ্বর, অন্য ঈশ্বর কেউ নেই। সবাইকের জগতের

ভাব পাবার ইচ্ছে ধ'রেই এই ঈশ্বরের জগতের ভাবের ইচ্ছে। সেই ইচ্ছেই তাঁর খেলা, তাঁর খেয়াল। জগতের প্রত্যেক জীবের প্রাণের আড়ালে তিনি, তাঁর প্রাণ ধ'রে সমস্ত জীবের প্রাণ। জীবের প্রত্যেক কাজে প্রাণে যে এক একটা টান পড়ে, সেই টান ঈশ্বরের প্রাণ দিয়েই জগতে ছ'ড়িয়ে পড়ে। যে টানে যে ভাব জড় হয়, ঈশ্বরের প্রাণের ভেতর দিয়ে সেই টান এসে সেই ভাব জড় করে। তাই আমরা বলি ঈশ্বরই কাজের ফল দেন, কাজের মতন ভাব প্রাণে জড় করে তুলতে থাকেন। কাজের অনুসারে ভোগের দেহ যখন বদলায়, তখন সব কাজের টান ধ'রে যে সব ভাব জড় হয়, সেই সব ভাবের দেহই ঈশ্বরের প্রাণের ভেতর দিয়ে জগতে ছ'ড়িয়ে পড়া সব টানের জোড়ে গ'ড়ে ওঠে। ঈশ্বর কেউ মুখে মানুক আর নাই মানুক, কাজের টানে প্রাণ টানবার শক্তি সবাইকে মানতে হবে। সেই শক্তির ঈশ্বর নাম দেওয়া না দেওয়ায় কিছু যায় আসে না। জগতের গোড়া থেকে জীবের ইচ্ছে পূরন্ত করাই ঈশ্বরের শক্তির কাজ। সব প্রাণের টান ঈশ্বরের প্রাণের কপিকলে বাঁধা!

ফল সমস্ত মত আলোচনা ক'রেই জগতের ভাব আদৌ কেন ঘটে এ সম্বন্ধে এক কথা বৈ দু কথা দাঁড়ায় না। শুধু প্রাণ আপনাতে আপনি থেকে, আপনাকে আপনি জেনে, আপনার সুখে আপনি সুখী হ'য়ে, পূরন্ত প্রাণের ভাব না পেয়ে, প্রাণের সেই পূরন্ত হবার ভাবের জোরেই, যেন ভুলের খেলা খেলে, নিজের ইচ্ছেয় আপনাকে ছেড়ে, আপনাকে ভুলে, সেই খেলার খেয়ালে নিজেকে নয় ক'রে হয় হ'তে, এটা ওটা ক'রে, ঐ রকমের সমস্ত নয় ক'রে হয় হবার প্রাণ আপনার সঙ্গে মিশিয়ে, মিছে পূরন্ত প্রাণের ভাব পেতে চেষ্টা ক'রতে ছোটে। প্রত্যেক প্রাণের এই ভাবেই জগৎ, কোটি কোটি প্রাণ নিয়ে এক একটা জগৎ। যিনি যে মতই প্রচার ক'রে যান না কেন এক রকমে না এক রকমে শেষে এই মতই তাঁকে ধ'রতে হবে। প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছেয় জগৎ এ কথার কিছুতেই অন্যথা হ'তে

পারে না। যিনি বলেন প্রাণের জগতের ভাবে জিজ্ঞাসার কিছু নেই, যিনি বলেন জগতের ভাবই নেই, যিনি বলেন জগতের ভাবের গোড়া নেই, যিনি বলেন আপনার ভাবেই প্রাণ আপনি জগতে আসে, যিনি বলেন ভুল ক'রে প্রাণ জগতে আসে, যিনি বলেন কাজের গতিকে প্রাণ জগতে আসে, যিনি বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছেয় প্রাণ জগতে আসে, সকলেই প্রাণে প্রাণে জগতে স্বাধীন ইচ্ছেয় প্রাণের হয় নয়ের জগতে আসবার কথাই বলেন। জগতে এসে জগতে আসবার প্রকৃত ইচ্ছে নানা প্রকারে 'বেগড়াতে' থাকা, জগতে থাকবার সেই বিকৃত ইচ্ছে গুলাই হয় প্রাণের নানান্ 'বাসনা'। থাকবার প্রকার বিগড়ে গিয়ে জগতে প্রাণে নানান্ রকমের মরণ বা বিকার জোটে। জানবার প্রকার বিকরে নানান্ রকমের অজ্ঞান বা মোহ জ'ড়িয়ে ধরে। সুখের প্রকার বিকরে গিয়ে নানান্ রকমের দুঃখ ক্লেশ জগতে প্রাণকে আচ্ছন্ন করে। স্ব ইচ্ছায় এইগুলি ভুগতে জীবের জগতে আসা। আপনাকে ছেড়ে, আত্মহারা হ'য়ে, এগুলা, প্রাণ দুর্ভোগ ব'লেই জগতে ধরে। আপনাকে যখন ফের ঠিক ক'রে বুঝতে চায়, তখন এ দুর্ভোগ ঘুচে যায়, থাকলেও এ দুর্ভোগ আর দুর্ভোগ ব'লে মনে হয় না। জগৎ তখন জগৎ থাকে না, হয় নয়ের থাকে না। হয় নয়টা থাকারই এক রকমের খেলা ব'লেই প্রাণে তখন বোঝা যায়। আপনাকে ভুলেই প্রাণের ভুল, আপনাকে ধ'রতে পারলেই ভুলও আবার ঠিক হয়। ইচ্ছে করে আপনাকে ভুলে জগতে যে যে ভাব মরণের, মোহের, দুঃখের, ইচ্ছে ক'রে আবার আপনাকে জানতে পারলে সেই ভাবই বাঁচনের, জ্ঞানের, সুখের। আপনহারা ভাবের গতিকই এই।

ভাই, জগতের ভাব জীবের কি রকমে ঘটে এটা যদি এখন বুঝে থাক, তা হ'লে এখন অনায়াসেই বুঝবে, যে এই জগতের ভাবের আদিতে আপনহারা হবার ইচ্ছেটা, প্রাণে প্রাণে, স্বাধীন প্রাণে প্রাণে, মুক্ত জীবকে কেমন ক'রে হওয়া যাওয়া থাকার তিন গাঁটে বেঁধে, শেষে

হাজার বাঁধন দিয়ে ক'ষতে থাকে। প্রাণ স্ব ইচ্ছেয় ইচ্ছের স্বাধীন ভাব হারিয়ে বাঁধা প'ড়ে, শেষে সেই বাঁধা ইচ্ছেকে কত রকম বাঁধা কামনার সাজে যে সাজিয়ে তোলে, জগতের অনন্তভাব যে বোঝে সেই তা বুঝতে পারে।

জগতে জীবের কর্ম্মভোগ যিনিই বিচার ক'রতে ব'সেছেন, মানুষের কাজের দায়িত্ব ধ'রে যিনিই পাপপুণ্যের বিষয় আলোচনা ক'রেছেন, নিজের কাজের ফল জীবকে ভোগ ক'রতে হয় কি হয় না এ কথা যিনিই ভেবেছেন, তিনিই মানুষের ইচ্ছে স্বাধীন কি পরাধীন এই তথ্যটা একবার বোঝবার চেষ্টা ক'রেছেন। সিদ্ধান্ত কিন্তু এ বিষয়ে নানা রকমের হ'য়েছে। কেউ বলেছেন মানুষ অবস্থার দাস, নিজে স্বাধীনতা দেখিয়ে মানুষ কখনই কিছু ক'রতে পারে না, ক'রতে পারে ব'লে মনে করা মস্ত ভুল, পাপ পুণ্যের বিচার এই ভুল বোঝার ওপরেই চলে। অপরে ব'লেছেন মানুষ অনেকটা স্বাধীন, বর্ত্তমান নানা অবস্থার গতিকে তার জীবনে যত রকম ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্ভব হ'তে পারে, সেই সমস্ত বিবেচনা ক'রে, যে রকম সব অবস্থায় নিজেকে ফেলতে ইচ্ছে করে, সেই রকম সব অবস্থায় নিজেকে ফেলে, নিজের ভবিষ্যৎ অবস্থার ধারা ঠিক ক'রে যায়। ভেবে চিন্তে অন্য রকম মীমাংসাও অনেকে ক'রেছেন। তাঁদের মতে ইচ্ছে ক'রলে মানুষ একেবারেই অবস্থার দাস না হ'তে পারে। প্রাণের ইচ্ছের জোরে মনকে বাইরের অবস্থা থেকে টেনে নিয়ে স্বাধীন ইচ্ছে প্রাণের মধ্যে প্রাণের ভাব নিয়ে, প্রাণের খাঁটি অবস্থা নিয়ে, যা খুসী তাই ক'রতে পারে। এই রকমে জগতে মানুষের ইচ্ছের পূর' অধীনতা, কিছু রকম অধীনতা ও কিছু রকম স্বাধীনতা, আর পূর' স্বাধীনতা, এই তিন ধারারই মত প্রচার হ'য়েছে। ভেবে দেখলে ভাই বেশ বুঝতে পারবে এই তিনটে মতের কোনটাই ভুল মত নয়। বাস্তবিকই যখন যিনি যেই মত বুঝিয়েছেন তখন সেই মতই ঠিক ব'লে বোধ হ'য়েছে। আসল কথাটা এই স্বাধীন ইচ্ছে প্রাণের, শুদ্ধ মুক্ত প্রাণের, নিভাঁজ নিছক

প্রাণের প্রধান ভাব। জগতের ভাবে ঢুকলেই, হ'য়ে গিয়ে থাকার ভাবে ঢুকলেই, তাতে তিনটে ধারা ব'ইতে থাকবে। জগতে প্রাণ হবে হবেনা হ'য়ে থাকবে। প্রাণের ইচ্ছের ভাবেও ঠিক তাই ঘটবে। ইচ্ছে স্বাধীন হব হব হবে, হবেনা হবেনা হবে, এই রকম হ'য়েও স্বাধীন হ'য়ে থাকবে। মানুষ এই তিনটে প্রকারই জগতের ভাবে প্রাণে প্রাণে টের পায়। প্রতি অবস্থায় প'ড়েই ভাবতে পারে আমার আর কি করবার আছে, কিছুই নেই, এই রকম অবস্থার গতিকে যা হবার তাই ক'রতে হবে, তাই করি; আবার ভাবতে পারে চাই কি এই রকম ক'রে অবস্থাটাকে এই রকমে একটু ফেরাতে পারি, তাই করি; আবার ভাল ক'রে বুঝে দেখলে এমনও মনে ক'রতে পারে এই অবস্থা থেকে নিজেকে একবারেই স'রিয়ে নেওয়াই ভাল, তাই করি, এ অবস্থা আপনা আপনিই কেটে যাবে। স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেওয়া, স্বাধীনতা একটু জাগান, প্রাণে পূর' স্বাধীন ভাবটা টের পাওয়া, মানুষের প্রতি কার্য্যের ইচ্ছের সঙ্গেই আছে।

এইবার ভাই বোঝবার চেষ্টা কর এই স্বাধীন পরাধীন ইচ্ছে জগতে কত রকম বাঁধা কামনা কাজের অবস্থার গতিকে সাজিয়ে তোলে। জগতে বাঁচবার ইচ্ছের সঙ্গে নানান্ কামনা, জানবার ইচ্ছের সঙ্গে নানান্ কামনা, সুখের ইচ্ছের সঙ্গে নানান্ কামনা। সব কামনার মূলেই প্রাণের হ'য়ে না হ'য়ে থাকার ইচ্ছে। মানুষ থাকতে চায় বিষয় ধ'রে, সুখ পেতে চায় বিষয় ধ'রে। সব বিষয়ই হয় হয় হয়না হ'য়ে থাকে। মানুষের থাকবার জানবার সুখের ইচ্ছেও, বিষয়গুলার কেবল ওলট পালট হ'য়ে থাকার ভাব ধ'রে, কেবল ওলট পালট খেতে থাকে। এটা দেখতে চাই, ওটা দেখতে চাই, সেটা দেখতে চাই, এইরকম দেখবার জন্যে অনন্ত কামনা প্রাণে জাগে কেন? কারণ যাই দেখতে চাই, তাতেই দেখবার পিপাসাটা, দেখবার ইচ্ছেটা, মিটি মিটি ক'রে মেটে না, আবার জেগে ওঠে। দেখবার ইচ্ছে ফুটি ফুটি ক'রে কখনই ফোটেনা, কিন্তু কখনও যে কোথাও ফুটবে না, প্রাণকে এমনটা বুঝতে

কখনও দেয় না। দেখবার ইচ্ছেটা বরাবরই থেকে যায়, দেখবার নানান্ কামনায় সেটা আপনার পরিচয় দেয়, মূলে কিন্তু প্রাণের যা দেখবার মতন তাই দেখব এই ভাব ছাড়া অন্য ভাব থাকে না। চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয়, কত রকম খাবার খেয়ে রসনা জগতের তৃপ্তি পেতে চায়, কিন্তু এই বেশ রসনায় প্রাণের মতন রস যেন ভোগ ক'রলাম ক'র লামই মনে হয়, প্রাণের মতন রস ভোগ ক'রেছি, শেষে এটা কোন খাবার খেয়েই বোধ হয় না। রস প্রাণের মতন হই হই হ'য়ে কখনও হয় না, হ'তে পারে এই আশাটা কিন্তু প্রাণে জাগিয়ে রেখে যায়। সোয়াদ পাবার মূল ইচ্ছেটা নানান্ রকম সোয়াদের ইচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়ে নানান্ কামনার আকার ধরে। এই ভাবে প্রাণের মতন গন্ধ পাবার ইচ্ছে ধ'রে, ভাল গন্ধ ঐ পেলাম পেলাম পেলামনা কিন্তু পাব, এই রকম গন্ধ ভোগের কত কামনাই প্রাণকে ক্রমে ঘিরে বসে। প্রাণ জুড়ান শব্দ, প্রাণ জুড়ান স্পর্শ, পেয়ে পেয়ে, পেয়ে না পেয়ে, পাবার আশায়, শব্দ আর স্পর্শের কত কামনাই যে আমরা প্রাণে ধরি তা বলা যায় না। ফল পাঁচ বিষয় নিয়ে লক্ষ লক্ষ কামনা, প্রাণ এক প্রাণের মতন খাঁটি বিষয় পেতে চেয়ে, জগতে পাই পাই ক'রে না পেয়ে, আপনার ভেতরে গ'ড়ে তোলে। প্রাণ কিন্তু চায় প্রাণ। খাঁটি প্রাণেই খাঁটি রূপ খাঁটি রস খাঁটি গন্ধ, খাঁটি স্পর্শ, খাঁটি শব্দ। খাঁটি বিষয় খাঁটি প্রাণেরই ভোগের ধারা। প্রাণ যাতে থাকতে চায়, তাই জানতে চায়, তাতেই সুখ পেতে চায়। জগতের বিষয় জ'ন্মে ম'রে থাকে ব'লে, জগতে প্রাণের থাকায় জানায় আনন্দে বিষয়ের নানান্ কামনার ধারা।

কতকগুলা কামনা আছে সেগুলাকে মনে হয় যেন ঠিক বিষয়ের বাঁধনে ফেলা যায় না। ভেবে দেখলে কিন্তু বিষয়ের বাসনা ছাড়া অন্য কামনা জগতের ভাবে নেই। সব কামনাই জগতে বাঁচা জানা আনন্দের হওয়া যাওয়া থাকার কামনার ধারা। বিষয় জড়' ক'রেই বাঁচা, বিষয় জড়' ক'রেই জানা, বিষয় জড়' ক'রেই আনন্দ পাওয়া। থাকবার,

জানবার আনন্দ পাবার, ওলট পালট খেয়ে থাকায়, যত রকম প্রকার ভেদই ঘ'টুকনা কেন, বিষয়ে ধ'রে, বিষয়ের প্রকার ভেদে ধ'রেই সে সব হয়। অমুক রকম সব বিষয় নিয়ে অমুক রকমের বাঁচন হ'ক, মরণ হ'ক, থাকন হ'ক, অমুক অমুক রকমের জানার চেষ্টা হ'ক,ভোলা হ'ক, জানা হ'ক, অমুক অমুক রকমের সুখের চেষ্টা হ'ক, দুঃখ হ'ক, সুখ হ'ক, এই ভাবেই সব কামনাকে দাঁড় করান যেতে পারে। অবশ্য মরণের কামনা, মোহের কামনা, দুঃখের কামনা, বিষয় ধ'রেই থাকা জানা সুখের কামনার জগতের ভাবে ওলটান ধারা মাত্র। মরার কামনার ভেতর বাঁচার কামনা, ভুলের কামনার ভেতরে জানবার কামনা, দুঃখের কামনার ভেতরে সুখের চেষ্টার কামনা, লুকান থাকে। প্রাণের যেখানেই ওলটান ভাবের কামনা হয়, সেই খানেই বুঝতে হবে, যে ভাবটা হ'য়েছে, সে ভাবটা না গেলে, প্রাণ প্রাণের মতন মিলে মিশে থাকতে পারবে না। আমি নিজের বা পরের মরণ মোহ বা দুঃখ চাইলেই, আমার প্রাণের তখন এই ইচ্ছে, যে ঐ প্রাণের ভাব না পালটে গেলে আমার প্রাণ প্রাণ পাবে না। হায়রে সাধ ক'রে ম'রতে এসে প্রাণের এত বিড়ম্বনা!

(২২)

মরণের রঙ্গ

প্রাণ যখন জগতে ঢোকে তখন নিজের ইচ্ছাতেই ঢোকে। গোড়ায় শুদ্ধসত্ত্ব প্রাণই হ'ক, আর জগতে ঘোরাফেরা প্রাণই হ'ক, নিজের ইচ্ছে নইলে প্রাণ জগতে ঢুকবে কি ক'রে? তফাৎ এই

শুদ্ধসত্ত্ব প্রাণ, আপন রসে আপনি ভাসা প্রাণ, আপন খেয়ালে, যেমন তেমন ক'রে প্রাণের খেলা খেলবে ব'লে, খেলার ঝোঁকেই, আপনার সঙ্গে আপনি লুক'চুরি খেলে, চ'লে আসে; আর জগৎ ঘোরা প্রাণ জগতে যেমন খেলা খেলবার ভাব প্রাণে পূরে নিয়ে মরে, সেই সেই খেলা খেলবার মতন দেহ ব'দলে নিতে চায়, তেমনি. তেমনি দেহের ভাব জড়' করে ফিরে দাঁড়ায়। এক দিকে কি খেলা খেলবে প্রাণে তার ঠিকানা নেই, খেলা খেলতে হবে এই মাত্র ইচ্ছে আছে; অন্য দিকে যে রকমের খেলা খেলা যেতে পারে তার ধাঁচ ধোঁচের একটা ঠিকানা আছে। ম'রে যে জগতে ঘোরে সে জগতের রঙ্গ বুঝে শুঝে প্রাণে সেই রঙ্গের ইচ্ছে জাগিয়ে, সেই ইচ্ছের জোরেই ঘোরে। যে গোড়াতে আসে, জগৎ না জেনে, নিজের সঙ্গে নিজে একটা রঙ্গ ক'রব ব'লে, সেই ইচ্ছে ধ'রে সে আসে। রঙ্গ ক'রতে গেলেই জগতের ভাব এসে পড়ে। যে সদাই আছে তার রঙ্গ হব হবনার ভাব ছাড়া আর ত কিছু দাঁড়াতে পারেনা। এই হব হবনার. ভাবই জগতের ভাব। জগতের আসার ইচ্ছে কাজেই দুটা ধারায় বয়। এক ধারায় ঐ ইচ্ছে শুধু রঙ্ করবার ইচ্ছে মাত্র, অন্য ধারায় জানা শুনা ভাবের রঙ্ করবার ইচ্ছে। এক দিকের ইচ্ছেয় জগতের ভাব জানা শুনার ছাব নেই, ছোবনেই, অন্যদিকে সে ছাব, সে ছোব আছে। শুধু ইচ্ছেটা স্বাধীন ইচ্ছে, ছোব লাগা ইচ্ছেটা 'রঙিল', জগতের সম্পর্কে, জগতের 'গন্ধে', যেন 'বাসনা' দেওয়া, 'সংস্কার' করা। এই তফাৎ ধ'রেই বলা হয়, যাওয়া আসার জীবগুলা 'বাসনার' বশে, 'সংস্কারের' বশে, জগতে যায় আসে, শুদ্ধ জীব লীলা খেলার জন্যে আসে। যাই হ'ক, যে জন্যেই যে আসুক, প্রাণের ইচ্ছেতেই প্রাণ জগতে আসে। আর সেই ইচ্ছেটা প্রাণের রঙ্গ রসের ভাব, নিজেরই ভাব, ঝোঁক। ঝোঁকেই প্রাণ, প্রাণেই ঝোঁক। প্রাণের ঝোঁক ছাড়া, নিজের ভাব ছাড়া, ইচ্ছে ব'লে আলাদা একটা জিনিষ কিছু নেই। নিজের ভাবে নিজের টান, প্রাণের টানই প্রাণের ইচ্ছে।

প্রাণের এই নিজেতে নিজের টান ধ'রেই জগতের আর জগতের ওপরের সব ভাবই বোঝা যেতে পারে, এবং বোঝান যেতে পারে।

এই যে মূলে প্রাণ 'সচ্চিদানন্দ', আছে, জানে, আর ফুর্ত্তি করে, সেই ভাবটাও বুঝতে গেলে প্রাণের নিজের টানেরই পরিচয় মাত্র, আর কিছু নয়। নিজের ভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানই প্রাণের থাকা, আর এক ভাবে সেই সম্বন্ধ পাতানই জানা, অন্য আর এক ভাবে সেই সম্বন্ধ পাতান আনন্দ করা। কতকগুলা প্রাণ টেনে নিয়ে জড়' করে দেহ ক'রে সাজিয়েই প্রাণ জগতে আমি হ'য়ে থাকে, এটা ওটা চারিদিকে ছড়ান প্রাণের জড়'করা ভাবের সঙ্গে নিজেকে বেঁধেই, সেই সেই ভাব নিজেতে টেনে নিয়েই, প্রাণ জগতে আমার জানা ব'লে জানে, জড়'করা এটা ওটা প্রাণকে আপনার সঙ্গী ক'রে, তাদের টানেই আপনাকে ফেলে, আপনার টানেই তাদেঘরে ফেলে, প্রাণ জগতে সুখী ব'লে আপনাকে পরিচয় দেয়। ফল, থাকা জানা সুখ পাওয়া, প্রাণেরই এক এক ভাবের সম্বন্ধ, এক এক রকমের টান। প্রাণ প্রাণকে না টেনে, নিজের ভাবে নিজেকে না বেঁধে, থাকেনা, জানে না, সুখ পায়না। রঙ্গরসের জগতে, খেয়ালের খেলার জগতে, আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলবার জগতে, আপনহারা জগতে, হয় না হয়ের জগতে, চারিদিকে প্রাণ খেই হারাণ প্রাণ, ছেঁড়া খোঁড়া প্রাণ, খণ্ড বিখণ্ড প্রাণ। জড় জগতে, প্রাণের টান তাই ছেঁড়াকে জোড়া লাগানর টান, খণ্ড খণ্ডকে জড়' করবার টান। এই রকমের টানে জগতে থাকা, সুখ পাওয়া, জড়' হয় হয়, আর ভেঙে যায়, ছিঁড়ে যায়। জগতে থাকবার টানের গোড়াতেই ভেঙে চূরে রকমারি হবার টান, প্রকার ভেদের টান, 'প্রকৃতির' টান ; জানবার টানের গোড়াতেই ভাঙাচূরা জানার টান, ছেঁড়া জ্ঞানের টান, 'অবিদ্যার' টান'; আনন্দের টানের গোড়াতেই ছেঁড়া সম্বন্ধের টান, ভাঙা বাঁধন জোড়া দেবার যত্ন, 'যাতনার' টান। আপনার টান রঙ্গ ক'রে ছিঁড়ে, তার খেই হারিয়ে, জগতে আসতে গিয়ে প্রাণ 'প্রকৃতির' 'অবিদ্যা'র, আর 'যাতনা'র। ছেঁড়া টান জড়'

ক'রতে গিয়ে, জগতে প্রাণের আসল একটানা টানে নানান্ টান এসে পড়ে। প্রকৃতির, অবিদ্যার, যাতনার নানান্ টান ধ'রেই জগতের প্রাণের থাকবার, জানবার, আনন্দ করবার নানান্ লীলা।

হ'তে ক'র্ত্তে পারব' কি পারব' না, জানতে পারব' কি পারব' না, সুখ পাব' কি পাব' না, এই এই রকমের ভাব ধ'রে হবার করবার, জানবার, সুখ পাবার চেষ্টা ক'রতে গিয়ে, প্রাণকে একটু স'মজে ভেবে চিন্তে আপনাকে ঠিক ঠাক ক'রে এগুতে হয়। রকুমারি হ'য়ে কাজ করবার প্রাণে, না জেনে জানবার প্রাণে, কষ্ট ক'রে সুখ খোঁজবার প্রাণে, এই ভাবে জগতে এগুবার সময় হয় নয় হ'য়ে থাকবার তিনটে ভাব প্রকাশ পায়। হ'তে ক'র্ত্তে, জানতে, সুখ পেতে, প্রাণের এই তিন ধারাতেই প্রাণ আপনাকে বাহাল ক'র্ত্তে পারব ঠি'ক ক'রে, আপনাকে সামাল ক'রে, আপনাকে আপনি স'পে দেয়। নিজের ইচ্ছের মতনটি হ'তে পারব, নিজের ইচ্ছের মতনটি ক'রতে পারব' নিজের ইচ্ছের মতন জানতে পারব, নিজের ইচ্ছের মতন সুখ পেতে পারব', এই ভাব তখন প্রাণের আর আর প্রাণের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার, আর আর প্রাণ জড়' করবার, 'বুদ্ধির' ভাব। এই 'বুদ্ধি' থাকবার চেষ্টার মূলে, জানবার চেষ্টার মূলে, সুখ খোঁজবার চেষ্টার মূলে। হয় নয়ের জগতের প্রাণ চারিদিকেই ছেড়া খোঁড়া হ'য়ে ছড়ান আছে ব'লেই এই ছেঁড়া বুদ্ধির, জড়' করবার বুদ্ধির দরকার কেবল জগতেরই প্রসঙ্গে। ভাঙা চূরা যেখানে নেই, সেখানে এ বুদ্ধির আদৌ দরকার নেই। জড় বুদ্ধি জগতের প্রাণে, জগতের প্রাণ জড় বুদ্ধিতে। এই বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিন ধারাতেই একটা আমার ভাব এসে দাঁড়ায়। ঐটে সেইটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হ'লে আমি হ'তে ক'রতে, জানতে, সুখ পেতে পারব, ছেঁড়া প্রাণের জগতে বুদ্ধির পাছে পাছে, এ ভাব উঠবেই উঠবে। 'আমার' ভাব না হ'লে থাকাই হয় না, জানাই হয় না, সুখই হয় না। যা যা নিয়ে থাকা, যা যা নিয়ে জানা, যা যা নিয়ে সুখ করা, তাতে 'মমতা' না হ'লে, তার

তার সঙ্গে আমার ব'লে একটা বিশেষ সম্বন্ধ না ঘ'টলে, থাকা, জানা, সুখ পাওয়া হবে কি ক'রে? যেখানে সব প্রাণ এক প্রাণে গাঁথা, সেখানে 'আমার' ব'লে কোন বিশেষ ভাব সম্ভবে না। ছেঁড়া জগতে কিন্তু এই ছেঁড়া লেটা না হ'য়ে পারবে না। আমার ভাবটুকু হ'লেই, মমতাটুকু বস'লেই, অমনি প্রাণ থাকতে, জানতে,সুখ পেতে, আপনাকে আপনি ঠেলে দেবে। 'বুদ্ধি' আর 'অভিমানের' সঙ্গে পরে পরেই প্রাণের এই রকম জগতের ভাবে আপনাকে দান, জগতের ভাবে আপনার সেঁধ'ন', আপনার 'অভিনিবেশ'। যেখানে সবই এক জায়গায় এক প্রাণে, সেখানে এ অনিভিবেশ ঘটে না, চলে না। খেই হারাণ জগতে কিন্তু প্রাণের এই 'অভিনিবেশ', এই 'মনোযোগ' অনিবার্য্য। হ'তে ক'র্ত্তে, জানতে, সুখ পেতে মনোযোগ না দিলে হবে না। প্রাণ জগতে সেঁধুতে গিয়ে এই রকম মনোযোগ ক'রে, নিজেকে নিজে অভি-নিবিষ্ট ক'রে, তবে সেঁধুবে। প্রকার ভেদের মোহের কষ্টের ভেতর দিয়ে, নিজেকে জাহির ক'রতে বেরিয়ে, প্রাণকে 'বুদ্ধি' 'অভিমান 'মনোযোগে'র ভাব ধ'রে বার হ'তে হয়। হয় নয় হ'য়ে থাকবার কথা ধর'লে ব'লতে পারা যায়, মনোযোগটা প্রাণের হবার ধারায়, অভিমানটা বা আমার ভাবটা প্রাণের ছেঁড়া ভাব জাগাবার ধারায়, নয় হবার ধারায়, আর বুদ্ধিটা প্রাণের ঠিক হ'য়ে থাকবার ধারায়। বুদ্ধি অভিমান মনোযোগ জগতের শুধু জ্ঞানের মূলে ব'লে মনে করা বড় ভুল, জগতের ভাবে থাকবার মূলে, জগতের ভাবে সুখ পাবার মূলেও, এ তিনটা না থাকলে চলে না। জগৎ যেমন অন্ধ ভাবে জানে না, তেমনি অন্ধ ভাবে থাকে না, অন্ধ ভাবে সুখ খোঁজে না। এরা যেমন জ্ঞানেরও দীপ, তেমনি জগতে হবার কর্ব্বারও দীপ, সুখ খোঁজবারও দীপ। এই তিনটি ভাব আছে ব'লে জগৎ জ্ঞানেরই ধারা ব'লে মনে ক'রলে চ'লবে না। প্রাণে জ্ঞানের চেষ্টার সঙ্গে, থাকবার চেষ্টা, আনন্দ ভোগের চেষ্টা, কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। বুদ্ধি অভিমান মনকে জ্ঞানের ধারায় একচেটে ক'রে নেবার কোনও কারণই নেই।

থাকতে পারি আর না পারি থাকবার চেষ্টা ক'রতে হবে, জানতে পারি আর না পারি জানবার চেষ্টা ক'রতে হবে, সুখ পেতে পারি আর না পারি সুখ পাবার চেষ্টা ক'রতে হবে, এই ভাবে বুঝে শুঝে, আপনাকে ঠিক ক'রে, আপনার মতন সব ঠিক ক'রে, সেই সবের সঙ্গে আপনাকে ছেঁড়া জগতে বাঁধতে, আপনার থাকবার জানবার সুখ করবার মতন সব জড়' করবার ইচ্ছে, জড়' করবার টান, জড়' করবার শক্তি নিয়ে, প্রাণ জগতে ঝোঁকে। জগৎ সাজাবার ঝোঁকের প্রাণে তখন নিজেকে বজায় রেখে হয় নয়ের ভাব কাজ ক'রতে থাকে। হয়ের শক্তি, গড়বার শক্তি, জগতের প্রাণের তেজ হ'য়ে প্রকাশ পায়। নয়ের শক্তি, না করবার শক্তি, এক ভাবে হয় শূন্য আকাশ, আর এক ভাবে হয় সর্ব্বগ্রাসী 'কাল'। জগতে যা কিছু হয় তার মূলে সবাই সেই জন্যে একটা তেজের, একটা বলের, একটা করাবার বা হওয়াবার শক্তি, একটা চালিয়ে দেবার শক্তি, বুঝতে পারে। যা কিছু মরে, যা কিছু থামে, তা আকাশে আর কালে এসে ম'রে থামে ব'লেই সবাই বোঝে। ম'রে শূন্যে মেশে, কালের গর্ভে ডুবে যায়, একথা সকলের মুখেই শোনা যায়, কেননা প্রাণে প্রাণে এটা সবাই বুঝতে পারে। কথাটা খুলে ব'লতে গেলে একটু গুরুতর হয় বটে, তা ব'লে ব্যাপারটা গুরুতর নয়। আমাদের চলা ফেরা হাসা, এসব খুব চেনা জিনিষ, এগুলাকেও খুলে ব'লতে হ'লে এমনি গুরুতরই হ'য়ে পড়ে। যাই হ'ক আকাশ আর কালকে কেন শূন্য আর সর্ব্বগ্রাসী বলে, কেন এরা মরণের ঢেউয়ে, সেটা একটু বলাও দরকার। কেননা এ নিয়ে অনেকেই শুকনা অনেক তর্ক বিতর্ক ক'রে থাকে। প্রথমেই ধর ভাই আকাশের কথা। প্রাণ যত যত ভাব জড়' ক'রে নিজেকে জগতে অধিষ্ঠিত ক'রে প্রকাশ করে, সেই সমস্ত ভাবের শেষে, সমস্ত ভাবকে ছেড়ে, একে একে সমস্ত ভাবকে বাইয়ে দিয়ে, সমস্ত ভাবের অধিষ্ঠান হ'য়ে, নিজে শূন্যভাব হ'য়ে, জেগে ওঠে এক আকাশ। প্রাণের অধিষ্ঠানে সব ভাব যাক, কিন্তু আকাশের ভাব, সব ভাব ধ'রে থাকবার

সেই শূন্য অধিষ্ঠানের ভাব, যাবার নয়। সব ভাবকে মেরে, মরণের পথ আগলে আছে আকাশ। প্রাণের আকাশে সব আনন্দের ভাব জানার ভাব, থাকবার ভাব। মরণের ভাব মরে যেন আকাশে। কালের ভাব মরণই ধরবার ভাব, মরণের মরার ভাব নয়। জগতে থাকবার ভাব, জানবার ভাব, প্রতিপদে হ'চ্চে আর যাচ্চে। যেই যেটা যাচ্চে অমনি আমরা ধ'রি সেটা কালের ধারায় যাচ্চে, কালে মিশিয়ে যাচ্চে, কেননা থাকবার ধারায় হওয়ার পেছুনে থাকবার যেটা সেটা যাবে কোথা? মরণের এক মাত্র আশ্রয় এই কাল। এর নিজের কোনও ভাব নেই, এ হয়না, এ শূন্যভাবের 'কাল'। শূন্য আকাশে শূন্যকালে প্রাণের তেজে, প্রাণের শক্তির আবেশে, জগতের সব সাজ।

তিন 'ধাতুতে', তিন উপকরণে, জগতের সেই সব সাজ তৈয়ারী। এই তিন ধাত মাটী জল বাতাসের ধাত। একটি কঠিন, একটি গলা, একটা হাওয়া। অনায়াসে মনে ক'রতে পারা যায় গলা জিনিষটা সাজান প্রাণের হবার ধারায়, কঠিন মাটী মরার ধারায়, আর হাওয়া থাকনের শক্তির ধারায়। বায়ুই প্রাণ, জল জিনিষ গজিয়ে তোলে, মাটী হ'লেই জিনিষ ম'ল'। মাটী, জল, হাওয়া মিশে সব জগৎ গ'ড়ে উঠেছে। জগৎ সাজানর চেষ্টায় শূন্যে তেজের আবেশে মাটী জল হাওয়া তৈয়ারী হ'য়ে জগতের সবভাব পাকিয়ে তোলে। মোটের ওপর তিন ধাতু, দেশ কাল অধিষ্ঠান, আর তেজ, এই কটাই জগতের থাকার জানায়, ভোগের বিষয়। কাল জগতের ভাবের কেবল মরণই ধ'রতে, কাজেই জগতের ভাব ধ'রতে পাঁচটাই বিষয়—ভূমি জল বায়ু, তেজ আকাশ। বায়ুকে ধ'রেই তেজের বাইরে প্রকাশ, সুতরাং পাঁচটা বিষয়কে পরে পরে ভূমি জল তেজ বায়ু আকাশ এই রকম ভাবেই বলা হয়। মরণের ভাব ক্রমে ক'মে আকাশে মরণের ভাবই যেন ম'রেছে। আকাশ থেকে প্রাণের সূক্ষ্ম তেজে বায়ুর প্রকাশ, বায়ু ধ'রে তেজের জ্যোতির ভাবে স্থূল প্রকাশ, তেজ ধ'রে গলাভাবের বা রসের প্রকাশ,

রস হ'তে জমাট ভাবের বা মাটীর প্রকাশ। জগতের ভাবে মোটা ধাতু তিনটে শক্তি আর আধার নিয়ে পাঁচটা বিষয় হয়। জগতে যে কোনও রকমে থাকা যায়, জানা যায়, সুখ করা যায়, এই পাঁচটা বাঁধবার জিনিষ আপনাতে বেঁধে সেই সব করা যায়। এই পাঁচ বিষয়ের ভাবই হবার করবার বিষয়, জানবার বিষয়, সুখ ভোগ করবার বিষয়। মরণের জগতে সব এদেরই রঙ্গ, এরাই সব মরণের রাজ্যের ভূত। ম'রে হয়, হ'য়ে মরে ব'লেই এরা 'ভূত'। ভূতের ভাবই জগতের বিষয়, তাতেই থাকা, তাতেই জানা, তাতেই ভোগ করা। ভূত সাজিয়ে থাকতে হয় এটা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু জানতে, আর ভোগ ক'রতে যে ভূতের আশ্রয় নিতে হয় এটা বুঝতে একটু কঠিন বোধ হয়। একটা কথা মনে রাখলে এটুকু বুঝতেও কঠিন ঠেকেনা। প্রাণে যে ভাবের থাকা, সেই ভাবেই জানা, সেই ভাবেই ভোগ করা। বিষয় নিয়েই যখন প্রাণকে থাকতে হয়, তখন বিষয়ের ভাবে, বিষয়ের আকারেই প্রাণকে বুঝতেও হয়, ভোগ ক'রতেও হয়। প্রাণে বিষয়ের ভাব, বিষয়ের আকার, স্বীকার না ক'রলেই নয়।

প্রাণে বিষয়ের ভাব স্থির হ'য়ে চেপে ব'সলেই বিষয়ের হয় নয়ের আর দুটা ভাবও অমনি তখন তাকে পেয়ে বসে। এই দুই ভাবের বশে দেহের ভাব আর ইন্দ্রিয়ের ভাব প্রাণে দেখা দেয়। গোড়ায় প্রাণ এক মস্ত প্রাণে এক হ'য়ে অখণ্ড হ'য়ে থাকে। জগতে খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ঢুকে সব খণ্ডকে এক ক'রে জড় হ'তে চায়, কিন্তু পারেনা, তবু পারবার আশা ছাড়ে না। ভূতের ভাব ধ'রে ছড়ান ভূতকে এক ক'রে নিজেতে মিশিয়ে, নিজের ক'রে তুলতে গিয়ে, কতকটা সেটা পারে আবার পারে না। যে টুকু যে ভাবে পারে সেই টুকু সেই ভাবটা হয় প্রাণের দেহ, আর বাকী সবটাকে এক ক'রতে না পারলেও, তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাবার ভাব নিজেতে জ'ড়িয়ে, সেই ভাবটাকে ইন্দ্রিয়ের ভাব ক'রে জাহির করে। পাঁচ ভূতের ভাব দেহেতে জড়, পাঁচ ভূতের ভাবের

পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও দেহ ধ'রে জড়। ফল বিষয় ধ'রে ছেঁড়া প্রাণ জোড়া লাগানর এক ধারায় দেহ, অপর ধারায় ইন্দ্রিয়। দেহ আর ইন্দ্রিয়ে ভূতের অধিষ্ঠান, দেহ আর ইন্দ্রিয় দিয়েই জগতে প্রাণের থাকা, জানা, ভোগ করা। প্রাণের অধিষ্ঠানে দেহ আর ইন্দ্রিয়ের ভূতই জগতের দেহী বা প্রাণী বা জীব। হওয়া ভাব কখনও স্থির থাকেনা, যাওয়ার ভাবও কখনও স্থির থাকেনা, হওয়া ভাবও হয় যায়, যাওয়ার ভাবও হয় যায়। দেহ আর ইন্দ্রিয়ও তাই এক ভাবে কখনও থাকে না। এদের পুষ্টিও আছে ক্ষয়ও আছে।

সূক্ষ্ম প্রাণ বিন্দু যখনই জগতে জন্মায়, তখনই এই দেহীর ভাব নিজেতে প্রকাশ ক'রেই, ভূতের তৈয়ারী ইন্দ্রিয় দেহ, তার ওপরে মন, অভিমান, বুদ্ধি, তাদের আড়ালে থাকতে জানতে ভোগ ক'রতে পাই না পাই, থাকতে জানতে ভোগ ক'রতে হবে, এই চেষ্টা, এই ঝোঁক, এই শক্তি, এই ইচ্ছে, ধ'রে জন্মায়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা ধ'রে একটা দেহী, একটা জীব, সেই জীবের দেহ ধ'রে কোটি কোটি জীব, তাদের ধ'রে আরও কত কত, আবার তাদের, তার পর তার পর ক'রে ওপর থেকে নীচের স্তর পর্য্যন্ত, জীবের আর গুণতি করা যায় না। এক একটা দেহ তার চেয়ে বড় দেহের ভেতর, এমনি ক'রে বড়'র বড় ধ'রে জীবের দেহ কেমনই সাজান র'য়েছে! হয় নয়ের জগতে সদাই এই দেহের ভাঙ চুর হ'চ্ছে। দেহের ভেতর থেকে ছোট দেহ বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ছোট দেহ ঢুকছে। মরবার সময়ে জগতে একটা দেহীর ভাব ফেলে দিয়ে, আর একটা দেহীর ভাব পাবার জন্যে, প্রাণ, থাকবার, জানবার, ভোগ করবার ঝোঁক নিয়ে, তার সঙ্গে বুদ্ধি অভিমান মন নিয়ে স'রে পড়ে। সেই দেহে দেহের ধরণ বুঝে বুদ্ধি অভিমান মন ধ'রে থাকবার জানবার ভোগ করবার শক্তি প্রকাশ পায়। একেবারে মরা দেহ, অচেতন দেহ, দুঃখের দেহ অসম্ভব। অতি নিম্ন স্তরের দেহে জীবনের, সুখের, জ্ঞানের, শক্তি অত্যন্ত কম ফোটে এই মাত্র। জীবনের জ্ঞানের সুখের শক্তি স্তরে স্তরে বাড়তে থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষে খুব বেশী

এই শক্তি ফোটে। তবু কিন্তু 'ব্রহ্মার' ব্রহ্মাণ্ড দেহ বদলের বশ, মোহের বশ, যাতনার বশ।

আসল কথা ব'লতে গেলে ব'লতে হয় জীব ছাড়া জগতে আর অন্য 'বস্তু' নেই। জীবেতেই জগতের প্রাণ বসবাস করে, আর কিছুতে ক'রতে পারে না। তবে এই জীব হবার জন্যে যে যে ভাবের ভেতর দিয়ে প্রাণ আসে, সেই সেই ভাবগুলাকেও এক রকমে'বস্তু' বলা যেতে পারে, কেননা প্রাণ সেই সেই ভাবেও বাস ক'রেছে বৈ কি। এই জন্যে প্রাণ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাণের ইচ্ছাশক্তি বুদ্ধি অভিমান মন তেজ কাল আকাশ তিন ধাতু, এগুলাকেও বস্তু বলা হয়। এর মধ্যে প্রাণ থেকে মন পর্য্যন্ত বস্তু বিষয়ের ওপর, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, প্রাণেরই গোচর, দেহ বদলের সময়ে মরণের প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে যায়। হওয়া যাওয়ার আমলে ঘটা ক'রে থাকে তেজ কাল আকাশ নিয়ে, তিন ধাতু, আর সেই সব নিয়ে জীবের দেহ আর ইন্দ্রিয়। দেহ ইন্দ্রিয়ের জীব, দেহী জীব, সব জগতে ছ'ড়িয়ে নানান্ বস্তু হ'য়ে জগতে আড়ম্বর ক'রে ব'সে আছে। বস্তু জগতে দেহী হ'য়ে জাহির হ'য়ে, দেহীর আসল প্রাণের ভাব, তার সঙ্গে দেহীর একরকম ঘুমন্ত ভাব, আর এক রকম জাগন্ত ভাব, ধ'রে বসে। দেহীর এই প্রাণের ভাবটাই তার জাতি, ঘুমন্ত ভাব তার গুণ, জাগন্ত ভাবটা তার ক্রিয়া। বস্তু ব'ললেই তার জাতি গুণ ক্রিয়া আছে। হওয়া না হওয়া থাকা ধ'রেই বস্তুর এই তিন ভাব। ঐ সুরভি ব'লে আমার সাদা গাইটে লাফিয়ে উঠেছে, ওটায় তার জাগন্ত ভাবটা, চেষ্টাটা, ক্রিয়াটা, ফুটে উঠেছে। সেই লাফানর কাজে সে যেন জগৎকে সজোরে আক্রমণ ক'রেছে। জগতের সঙ্গে নিজের টান সরগরম ক'রে নিচ্চে, জাঁকিয়ে তুলছে। ঐ সাদা ভাবটা র'য়েছে, ওটা যেন ম'রে র'য়েছে; মরার মতনই ও ভাবটাকে বোঝা যাচ্ছে। মরার মতন ভাব, ঘুমন্ত ভাব, হ'লেও ওটা লুকান ছাপান ভাব নয়। যার চোক আছে, যে ঐ সাদা বস্তুটার পানে তাকাচ্ছে, তার চোক ঐ সাদা জিনিষের শক্তিতে কেমন এক

রকম ভাবে আস্তে আস্তে যেন অজ্ঞাতসারে অভিভূত হ'য়ে প'ড়ছে। অপর দেহের অপর দেহীর কাজে গুণের পরিচয়, স্পষ্ট নিজের কাজে নয়। জিনিষের নানান্ রকম রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, নানান্ রকম সরুমোটা কঠিন গলা হালকা ভারী এই রকম যত কিছু গুণ, সবই জিনিষে থেকে অপরের কজেই পরিচিত হয়। হাত পা নাক কাণ চোক এই রকম সব দিয়ে চাই কি মন বুদ্ধি দিয়ে কাজ ক'রে, অপরের গুণ বুঝতে হয়। ক্রিয়া আর গুণ বস্তুতে এই রকম স্পষ্ট আর অস্পষ্ট ভাবে সাক্ষাৎ বোঝবার জিনিষ, কিন্তু 'জাতির' সাক্ষাৎ পাবার জো নেই, সেটা সমস্ত গুণের, সমস্ত ক্রিয়ার আড়ালে থেকে, বস্তুর এক রকম প্রাণ হ'য়ে থেকে, সার সর্ব্বস্ব হ'য়ে থেকে, সমস্ত গুণ, সমস্ত ভাবকে প্রকাশ করে। আমার সুরভি গোরুটা গোরু ব'লেই সাদা হ'তে পেরেছে, লাফাতে পেরেছে। গোরুতে যত রকম গুণ, যত রকম কাজ হ'তে পারে, সাদা গুণ, লাফান, সেই সবের মধ্যেই। গোরুতে গুণের অদল বদল হয়, কিন্তু গোরুর ভাবের অদল বদল হয় না। গোরুর ভাবটা অখণ্ড নিত্য ভাব।

প্রাণের বস্তুতে, প্রাণের অধিষ্ঠানে তৈয়ারী জিনিষেই, জগতে আসল জাতি গুণ ক্রিয়ার ভাব স্বীকার করা যায়। তা হ'লেও জগতে সর্ব্ব ক্ষণই জীবের কাজে প্রাণের অধিষ্ঠান ছাড়াও ভূত জড় হ'য়ে দেহের মতন সাজ সাজছে, ভাঙছে চুরছে। রুয়ের ঢিবি থেকে ঘড়বাড়ী পুকুর পাহার পর্ব্বত নদ নদী এই রকমের সবই জীবের কাজের ফল, জীবের সৃষ্টি। কোথাও ইতর জীবের কৃতিত্ব, কোথাও মানুষের, কোথাও বা ওপরের জীবের, অথবা ব্রহ্মাণ্ড পুরুষের। জীবের কাজেও, জীবের সৃষ্টিতেও, কোথাও প্রাণের অধিষ্ঠান আসে না এমন নয়। এক হিসাবে দেখতে গেলে যেখানে প্রাণের অধিষ্ঠান এসেছে সে গুলাও জীবেরই সৃষ্টি। যাই হ'ক যাতে প্রাণের অধিষ্ঠান নেই, জগতে সেই জড়' করা জিনিষকেই আসল জড় বস্তু বলা হয়, অপ্রাণী বস্তু বলা হয়, আর যাঁতে প্রাণ আসে তাকে প্রাণী বস্তু বলা হয়। অনেক সময়ে

একটা জড়' করা দেহের আড়ালে প্রাণ আছে কিনা বোঝা বেশ একটু কঠিনই হয়। হওয়া, যাওয়া, বৃদ্ধি, ক্ষয়, জগতের প্রাণের লক্ষণ বটে, কিন্তু অনেক জড় বস্তুতেও বৃদ্ধি ক্ষয় জগতের জীবের কাজেই ঘ'টে থাকে। পর্ব্বত নদী এ সবের আড়ালে প্রাণ আছে কিনা এ কথা বলা বড়ই শক্ত। জগতে সাজান দেহের বস্তু তা হ'লে এই তিন রকমের, প্রাণী, অপ্রাণী, আর প্রাণী কি অপ্রাণী। এই তিন রকমের 'দেহী' ধ'রেই জাতি গুণ ক্রিয়ার বস্তু মোটামুটি ভাবে বলা হয়। যেখানে প্রাণ নেই সেইখানে প্রাণ কল্পনা ক'রে নিয়ে, তার জাত, গুণ, কাজ, ধ'রতে হয়।

যে যাই বলুক, মোটামুটি প্রাণের জীবরূপেই জগতে পরিণাম, এই পরিণামে তার ওলট পালট খাওয়া, হওয়া, মরা, থাকার ভাবে পড়া সচ্চিদানন্দের ভাবের নানান্ দশা, নানান্ রঙ্গ। জগতে জীবনের দশা, জ্ঞানের দশা, ভোগের দশা, বিস্তারিত ভাবে বুঝে দেখলে, মরণের প্রাণের কত রঙ্গই বোঝা যায়। প্রতিপদেই আমরা জগতে সেই সব রঙ্গ দেখ্ছি, বুঝ্ছি, বুঝে ম'জে আছি। মোটামুটি এর ঢঙ্ ঢাঙ্ টুকু বুঝে এর নব নব রঙ্গ বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

প্রকৃতির রঙ্গে, হ'য়ে না হ'য়ে থাকবার রঙ্গে, অতি বড় ব্রহ্মাণ্ডের পুরুষ থেকে অতি ছোট জীব পরমাণুর স্থষ্টিতে, হবার ভাবে জন্ম, নয় হবার ভাবে মৃত্যু, আর থাকবার ভাবে জীবন ধারণ করা। জন্ম আর মরণের মাঝে জীবন ব'ইয়ে যাওয়া, আবার মরণ আর জন্মের মাঝ খানেও জীবন ব'ইয়ে যাওয়া। এই জন্ম স্থিতি মরণ স্থিতির, আবার জন্ম স্থিতি মরণ স্থিতির, পর পর অনন্ত ঢেউ মহাকালের সাগরে মিশে যায়। বড় ব্রহ্মাই হ'ক আর ছোট জীবাণুটিই হোক, সবাইকেই জগতের ভাবে যাবৎ থাকতে হয়, তাবৎ এই ঢেউয়েতে দেহ ঢেলে দিতে হয়। ব্রহ্মার সঙ্গে একটা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ব্রহ্মার স্থিতিতে একটা ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি, ব্রহ্মার মৃত্যুতে একটা ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়। ছোট জীবের জন্ম স্থিতি মৃত্যু একটা ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি ধ'রেই হয়। ম'রে ব্রহ্মার প্রাণ নিজেত্বে

নিজে থেকে যায়, গিয়ে আবার যেমন রঙ্গের কামনা মরবার সময়ে নিজেতে জাগে, তেমনি রঙ্গে হয়ত ছোট বড় জীব হ'য়ে শেষে ফের জন্মায়। ছোট জীব ম'রে বড় কামনার বলে চাইকি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত হ'য়ে ফের জন্মাতে পারে। রকমারি হবার কামনা, প্রকৃতির লীলার, অবিদ্যার লীলার, দুঃখের লীলার কামনা প্রাণ থেকে জীবের না ঘুচে গেলে, ম'রে ছোট বড় জীব হ'য়ে ফেরা অনিবার্য্য। জন্ম স্থিতি লয় ফিরে ঘুরে প্রকৃতির জীবকে আক্রমণ ক'রবেই ক'রবে। শুধু তাই নয়, এদের প্রতি অবস্থাতেই আবার ঐ জন্ম স্থিতি লয়ের রঙ্গ। জীব এ মুহূর্ত্তে যে রকম, পর মুহূর্ত্তে তা নয়, একটু ব'দলেছে। তা হ'লেই ব'লতে হয়, এক দেহের ভাবেও জীব থাকবার সময় প্রতি পদে ছোট রকমে জন্মাচ্চে থাকচে আর ম'রচে। এই হিসাবে জীবের জন্মেরভাবের উৎপত্তি স্থিতি লয় আছে, স্থিতির ভাবের উৎপত্তি স্থিতি লয় আছে, লয়ের ভাবেরও উৎপত্তি স্থিতি লয় আছে। বীজে জীবের জন্মভাবের আরম্ভ, গর্ভভাবে জন্ম লুকিয়ে বহন, উদ্ভেদে জন্মভাবের সমাপ্তি। বীজ গর্ভ উদ্ভেদ জন্মের এই তিন ভাব। স্থিতির ভাবের আছে ভাবটাই মূল, তার প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি, শেষ দিকে চরম পরিণতি ; মরণের আরম্ভ শীর্ণ হওয়ার, বিকল হওয়ার ভাবে, মরণের প্রতিষ্ঠা প্রাণের অন্য দেহে যাবার যোগাড়ে, মরণের শেষ গ'লে খ'সে দেহ পাঁচ ভূতে মিশিয়ে যাবার ভাবে। বীজ ভাব, গর্ভ ভাব, উদ্ভেদ, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিপাক, বিকল ভাব, ছেড়ে যাওয়া, গলা খসা এই নয় ভাবে, নয় রঙ্গে, প্রকৃতির জীব ঘোরে ফেরে। এদের আবার প্রত্যেক ভাব ধ'রে তিনভাব, তাদের প্রত্যেকে ধ'রে তিন ভাব," এই রকম জন্ম স্থিতি মৃত্যুর রঙ্গ গ'ণা দায়। কোন ভাব হ'ল আবার কোথা থেকে, হ'তে আরম্ভ হ'ল কোথায়, হ'তে শেষ হ'ল কোথায়, এ 'অনন্ত' খণ্ডের জগতে তা চরমভাবে ধরার অধিকার কারুরই নেই। প্রতি ভাবে, প্রতি রঙ্গে, তিন তিন-ভাব। এই হিসাবে এই রঙ্গ থাকবার, এই রঙ্গ হবার, এই রঙ্গ যাবার, এ বলাও কঠিন। এক হিসাবে যেটা যাবার, অন্য হিসাবে সেটা হবার বা থাকবার।

এই রকম সর্ব্বত্র। সব রঙ্গের পেছুনে বস্তুর একবারে লোপ নেই, সে এক রকমে না এক রকমে থাকবে, এটার লক্ষণ নানা রকমে থাকে, নিজেকে তার নিজে জাহির করবার ঝোঁক আছে সেটা নানা রকমে বেরিয়ে পড়ে, অন্য সব বস্তুর সঙ্গে তার নানান্ দিক্ দিয়ে নানান্ টানও যে আছে সেটাও প্রকাশ পায়।

সচ্চিদানন্দ প্রাণের প্রকৃতির রঙ্গেও যেমন, অবিদ্যার রঙ্গেও ঠিক তেমনি। জগতের জ্ঞানের জন্ম ঠিক জানছি এই ভাবের 'অনুভবে', স্থিতি তার 'স্মৃতিতে', মরণ তার 'মোহে'। যখনই জানছি তখনই একটা ঠিক অনুভব ক'রছি, সেই জ্ঞানটা থেকে যাচ্চে স্মৃতিতে, ঘুচে যাচ্চে বুদ্ধির মোহে। রামের সঙ্গে পরিচয় হ'ল, রাম যে কে আর কি তা বুঝলাম, সেইটাই হ'ল রামের বিষয়ে আমার ঠিক 'অনুভব'। রামের কাছে থেকে অন্যত্র গেলাম, রাম আমার কাছে র'ইল না, তবু কোনও রকমে রামের কথা উঠলে রামের পরিচয় ম'নে প'ড়ল, সেইটাই রামের স্মৃতি। হঠাৎ একদিন ফের রামের সঙ্গে দেখা হ'ল, কিন্তু রামকে সেই রাম ব'লে চিনতে পারলাম না। এই খানেই বুদ্ধি মোহে প'ড়ল। আবার কোন রকমে ম'নে ক'রিয়ে দিতে পারলে রামকে ফের রাম ব'লে চেনা যায়। মোহেও স্মৃতি একবারে লোপ পায় না ব'লেই এমন হয়। মোহের পর স্মৃতির বশে আবার ঠিক অনুভবও প্রায়ই তাই ঘ'টতে দেখা যায়। জ্ঞানের ধারায় এই রকম ঠিক অনুভব স্মৃতি মোহ 'অবিদ্যার' রঙ্গ। স্মৃতিতেই জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ব'লে সমস্ত জ্ঞানকে স্মরণের ফল ব'লেই ধরা হয়। ঠিক অনুভব স্মৃতি মোহ জ্ঞানের এই তিন ভাবই আবার প্রত্যেক জগতের নিয়মে তিন তিন ধারায় প্রকাশ পায়। ঠিক অনুভব প্রকাশ পায় 'শ্রদ্ধায়' 'প্রত্যক্ষে' আর 'অনুমানে'। একটা গাছ আমার সুমুখে র'য়েছে আমি সেটার দিকে তাকিয়ে সেটাকে দেখতে লাগলাম। দেখবার সময় প্রাণে এ ভাবটা খুব জেগে উঠল, গাছটা দেখে আমি যা বুঝছি, সেটাতে সেই রকম বোঝবার ভাব নিশ্চয়ই আছে। দেখবার জ্ঞানের

ব্যাপারে প্রাণের এই বিশ্বাস, প্রাণের এই শ্রদ্ধাটাই হ'ল ঐ দেখার জ্ঞানের, গাছের বিষয়ে ঠিক অনুভবটার প্রাণ। এই শ্রদ্ধাতেই ঠিক অনুভবের স্থিতি। ঠিক অনুভবের জন্ম হয় প্রত্যক্ষে। গাছটা যেমন যেমনটি দেখলাম সেই জ্ঞানটুকুই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ঠিক অনুভব নেই হ'য়ে থাকে অনুমানের জ্ঞানে। গাছটা দেখে বুঝলাম দু এক দিনের মধ্যেই গাছে ফল হবে, এখন ফল নেই। ঐ রকম গাছের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ফল দেখে এসেচি, সেটা আমার জানা আছে, কাজেই সেই আপাতত নেই, এখন লুকান, জ্ঞানটার এই সময়ে জেগে ওঠার কোনও বাধা হ'ল না। গাছে এখন যেটা নেই সেই ভাবটা ঘ'টবে এই রকম বোঝা, এই রকম অনুভবটাই এখানে অনুমানের কাজ। দু এক দিনের মধ্যে ফল ফ'লবে এ জ্ঞানের মূলে অবশ্য স্মৃতি আছে, কিন্তু সে স্মৃতি অন্য রকমের, অন্য গছের বিষয়ে এ গাছের বিষয়ে নয়, অন্ততঃ আজকের গাছের অবস্থার বিষয়ে নয়। আজকের এই গাছের অবস্থায় দু এক দিনের মধ্যে ফল এটা কখনই স্মরণের বিষয় হ'তে পারে না। ঠিক অনুভবের যেমন এই তিনটি প্রকার, স্মৃতির তেমনি তিনটি প্রকার আছে। স্মৃতি আপনাতে আপনি বদ্ধ হ'য়ে থাকে ধারণার ভাবে, ধ্যানে বা ভাবনায় স্মৃতি আপনার ভাবের আপনি পরিচয় দেয়, বিচারে আলোচনায় স্মৃতির 'বিকটভাব', স্মৃতির এটার ওটার অভাবের কাজ, বোঝা যায়। গাছটা দেখে তার ভাব ম'নে ক'রে রেখে দিলাম সেইটা হ'ল ধারণা, সেটা গাছের স্মৃতিতে বাঁধা রইল, স্থায়ী র'য়ল। বিশেষ কারণে গাছটার কথা অন্য সময়ে যখন ভাবলাম, তখন গাছের স্মৃতিটে আছে বুঝলাম। গাছের কথা যখন তার পর আলোচনা ক'রতে লাগলাম, গাছটা এ রকম নয়, ঐ রকম, এই ভাবে যখন বিচার ক'রতে লাগলাম, তখন স্মৃতিতে যা নেই তাই তুলেই সেটা ক'রতে লাগলাম। স্মৃতির মতন আবার মোহেরও তিন ভাব, তিন ধারা। ভুলে যাওয়া, সন্দেহ করা, ভুল বোঝা এই তিন ধারায় মোহের পরিচয়। মরুভূমিতে একজন মরীচিকা দেখলে।

প্রথমে সে ভুলে গেল যে ঐ মরুতে খাঁটি জলের ভাব নেই, থাকতে পারে না। জলের মতন চক্চকে একটা দেখে সন্দেহ ক'রলে এটা জল না আর কিছু জলের মতন দেখাচ্চে। শেষে ভুল ক'রে ব'সল, এদিকে ওদিকে দূরের গাছ পালার প্রতিবিম্ব দেখে ম'নে ক'রে ব'সল এটা জলই বটে। মোহের বীজ হ'ল জলের ঠিক ভাব ওখানে নেই এইটে ভুলে যাওয়াতে। মোহ লুকিয়ে র'য়ল সন্দেহের ভেতর। মোহের পূর' পূরি প্রকাশ শেষ হ'ল ভুল জ্ঞানে। এই রকমে মোটামুটি জগতের জ্ঞানের নয় ধারা প্রত্যক্ষ, শ্রদ্ধা, অনুমান, ধারণা, ভাবনা, আলোচনা, বিস্মরণ, সংশয়, মিথ্যা জ্ঞান। এই নব রঙ্গের প্রত্যেকের আবার হবার যাবার থাকবার অশেষ রঙ্গ। সমস্ত জ্ঞানের তলার দিকে বাঁচতে হবে এই মূল স্থির জ্ঞানের নানা আকার, নিজেকে আমার এক জন ব'লে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হ'বে এই দুরন্ত জ্ঞানের নানা ভাব, কত বস্তুকে আমার ব'লে জানতে হবে এই বুদ্ধির নানান্ ধরণ, উল্‌টে পাল্‌টে থাকে। সব রঙ্গেই জ্ঞানের প্রাণে বিষয়ের জগতের বস্তুর ছাপ। থাকবার ভাবে প্রাণে বিষয়ের ছাপ এক রকমের; জানবার ভাবে অন্য রকমের, এইটুকু তফাৎ!

সুখের প্রাণ দুঃখে ঢুকে, প্রীতির প্রাণে অপ্রীতির ভাবে ম'জে, মানুষের ভোগ নয়রঙ্গ নয়রসে দাঁড় করায়। প্রাণকে ভাল বাসাই আনন্দ, আনন্দই ভালবাসা। সেই ভালবাসা মরণের জগতে পূর'পূরি ফুটতে না পেয়ে, প্রথমে অনুরাগ, মাঝে উৎসাহ, আর শেষে বৈরাগ্যভাব ধরে। ভালবাসার জন্ম প্রাণের উৎসাহে, ভালবাসা স্থির প্রাণের অনুরাগে, বৈরাগ্যে ভালবাসার লয়। অনুরাগের উচ্ছ্বাসের ধারে প্রাণের হাসি, অনুরাগের মরণের ধারে প্রাণের কান্না। উৎসাহের উৎকট প্রকাশের ধারে ক্রোধ, উৎসাহের নিবৃত্তির ধারে ভয়। বিস্ময়ে বৈরাগ্যের প্রকাশ, ঘৃণায় বৈরাগ্যের সর্ব্বনাশ। এই নয়রঙ্গেই ভোগের প্রাণে নয় রস। এক এক রস যে ভাবেই যেটা থাক, সেই ভাবেরই সঙ্গে আর দুটা থাকবে। এই হাসি, অনুরাগ, শোক, উৎসাহ, রোষ, ভয়, বিস্ময়, বৈরাগ্য, ঘৃণা এরা হওয়ার থাকার যাওয়ার হ'য়ে যে কত ধারায় বয় তা

ভাবাও এক অসাধ্য ব্যাপার। ভোগে বাঁচবার চেষ্টার স্বতঃসিদ্ধ ইচ্ছেকে ধ'রে বাঁচনের প্রবৃত্তির ধারা, ক্রমে এটা ওটা হ'ক এই মমতার ধারা, পরে এতে নয় ওতে মন বসানর ধারা, এই তিন ধারার সমস্ত রসের নিম্ন স্তরে স্থিতি। প্রাণ রাখবার জন্যে দেহ ধারণের ইচ্ছেয় নানান্ প্রবৃত্তি, আমার করবার ইচ্ছের নানান্ হারফেরে নানান্ মমতা, এটা ওটা চাই ধ'রে তাদের ওলট পালটে মন বসানর অশেষ ধারা। যে ধারাতেই কিন্তু বোক, সেই ধারাতেই ভোগের প্রাণে বিষয়ের অবস্থা ছাড়া আর কিছু জাগে না। প্রাণের ভেতরে দেহধারী ভূতের নানান্ ভাবের এতে নয় ওতে নানান্ আসক্তিতে নানান্ রসের নানান্ ভাবের ঢেউ।

আত্মহারা প্রাণের এইত ভাই জগতে সব রঙ্গ। প্রতি রঙ্গেই প্রাণের নিজের পাশে আত্মহারা ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের পাশে হারাণ ভাব ব'লে সব রঙ্গেই হওয়া যাওয়া থাকা। প্রাণ যদি পূর্ পূরি আপনার হ'য়ে থাকতে পারে, সকল প্রাণের যিনি প্রাণ তাঁর হ'য়ে, তাঁর ভাবে, তাঁর ভাগীদার হ'য়ে থাকতে পারে, তা হ'লে আর এসব রঙ্গ প্রাণে উঠতে পারে না, যদি ওঠে ত এরকম রঙ্গের ভাবে উঠতে পারে না। যেখানে প্রাণ ওলট পালট খায়নি, সেখানে প্রকৃতির রঙ্গ, অবিদ্যার রঙ্গ, অসুখের রঙ্গ, কোনও রকমে সম্ভবপর হ'তে পারে না। জগতের প্রাণই এই সব রঙ্গ ভোগ ক'রবে, জগৎ-ছাড়া প্রাণ কিছুতেই ক'রবে না। না করুক, কিন্তু জগতের প্রাণ যখন এই সব রঙ্গের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না, তখন কি ক'রে সেই প্রাণ জগৎ ছাড়া প্রাণের মহিমা ধ'রতে পারবে? আপনার ছেঁয়া কার সাধ্য লাতি মেরে পায়ে ঠেলে ফেলে দেয়? এ বড় তা হ'লে বিষম সমস্যা। সমস্যার উত্তর কিন্তু সমস্যার ভেতরেই। ছেঁয়াকে লাথিমেরে ফেলে দেওয়া না যাক, ছেঁয়াকে 'আমি' ব'লে কেউ বোঝে না, ছেঁয়া ব'লেই বোঝে। ছেঁয়ার অবস্থায় নিজেকে না ফেললে পায়ের তলাতে ছেঁয়া পড়ে না। প্রাণহারা প্রাণের রঙ্গকে

মরণের রঙ্গ ব'লে বোঝবার উপায় যার রঙ্গ তাতেই আছে। সে না থাকলে রঙ্গ ক'রবে কে? ছায়া ফেলবে কে? সব রঙ্গের মূলে প্রাণে শ্রদ্ধা, প্রাণে বিশ্বাস, প্রাণে ভক্তি যাবার নয়। সেই শ্রদ্ধা প্রাণে প্রাণে যত গাঢ় ক'রতে পারা যাবে, ততই প্রাণের মহিমা প্রাণে ফুটে উঠবে। সেই শ্রদ্ধায়, সেই ভাবে, সেই ভক্তিতে, রঙ্গের ভাবও খাঁটি প্রাণের ভাব হ'য়ে উঠবে।

(২৩)

প্রাণের সাড়া

কোনও জিনিষ আছে ব'লে জানতে হ'লে আগেই লোকে তার 'প্রমাণ' চায়। প্রমাণ পেয়ে তবে বস্তু সত্য সত্যই আছে ব'লে লোক মেনে নিতে পারে, নইলে পারে না। যা নেই তার প্রমাণ নেই, যা আছে তারই প্রমাণ আছে, দরকার হ'লে তারই প্রমাণ সবাই খোঁজে। এ অবস্থায় সত্য বস্তু যে প্রমাণে পাওয়া যাবে তাতে আর সন্দেহ করবার কিছুই নেই। যার জন্যে প্রমাণ খুঁজতে হয় প্রমাণে যদি তাই না পাওয়া গেল ত প্রমাণ আর প্রমাণ হ'ল কোথা থেকে? প্রাণই যদি সত্য সত্যই জগতে থাকবার জানবার ভোগ করবার পরম সত্য বস্তু হয়, তাহ'লে যে প্রমাণে এই প্রাণের সন্ধান না পাওয়া যাবে সে প্রমাণ প্রমাণ ব'লে ত কিছুতেই গণ্য হ'তে পারবে না। তবু বিজ্ঞ লোকের মুখে অনেক সময় শুনতে হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রাণকে পাবার জো নেই, অনুমানেও প্রাণকে ঠিক বোঝবার জো নেই; মনের কল্পনায় প্রাণ আসে না, বুদ্ধিতে প্রাণকে ধ'রতে পারা যায় না। প্রাণের রূপ নেই, রস নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই, স্পর্শ নেই, বিষয়ের কোনও

তারই নেই, প্রাণকে মনে জ্ঞানে ধ'রবে কি ক'রে বল ? মনে জ্ঞানে যা ধরা যায় তাতেই যে এক রকমে না এক রকমে বিষয়ের ভাব জড়ান, প্রাণে যখন তা থাকতে পারে না, তখন প্রাণ জগতের প্রমাণের অতীত। কথা ঠিক কথা বটে। কিন্তু বিষয়ের ভাব, মনের ভাব, বুদ্ধির ভাব, আসে কোথা থেকে ভাই ? প্রাণের তাড়া না থাকলে কোন্ ভাব কোথায় থাকত ? সব ভাবের মূলেই যে প্রাণের শক্তি জাজ্বল্যমান। সে প্রাণকে কোনও প্রমাণে পাওয়া যাবে না, এমন কি হ'তে পারে ? সব প্রমাণেই প্রাণকে পাওয়া যাবে; আর সব ভাবই প্রাণের সাক্ষী, প্রাণের প্রমাণ। এমন থাকবার ভাব নেই, এমন জানবার ভাব নেই, এমন ভোগের ভাব নেই যাতে প্রাণের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। সব ভাবের রঙ্গেই প্রাণ বিরাজ ক'রছেন, সব ভাবের রঙ্গ নিয়েই প্রাণ 'রঙ্গরাজ'। প্রত্যক্ষ অনুমান কেন সেই রঙ্গরাজকে তুমি অনুভবের সব ধারাতেই ভাসতে দেখবে, শুধু অনুভব কেন স্মৃতির সব ধারাতেও তিনি, এমন কি ভোলান মোহের সব ধারার আড়ালেও সেই 'ভোলানাথকে' ধ'রতে চাইলে তুমি ধ'রতে পারবে। জ্ঞানের রঙ্গেও যেমন থাকনের রঙ্গেও তেমনি। যে যেখানে যে রকমে থাকুক না কেন, তার অড়ালেই, সেই সর্ব্ব ব্যাপী 'বিষ্ণু' পুরুষ লুকিয়ে আছেন, জন্মের সব রঙ্গের মূলেই সেই 'বিধাতা' পুরুষ, মরণের সব রঙ্গের মূলেই সেই 'হর' মূর্ত্তি রুদ্র পুরুষ, আবার জীবনের সব রঙ্গের গোড়ায় সেই 'নিত্য' 'সনাতন' পুরুষ। ভোগের রঙ্গ গুলা ধর, সেখানেও দেখবে সব রঙ্গ ধ'রে আছেন সেই 'আনন্দ' ময় পুরুষটী, সব খেলা খেলছেন সেই এক 'লীলাময়' পুরুষ, ভোগের প্রবৃত্তির সব ধারাতেই সেই 'রসরাজ', ভোগের প্রতিষ্ঠার সব ধারাতেই সেই মহাসত্ত্ব মহাবিক্রম 'উরুক্রম' পুরুষ, ভোগের শান্তির প্রতি লীলাতেই সেই আদি মুনি 'নারায়ণ'। সব রঙ্গের ভেতর দিয়েই যে 'নটরাজকে' দেখতে পাওয়া যায়, চিনতে পাওয়া যায়, তিনি আছেন কিনা তাও আবার লোক সন্দেহ ক'রে, তারও আবার লোক প্রমাণ চায়, এ প্রমাণে, ও

প্রমাণে তাঁকে ধ'রতে পারা যায় না, একথাও লোক বলবার সাহস রাখে। এও বুঝি একটা রঙ্গ। ঠিক যে যে রকমটি আছে সেই রকমটি, তার 'মাত্রা'টি 'মেপে' দেয় 'প্রমাণ', তাকে 'মানিয়ে' দেয়, তাকে বুঝিয়ে দেয়, তার 'প্রমাণ', তাকে নিয়ে নাড়া চাড়া করে, তার খেলা খেলে, তাতে 'আমার' এই ভাব আনায়, মমতা 'অভিমান' জন্মায়, তার 'প্রমাণ'। প্রমাণ শুধু জানিয়ে খালাস ব'লে যারা চুপ করে, তারা প্রমাণের মাঝখানটা দেখিয়ে দুধার চাপে। প্রমাণ থাকারও মাপকাটী, ভোগেরও ভাতকাটি। ঐ যে চাঁদটা দেখছি, সূর্য্যটা দেখছি, প্রমাণ ব'লে দেবে ওরা আছে, আমি দেখি না দেখি, ঢাকা থাক, খোলা থাক, উঠে থাকুক; না উঠে থাকুক, ওরা আছে, প্রমাণ বুঝিয়ে দেবে আমায় যে ওরা আছে, প্রাণে ভিতরে ভিতরে আমায় ধ'রিয়ে দেবে যে ওরা জগতে আমার ভোগের জন্য, আমার কাজে লাগে, আমি ওদের আমার ব'লে অভিমান ক'রতে পারি এবং ক'রে থাকি। প্রমাণের তাই এই সঠিক রীতি, এতে আর গোল নেই। থাকার সাক্ষী প্রমাণ, জানার সাক্ষী প্রমাণ, ভোগের সাক্ষী প্রমাণ। এ সত্য কখনই অন্যথা হ'তে পারে না। জগতের সব রঙ্গে, মরণের খেলায়, প্রাণের ইসাড়া, প্রাণের ইঙ্গিত, প্রাণের চালনা আছে, এর প্রমাণ দেখতে হ'লে সুতরাং ধ'রিয়ে দিতে হবে জগতের সব ভাবেই, সব ভাবের আড়ালেই, প্রাণের ভাব। খাঁটি প্রাণের ভাব অবশ্য জানই, ভাই, ঠিক হ'য়ে থাকবার ঠিক বুঝে জানবার, ঠিক খেল খেলবার। জগতের ভাবে প্রাণের প্রমাণে কাজেই আর কিছু নয় কেবল এই মানতে হবে, যে সব ভাবের গোড়াতেই একটা মস্ত 'আছে' ভাব, একটা ঠিক জানবার ভাব, একটা সুন্দর ভোগের ভাব। জগতে যা কিছু হয়, যা কিছু জানি, যা কিছু ভোগ করি, সেটা ঠিক রকমে ঘ'টুক আর নাই ঘটুক, ঠিক বুঝতে পারি আর নাই পারি, ঠিক সেটা আমার পূর পূরি ভোগে লাগুক আর নাই লাগুক, সেটা ঘ'টেছে একটা কিছু আছে তাই ধ'রে, সেই

যেটা আছে সেটা জানবার বটে, বোঝবার বটে, একটা মায়া, একটা ছলনা নয়, সেটাকে আমার ক'র্ত্তে পারবারই জিনিষ। জগতের ভাবে প্রাণের প্রমাণে এ ছাড়া আর কিছু মানাবে না। তবেই দাঁড়াল জগতের ভাবের, মরণের খেলার প্রমাণের আড়ালেই প্রাণকে পাব। ভাবের প্রাণই তার প্রমাণ, প্রমাণই তার প্রাণ। প্রাণ ছাড়া প্রমাণ পাবনা, প্রমাণ ছাড়া প্রাণ পাব না। আমার প্রাণ এই ভাবের প্রাণকে ধ'রবে, আমার প্রাণের প্রমাণ ভাবের প্রাণের প্রমাণের সন্ধান দেবে, কেননা এক ধারায় না থাকলে একটা অপরের খোঁজ ব'লে দিতে পারে না। আমার প্রাণের ঠিক আছি ভাবটুকুর সঙ্গে অন্য জিনিষের, অন্য ঘটনার, থাকার ভাব মিশিয়ে যাবে, আমার প্রাণকে জানবার ভাবের সঙ্গে অন্য জিনিষের আড়ালে যে প্রাণ তাকে জানবার তার জানবার ভাব মিলে যাবে, আমার প্রাণের খেলায় প্রাণের রঙ্গে অপর জিনিষের প্রাণের খেলা প্রাণের রঙ্গ এক স্রোতে বইতে থাকবে। এই বার একবার বেশ ক'রে বুঝে সুঝে দেখ দেখি ভাই জগতে মরণের লীলার প্রত্যেক ধারায় আমার থাকার প্রমাণে প্রাণের থাকবার প্রমাণ, আমাকে জানবার প্রমাণে তাকে জানবার প্রমাণ, আমার ভোগের প্রমাণে তাকে ভোগে লাগাবার লালসার প্রমাণ পাও কি না? যদি সব জায়গায় ধ'রতে পারলে কিছু জানবার ভোগ করবার র'য়েছে, তা হ'লে আর তোমার সব জায়গায় প্রাণের প্রমাণ, প্রাণের সন্ধান, পেতে আর বাকী রইল না। আমার প্রাণ যেমন আছে ব'লেই আমায় থাকায়, জানে ব'লেই জানায়, আনন্দে আছে ব'লেই আনন্দ করাতে চায়; যেখানে প্রাণের সন্ধান পাব, তা সব জায়গাতেই প্রাণের সন্ধান পাব, সেই খানেই, সেই সব জায়গাতেই, ধ'রব সেও থাকে ব'লেই থাকায়, জানে বলেই জানায়, ভোগ করে ব'লেই ভোগে লাগায়। প্রমাণের এই রঙ্গ আপনা আপনিই প্রকাশ পায়, এ স্বতঃসিদ্ধ। আমার থাকবার শক্তি থেকে অপরের থাকবার শক্তি, আমার জানবার শক্তি থেকে অপরের জানবার শক্তি, আমার ভোগের শক্তি থেকে

অপরের ভোগের শক্তি, আপনার মনে, আপনার 'মানে', স্বতঃ প্রমাণে বুঝে নেবার জন্যে কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, কেননা সব জায়গাতেই প্রাণে প্রাণ মিশে যায়, প্রাণ প্রাণকে বেঁধে আনে। আমি আগে আমাতেই আছি, আমাকেই জানি, আমাতেই স্ফূর্ত্তি পাই, তবে তার পরে জগৎ নিয়ে থাকি, জগৎ জানি, জগতে ভোগ লালসা করি। যাকে নিয়ে থাকি সে আমার কাছে আমার সংসর্গে এসে নিজের হয়, তারই জন্যে তাকে আড়াল থেকে আমাকে নিশ্চয়ই জানতে হয়, জেনে নিজেকে জানাতে হয়, আর সেই রকমেই নিজে তাকে ব্যবহারে এসে ভোগের ব্যবহারে লাগাতে হয়। না জানলে, ব্যবহার করবার লালসা না থাকলে, কেউ কারুর সংসর্গে আসে না, আপনার হয় না, কাছে থাকে না। বোঝবার ইচ্ছে থাকলে এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ঐ গোরুটা ওখানে চ'রে বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে মাঠের এধারে ওধারে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে, দেখছি। ওই গোরুটা যে ঐ রকম র'য়েছে, ওতে প্রাণের সন্ধান পাই ব'লে বলি। কেন ব'লি ভাব দেখি। প্রাণের ত পরিচয় থাকায় জানায় ভোগে। একটা কিছু থাকবে, বুঝে সুঝে থাকবে করবে, আর তাতেই স্ফূর্ত্তি পাবে, এ না হ'লে আর প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেল ব'লে বলা চ'লবে না। গোরুটা ঐ রকম র'য়েছে দেখে যখন ব'লি ওই ঘটে প্রাণ আছে, তখন নিশ্চয়ই নিজের প্রাণে স্থির করি, ঐ প্রাণের, ঐ গোরুর প্রাণের, থাকাটা, বুঝে সুঝে করাটা, আর তাতে স্ফূর্ত্তি পাওয়াটা, আমার প্রাণের থাকার, বুঝে সুঝে করবার, স্ফূর্ত্তি পাবার ভাবের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে, আমি থাকলে যা করি, যেমন আনন্দ পাই, যেমন হুঁসিয়ার হই, গোরুটার ওই চ'রে বেড়ানর সঙ্গে সেই সব প্রাণেরই ভাব র'য়েছে ব'লে আমি ধ'রতে পাচ্ছি। ও বুঝে সুঝে যেখানে ভাল ঘাস খেয়ে প্রাণের স্ফূর্ত্তি পাবে ঠিক সেইখানে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ওর ওই প্রাণের প্রমাণে, আমার প্রাণের ভাব মেপে, তার পরে, তার পশ্চাতে, ওর প্রাণের সন্ধান

পাওয়ার ভাব আছে ব'লে এই প্রাণটা 'অনুমান বটে, কিন্তু 'অনুমান' হ'লেও অকাট্য প্রমাণ। সাক্ষাৎ দেখে শুনে প্রত্যক্ষ জিনিষে যেমন 'আস্থা' হয়, আছে ব'লে ঠিক করা হয়, নিজের প্রাণের চালনায়, করায়, জানায়, ভোগে, যেমন 'আস্থা' জন্মায়, এই অনুমানেও তেমনই আস্থা জ'ন্মে থাকে। থাকে তার কারণ আর কিছুই নয়, সব প্রমাণের মূলই প্রাণের 'আস্থা', নিজের আছি জানি স্ফূর্ত্তি পাই, অপরের কাছে নিজেকে থাকাই, নিজেকে জানাই, নিজেকে স্ফূর্ত্তি পাও-য়াই, এই ভাবের সঙ্গে, অপরের থাকার, জানবার, স্ফূর্ত্তি পাবার এবং থাকাবার জানাবার স্ফূর্ত্তি পাওয়াবার ভাব ধরবার 'বিশ্বাস' বরাবর প্রাণে জ্বল জ্বল ক'রতে থাকে। প্রাণই আস্থা, প্রাণই 'বিশ্বাস', প্রাণই তাই প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান আস্থা এরা মূলে সবই এক প্রাণের সাড়া ছাড়া কিছুই নয়। একেই তিন, তিনেই এক। এক স্রোতের তিন ধারা। আলাদা আলাদা কেউ নয়, একটার সঙ্গে অপরটা জ'ড়িয়ে না থেকে পারে না। যেখানে দেখি শুনি সেখানেও নিজের প্রাণের প্রমাণে থাকা বুঝে তবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস করি; যেখানে অনুমান করি, আন্দাজ করি, যেখানেও থাকার আন্দাজ ক'রেই তাতে আস্থা করি; যেখানে কেবল বিশ্বাস কেবল শ্রদ্ধা, সেখানেও নিজের প্রাণের অনুমানে থাকারই বিশ্বাস, 'আস্তিক্য বুদ্ধি'। ঐ গোরুটা দেখেও প্রাণে যে 'আস্তিক্য বুদ্ধি', প্রাণের প্রমাণ, নদীর ওপর গোরুর ছায়াটা দেখেও গোরু আছে অনুমান ক'রেও তেমনি গোরুর বিষয়ে 'আস্তিক্য বুদ্ধি', প্রাণের প্রমাণ, আবার আমার ছেলের মুখে ওখানে গোরুটা আছে শুনে সেই কথা বিশ্বাস ক'রে গোরুটার থাকার সম্বন্ধে প্রাণের 'স্থির ধারণা'।

খটকা উঠতে পারে, একটা প্রাণীর বুঝে শুঝে থেকে নিজের প্রাণ ভোগ করবার রীতি ধ'রে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অনুমানে-বা বিশ্বাসে প্রাণের সন্ধান না হয় পাওয়া গেল, কিন্তু যেটা প্রাণী নয়, অপ্রাণী, তার ব্যাপারে প্রাণের সন্ধান কি ক'রে পাওয়া যাবে, প্রমাণই বা কি ক'রে

খাটবে ? আকাশে মেঘ দেখলাম, কড় কড় ক'রে বিদ্যুৎ চম্‌কে মেঘ ডাকছে শুনলাম, বৃষ্টি এইবার হবে 'অনুমান' ক'রলাম, মেঘের আড়ালে জল আছে বিশ্বাস করলাম, এখানে প্রাণের সন্ধান কৈ ? প্রমাণ ত পাচ্চি, প্রাণ কৈ ? যেখানে প্রমাণ সেই খানেই প্রাণ এ নিয়ম এখানে খাটে কৈ ? মেঘের আড়ালে, মেঘের ডাকের আড়ালে, জলের আড়ালে, প্রাণ আছে কি ? আছে বৈকি ভাই। একটু ত'লিয়ে দেখ দেখতে পাবে, ধ'রতে পারবে।

মেঘ হবার, শব্দ হবার, জল হবার ব্যবস্থাটা ভাব দেখি, বুঝবে আড়ালে প্রাণ না থাকলে ও ব্যবস্থা হ'তেই পারে না। সূর্য্যের তাপে পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর জলাশয় থেকে, সাত সমুদ্র তের নদী থেকে, রাশি রাশি জল বাষ্প হ'য়ে কণায় কণায় জ'ড়িয়ে ক্রমে মেঘের আকার ধ'রলে, খণ্ড খণ্ড মেঘ ছোটয় বড়য় পৃথিবীর দশদিকে ছ'ড়িয়ে প'ড়ল, পৃথিবীর প্রাণের শক্তির টানেই হক, আর পরস্পরের টানেই হ'ক, নিজের ভেতরে নিজের আড়ালে যে মস্ত একটা শক্তি খেলা ক'রছে সেটা দেখালে, সেটা জগৎকে শোনালে, বিদ্যুৎ চমকাল, কড় কড় শব্দ হ'ল, দেখতে দেখতে ঝম ঝম বৃষ্টি প'ড়তে লাগল, পৃথিবীর ময়লা জল দিব্য পাকা বন্দোবস্তয় পরিষ্কার হ'য়ে জগৎকে অন্ন জল দেবার জন্যে, প্রাণ দেবার জন্যে, ফিরে ঘুরে এল। বোঝ দেখি ভাই একটা মস্ত বুদ্ধিমানের মাথা, যে থাকতে জানে, থাকাতে জানে, জগৎকে ভোগ ক'রতে জানে, ভোগ করাতে জানে, এমন একটা প্রাণীর মাথা এই ব্যবস্থার ভেতরে খেলছে কিনা ? একদিন নয়, দুদিন নয়, সারা বছর ধ'রে, বছরের পর বছর ধ'রে, যুগের পর যুগ ধ'রে, অনন্ত কাল ধ'রে, এ দেশ ও দেশ সব দেশ ধ'রে, সারা জগৎ জুড়ে এই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ র'য়েছে, এমন ব্যবস্থা কি হঠাৎ হ'তে পারে ? মেঘের আড়ালে প্রকাণ্ড দেবতা, মস্ত প্রাণী, মহাশক্তি ধ'রে আছে এক মেঘবাহন, সেই তার হাতে ধ'রে আছে ঐ বিদ্যুতের শক্তি, সেই 'বজ্রপাণি। তারই শাসনে মেঘের ঐ সব ব্যবস্থা। জল বাষ্প হয়, বাষ্প মেঘ হয়, মেঘে বিদ্যুৎ

শক্তির আবেশ হয়, বিদ্যুৎ শক্তির আস্ফালনে মহাতেজের বিকাশ হয়, ঘোর ঘন নির্ঘোষে জগৎ চমকিত হয়, শেষে বৃষ্টির জলে জগতের ভূতগণের বাঁচবার অবকাশ হয়, ঐ মেঘবাহ দেবতার অনুগ্রহে, তারই ব্যবস্থায়। অনন্ত আকাশের একটা মহাস্তর ব্যেপে স্থূল সূক্ষ অণু পরমাণু আকারে ছড়ান বিরাট্ মেঘ-মণ্ডলই ওই মেঘবাহ প্রাণীর বিরাট্ শরীর। অদল বদলের অনন্ত প্রবাহের মধ্যেও ঐ শরীর অটুট। মেঘের আড়ালেও যেমন, জগতের সব শক্তির আড়ালেও তেমনি। জগতের ভাবে, জগতের রকমে যত কিছু স্বভাবের ব্যপারে 'প্রকৃতির' ঘটনা সবটার আড়ালেই, একটা না একটা মস্ত প্রাণেরই খবর নিতে হবে। প্রকৃতির সবের আড়ালে সব দেদীপ্যমান দেবতা। বিনা প্রাণে ক্রিয়া নেই, বিনা প্রাণে জ্ঞানের কাজ নেই, বিনা প্রাণে ভোগের ব্যবস্থা নেই। চেতন অচেতন জগতের সব বস্তুর আড়ালেই প্রাণ। সব বস্তুই কাজের পরিচয় দেয়, জ্ঞানের পরিচয় দেয়, ভোগের বব্যস্থার পরিচয় দেয়। 'সচ্চিদানন্দের' ব্যবস্থা জগতের সব স্তরে। খণ্ড আকারে প্রাণ না দেখতে পেয়ে খণ্ডটাকে ব'লি আমরা অপ্রাণী, কিন্তু খণ্ড খণ্ড জড়' ক'রে সব জড়ের মাঝে থাকে প্রাণ, প্রাণী। জগতে এই 'জড়' শক্তির অসংখ্য ধারা, তাই তেত্রিশ কোটি 'জড়' দেবতা।

প্রাণী অপ্রাণী সকল বস্তুরই থাকবার যে ধারা ধ'রেই আলোচনা কর, দেখবে আড়ালে আড়ালে সব জায়গায় প্রাণ। সব জিনিষেরই সৃষ্টি স্থিতি লয়, হওয়া যাওয়া থাকা, এই সব ধারাতেই জ্ঞানের ব্যবস্থা, জ্ঞানীর ব্যবস্থা, ভোগের ব্যবস্থা, ভোগীর ব্যবস্থা, প্রাণের ব্যবস্থা প্রাণীর ব্যবস্থা। একটা কিছু হ'তে আরম্ভ ক'রলে, হ'ল, তার হওয়া শেষ হ'ল, থাকতে আরম্ভ করলে, থাকতে থাকল, তার থাকা শেষ হ'ল, ক্ষইতে আরম্ভ করলে, ক্ষইতে থাকল, তার ক্ষয়া শেষ হল, বস্তুর এই নব দশাতেই প্রাণের নব নব ভাব। মরণের ধরণ দেখলেও বুঝতে বাকি থাকে না সেটা জীবনেরই রঙ্গ। চেতন অচেতন ম'রে কারুরই নিষ্কৃতি নেই। একবারে শেষ, একবারে নির্ব্বাণ কেউ পায়

না। মানুষ ম'ল, তার অচেতন দেহখণ্ড পাঁচ ভূতে মিশুল, পাঁচ ভূত নিয়ে পাঁচ রকমে খেলা ক'রতে লাগল, তার প্রাণ অন্য দেহের সন্ধানে ছুটল, অন্য দেহ ধ'রলে, পাঁচ ভূতের অন্য অন্য খণ্ড জড় ক'রে নিজের জড় দেহ সাজিয়ে নিলে, নিয়ে আবার চেতন দেহী হ'য়ে ব'সল। ইটখানা ভেঙ্গে গেল, খড়ের চালখানা পুড়ে গেল, গেল ব'লে একবারে গেল না, কণায় কণায় খণ্ড খণ্ড হ'য়ে জগৎ জোড়া পাঁচ ভূতের মস্ত মস্ত দেহে গিয়ে স্থান পেলে। মরণ নামেই মরণ, জীবনেরই একটা প্রকার মাত্র, সমস্ত দেহীর প্রকৃতিই ওই। ঠিক কথা ব'লতে কি জীবনের একটা ধারই মরণ। প্রতি পদেই বস্তু হ'চ্চে আর ম'রচে, সমস্ত থাকার স্রোতের ভেতরে এই হওয়া মরার দুটা ধারা চ'লছে। সব জিনিষই ক্ষণস্থায়ী এটাও ঠিক, সব জিনিষ একভাবে না একভাবে চিরজীবী এটাও ঠিক। প্রতি পদে জীবন স'রে স'রে 'সংসারে' মরণের রঙ্গ দেখাচ্চে। নিজে যা নয় তাই ব'লে জগতের কাছে নিজেকে পদে পদে দেখিয়ে প্রাণ মায়ার খেলা খেলছে। মায়ী প্রাণ, তারই এই মস্ত খেলা খেলবার 'ক্ষমতা' আছে ব'লে সে 'মহেশ্বর'। নিজের প্রাণ জ'ড়িয়ে ধ'রে থাক ভাই এ ছলনায় ভুলবে না চেতন জীবের জানবার ধারায় প্রাণের পরিচয়, সচ্চিদানন্দ ভাবের পরিচয় পেতে বড় বিলম্ব হয় না। তুমি আমি আর তোমার আমার মত যত কিছু চেতন আছে, সবাই যখন জানে, যখন জেনে রেখে দেয়, যখন জানা হারায়, জানার সেই হওয়া থাকা মরণ, সৃষ্টি স্থিতি লয়, এই সব অবস্থাতেই প্রাণের পরিচয় না দিয়ে পারে না, জানার সঙ্গে থাকার ভোগ করবার পরিচয় দেবেই দেবে। অনুভব, স্মৃতি, মোহ, জ্ঞানের তিন ধারাতেই সচ্চিদানন্দ প্রাণ জাজ্বল্যমান। অনুভবও আবার হ'তে থাকতে যেতে জানে, স্মৃতিও হ'তে থাকতে যেতে জানে, মোহও হ'তে থাকতে যেতে জানে। সুতরাং জ্ঞানের যে নয়টা ধারা, এই নয় ধারাতেই সচ্চিদানন্দ ভাবের প্রাণ পাবে। অনুভব যখন আছে তখন 'প্রত্যক্ষ' তখনও তার সঙ্গে থাকা আর আনন্দ করা; অনুভব যখন নেই মত

তখন অনুমান, তখনও তার সঙ্গে থাকা আর আনন্দ করা; প্রত্যক্ষ নেই অনুমান নেই অথচ যেন জানচি জানচি এ অনুভবের ভাবে মূলে মস্ত একটা যে আস্থা, প্রত্যয়, বিশ্বাস, তার সঙ্গেও চেতন জীবের থাকার আর আনন্দের রঙ্গ না থেকেই পারে না। স্মৃতি যখন জন্মাল, জগতের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধের পরিচয় ধারণায় ধরাল, আবার যখন সেই ধারণা নানান্ রকমের ধারণার সঙ্গে জড়' ক'রে জগতের নানান্ সম্বন্ধের পরিচয় মত হ'ল না হ'ল না এই নানান্ রকমের আলোচনা যুক্তি বিতর্ক চা'লাল, অথবা যখন গুটিয়ে নিয়ে নিজেতে ব'সে চিন্তার স্রোতে 'ধ্যানস্থ' 'সমাধিস্থ' হ'ল, সেই সব অবস্থাতেই জীবনের থাকবার আর ভোগ করবার ভাবও বেশ দেখিয়ে দিলে। তার পর মোহের ধারাগুলা ধ'রলেও ঠিক এই রকমই ধ'রতে পারা যায়। মোহ হ'ল, বিস্মৃতি ঘ'টল, জগতের সঙ্গে একটা একরকম সম্বন্ধের বাঁধন, জানবার ধারায় সম্বন্ধের বাঁধন, টুটে গেল, জানবার এই ওই সম্বন্ধ হারিয়ে, নানান্ সম্বন্ধের বিস্মরণে এ বুঝি নয় এই রকম সন্দেহ চারিদিকেই নানা রকমে ঘ'টে যেতে লাগল, শেষে সাড়ি সাড়ি ভ্রম গেঁথে যেতে লাগল, জগতের সঙ্গে নানান্ সম্বন্ধ ভুলে মোহ মহামোহে 'আহুতি' দিয়ে ব'সল, মোহে জ্ঞানের চরম বিনাশ দাঁড়িয়ে গেল। বিস্মৃতি, সন্দেহ, আর ভ্রমের রূপে, মোহের এই সব ধারাতেই আবার আর দুটা ভাব, জীবনের আর ভোগের ভাব, নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেই দেখতে পাবে। বেঁচে আমার ভোগ হবে এই ভাব ছেড়ে আমার প্রত্যক্ষও নেই, অনুমানও নেই, বিশ্বাসও নেই। যে ধারণাই করি, যে আলোচনাই করি, যে চিন্তাতেই ডুবি, নিজের ভোগ আর নিজের বাঁচন নিয়েই সে সব করি। বাঁচনের সঙ্গে আর ভোগের সঙ্গেই পদে পদে ভুলে যাচ্ছি, ভুল চুক কচ্ছি, আর জগতের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ঘ'টছে তাতেই সেই সম্বন্ধ নয় এই রকম সন্দেহ ক'রছি। আমার মতনই সবাই, সবাইকেরই এই একই গতি। সবাই বাঁচতে

আর ভোগ ক'রতেই জানবার নব রঙ্গের অভিনয় করে। জ্ঞানের নয় রঙ্গেই জীব সচ্চিদানন্দ প্রাণের লক্ষণ বিকাশ করে।

অচেতন অজ্ঞান বস্তু ব'লে যারা মোটামুটি ভাবে জগতে পরিচিত, তাদেরও জ্ঞান আছে, চৈতন্য আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভোগ আর জীবনও আছে। অজ্ঞানের আড়ালে চেতন না থাকলে অচেতন চেতনের জ্ঞানে ঢুকতেই পারে না। জানবার ধারায় না মিশলে জ্ঞান হবে কোথা থেকে? যাকে জানি সে জানায় বলেই জানি। আমিও জানতে গিয়ে তার জ্ঞানের কাছে নিজেকে ধরা দিই, সেও আমাকে এক রকমে না এক রকমে জেনে নিজেকে জানায়। জ্ঞানের দড়ীতেই জ্ঞানের বাঁধন, অন্য রকমে জ্ঞানের সম্বন্ধ সম্ভবে না। জড়ের যেখানে একটা বিশেষ ভাবও না পাওয়া যাবে, সেখানে অন্ততঃ তার পঞ্চ ভূতের মহা অধিষ্ঠানে চৈতন্যময় জ্ঞানা প্রাণী থেকে তাকে জানাচ্ছে, জানতে দিচ্ছে, ভোগ করাচ্ছে, ভোগ ক'রতে দিচ্ছে, থাকাচ্ছে, থাকতে দিচ্ছে। আর কিছু না হ'লেও পঞ্চভূতের জাজ্বল্যমান দেবতারা জড় নিয়ে জগতে জীবের জানবার থাকবার ভোগ করবার সমস্ত সম্বন্ধ পাতিয়ে রেখে যাচ্ছে। যেখানে বিশেষ প্রাণের অধিষ্ঠান সম্ভব সেখানে অচেতনের আড়ালে সেই বিশেষ প্রাণই পরোক্ষ ভাবে এই জানবার থাকবার ভোগের কারবার চালিয়ে যায়। গাছের আড়ালে গাছের প্রাণে বৃক্ষদেবতার, মেঘের আড়ালে মেঘবাহ দেবতার, সন্ধান ক'রে, গাছের আর মেঘের সমস্ত জ্ঞানের কার্য্যের সঙ্গে জীবনের আর ভোগের কার্য্য বুঝতে হবে। মোটের ওপর জড় নিয়ে জড় দেহকে সামনে রেখে, জগতের সর্ব্বত্রই প্রাণদেবতা জানছে, জানাচ্ছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ ক'রছে ভোগ করাচ্ছে, থাকছে অপরকে থাকাচ্ছে। আসল ভাবলে অজ্ঞান অচেতন জড় একবারেই নেই। সব ঘটের অধিষ্ঠানেই জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানে সচ্চিদানন্দের বিকাশ, প্রাণের বিকাশ। সব ঘটেই অধিষ্ঠানের জ্ঞানের নয় ধারা তাই নিজের ঘটের অধিষ্ঠানে নয় ধারা ধ'রে ধ'রে নিতে হয়।

চেতন অচেতনের থাকার আর জানবার নয় নয় ধারা ধ'রে আলোচনা ক'রে যেমন সচ্চিদানন্দ প্রাণের সব ঘটে পরিচয় পাওয়া গেল, এদের ভোগের ধারাগুলা আলোচনা ক'রলেও তেমনি পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রীতিতে, আপনার পূর্ণতার ইচ্ছায়, আপনার যা কিছু সেই সবাইকে নিয়ে আপনার ক'রে আপনার 'আত্মাকে' জগতের চারিদিকের সম্বন্ধে বাঁধবার ইচ্ছায় জীবের ভোগ, জীবের আনন্দ। আপনারই একটা ধার না হ'লে অপরকে নিয়ে, অপরের সম্বন্ধে নিজেকে বেঁধে, জীব আত্মপ্রীতি, আত্মপূর্ণতা, পেতে চাইতে পারে না। জগতের যে দিকে তাকান যায়, সেই দিকেই, সবই, এক রকমে না এক রকমে, আর আর সবাইয়ের সঙ্গে পরিচয় পাতিয়ে, সম্বন্ধ ক'রে, নিজেকে নিজেকে প্রকাশ করবার যেন চেষ্টা ক'রছে। জগতের সব ঘটেই ভোগের লক্ষণ জাজ্বল্যমান। চেতনে স্পষ্ট, অচেতনে অস্পষ্ট এই মাত্র বিশেষ। চেতনগুলা স্পষ্টই দেখা যায় ভোগের বাসনার নানান্ খেলায় মেতে র'য়েছে। ভেবে দেখলে অচেতনেরও সেই দশা। জানই ভাই ভোগ-বাসনার হওয়ায় থাকায় যাওয়ায় অনুরাগের উৎসাহের শান্তির ছায়া। অনুরাগের দুইধারে ঐ ভোগের উঠন পড়নে প্রাণের হাসি প্রাণের কান্না। উৎসাহের দুইধারে ভোগের তীব্র বেগে ক্রোধ, ভোগের স্খলনে ভয়। ভোগের প্রতি পদে চরমে অদ্ভুত রঙ্গে বিস্ময়, আর ছুটাছুটি ক'রে হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে মনের মতনটি না পেয়ে ঘৃণা, এই দুইনিয়ে ভোগ যাবার মত হ'য়ে শান্তির ধারায় ব'ইতে থাকে। অনুরাগ হাঁসি কান্না ক্রোধ উৎসাহ ভয় বিস্ময় ঘৃণা শান্তি ভোগের এই নয় ধারার দুই দিক্ দিয়েই আবার প্রাণের বাঁচবার আর জানবার প্রবাহ। সচ্চিদানন্দ প্রাণ ভোগের প্রতি স্তরেই। আমি যেটা ভালবাসি, যেটা প্রাণে ভোগ ক'রতে চাই, সেটা ভোগ করবার পথ জেনে ভোগে বাঁধতে চাই, সেই ভোগের তৃপ্তিতে প্রাণের উচ্ছ্বাসের স্তানে প্রাণের হাসি হাসি, ভোগের ত্রুটিতে প্রাণ যে যায়, প্রাণকে কি ক'রে ধ'রে রাখব, এই বাঁচনের পথ জানবার চেষ্টায় কেঁদে প্রাণকে

বাঁচিয়ে ভোগ ক'রতে পারব ব'লে কেঁদে বাঁচি। প্রাণের আনন্দ প্রাণের ভোগ পেয়ে। ওইটেতে বাঁচার মত বাঁচতে পারব ব'লে যেখানে বুঝি, সেইটের জন্য কতটা উৎসাহী হই, আবার সেই ভোগের, সেই বাঁচবার মতন বাঁচবার, পথে যেমন একটু বাধা বিঘ্ন এসে পড়ে, অমনি সেই বাধা বিঘ্নটাকে, আমার সেই প্রাণে বাঁচবার, প্রাণের ভোগের, হন্তা জেনে, তার ওপর রেগে উঠি, আর যদি বুঝি সেই হন্তা, সেই বিঘ্ন বড় প্রবল, হয়ত সেই ভোগে বাঁচবার মতন বাঁচাটা বিঘ্ন থাকতে ঘ'টবেনা, তখন ভয়ে ব্যাকুল হ'য়ে প'ড়ে প্রাণকে অমনি অমনি বাঁচিয়ে রেখে, সেই বাঁচনের সুখ টুকু বজায় রাখতে পারব কিসে, তাই ভাবতে থাকি, তারই জন্যে ব্যস্ত হই। যা ভাবিনে, প্রতিপদে, জীবনের ধারায়, জীবনের ভোগের বাঁচায়, তাই ঘ'টে ওঠে দেখে, গতিক বুঝে পদে পদেই আশ্চর্য্য মানি, যেটা, আমার ব'লে ভাবি, আমার জীবনের সঙ্গে আমার ভোগের সাথী ব'লে মনে করি, সেটা দেখতে দেখতে আর আমার থাকছে না দেখে আর ওটা নিয়ে প্রাণের বাঁচা চাইনে, বুদ্ধিতে তাই স্থির ক'রে, যেটা আমার হ'য়ে আমার র'য়ল না, সেটার ওপর ঘৃণা এনে ফেলে, যেটা নিজের হ'য়ে থাকবে তাই ভোগ ক'রব, তাই নিয়ে বাঁচব ভেবে প্রাণকে ঠাণ্ডা করি, শেষে প্রতি মুহূর্ত্তে সব ভোগে এ রকম ঠ'কে প্রাণের খাঁটি নিজস্ব নিয়েই প্রাণ বাঁচিয়ে রাখব, আনন্দ ক'রব, এই মনে স্থির ক'রে, সংসারের অস্থায়ী ভোগের বাসনা ছেড়ে, শান্তির কোলে আশ্রয় নিই। সংসারে প্রাণের পূর্ণতার ভাবের, আত্মপ্রীতির মহা-রসের, নয় প্রবাহের প্রতি প্রবাহেরই, দুই ধার দিয়ে এমনি প্রাণ বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টার ধারা, জীবনের ধারা, আর প্রাণে বাঁচতে জানবার চেষ্টার ধারা, সতর্ক হবার ধারা, চ'লেছে। চেতন অচেতন যেখানে ভোগ সেই খানেই সচ্চিদানন্দের ভোগ, প্রাণের ভোগ। প্রাণ ব্যতীত ভোগ সম্ভবেনা, ভোগ ব্যতীত প্রাণ সম্ভবে না। যে ভোগ করে সে ভোগ করায়, যাকে ভোগ করে সেও

ভোগ করে। প্রাণে প্রাণেই ভোগ, জড়ের ভোগ নেই। জড়কে ভোগ ক'রি ব'লে যখন বুঝি, তখন ভুল বুঝি। ভোগ প্রাণের নিজস্ব। প্রাণ ছেড়ে ভোগ হবে কেন? জড়ের পেছনে জড়ের ভোগে জড়ের প্রাণকেই খুঁজতে হয়। প্রতি ভোগেই প্রাণ জেগে উঠছে। থাকা জানা ভোগ যাকে ধ'রেই আপনাকে নির্ব্বাহ করুক না কেন, সেই খানেই প্রাণকে সকল রকমে জাগাবে।

যেখানে থাকা, যেখানে চেতনা, যেখানে ভোগ, সেই খানেই প্রাণের ত সাড়া পাওয়া গেল, আর যেখানে যা কিছু সেই খানেই প্রাণের অধিষ্ঠানও ত বোঝা গেল, কিন্তু সবই যে এক, অনন্ত খণ্ডে খণ্ডে এক এক হ'য়েও সব যে এক, তার কিছু পরিচয় পেলে কি ভাই? ক্ষুদ্রো-দপি ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র ভাবেও প্রাণ, ক্ষুদ্র থেকেও বৃহৎ, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর, বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম ভাবেও প্রাণ এটা বুঝলে কি? এক প্রাণই অণু থেকে অণু, আবার মহান্ থেকে মহান্, এটা ধ'রতে পারলে কি? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটা বাষ্পবিন্দু নিজেতেই নিজে আছে, সেই গুলা কতকগুলা নিয়ে এক খণ্ড মেঘ, কতকগুলা মেঘখণ্ড নিয়ে একটা মেঘমণ্ডল, অনেক মণ্ডলে এক একটা মহামণ্ডল, শেষে পৃথিবী-ব্যাপী বিরাট্ মেঘের দেহ, এই সবটার পেছুনেই প্রাণের ছোট ভাব থেকে বড় ভাবের চালনা বুঝতে হয়। ছোট ছোট এক একটা খণ্ড চিন্তা নিয়ে একটা চিন্তার প্রবাহ, কতকগুলা চিন্তার প্রবাহে একটা বৃহৎ প্রবাহ, জানবার চেষ্টায় কত বৃহৎ প্রবাহই জীবনের স্রোতে ব'য়ে যাচ্চে, জীবজগতের সবাইকের সারাজীবনের চিন্তার প্রবাহের আড়ালে, কত বড় একটা জানবার প্রাণ ভাব দেখি। বৈজ্ঞানিকেরে বলেন রক্তের ভেতরে কোটি কোটি জীববিন্দু ভোগের জন্যে ছুটোছুটি ক'রছে। আচ্ছা ভাব দেখি সেই রক্তবিন্দুর জীব বিন্দু থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছোট থেকে বড়, তার বড়, তার বড়, এই সব জীবের পেছুনে কত বড় একটা বিরাট্ ভোগের অধিষ্ঠান, মহাপ্রাণের অধিষ্ঠান। হয়ত মনে ক'রতে পার সব দেহ, সব দেহী, এক শেকলে বাঁধা বুঝব কিসে,

সব ভাব সব ভাবী এক প্রাণের ভাব ভাবে ধ'রব কিসে, সব ভোগ সব ভোগী এক সুখের তরে ছুটেছে জানব কিসে ? তা হ'লে ব'লব, একথাটা তোমার ভাসা ভাসা কথা, ত'লিয়ে বুঝলে কখনও একথাটা ব'লতে না। প্রতি জীবেরই পাঁচভূতের দেহ বিশ্বব্যাপী পাঁচ ভূতের নাগপাশে বাঁধা, 'ভূতভাবন' প্রাণের সত্তাতেই তাদের সত্তা। এক ব'লেই অদল বদল কেবল ঘ'টছে, এটায় ওটায় দেহের সম্বন্ধ সর্ব্বদাই বদলাচ্চে। চিন্তার প্রতি স্রোতেই, প্রতি খণ্ডেই, 'আমি ভাবছি এই রকম' এই ব'লে বোঝবার একটা 'নিত্যবুদ্ধ' ভাব জাজ্বল্যমান, সারাজগতের জীবের সব চিন্তার পেছুনে সেই ভাবটাই খুব দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে। ভোগের তৃষ্ণায় ছুটোছুটি যেখানে, সেখানেই আনন্দকণা পাবার চেষ্টা, বিশ্ব ব্যেপে তাই আনন্দময়েরই আনন্দ লীলা। এক সূতোয় বাঁধা ব'লেই একটা জ্ঞান পাঁচটা জ্ঞান নিয়ে, একটা সুখ পাঁচটা সুখ ধ'রে। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখলেই দেখা যাবে, এমন জ্ঞান নেই যেটা বিশ্বের অন্য অন্য সব জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে না জ'ড়িয়েছে। এমন সুখও নেই যেটা সকল রকমের সব সুখের মুখাপেক্ষা না ক'রে আপনি অখণ্ড ভাবে প্রকাশ পেতে পারে। জগতে সব না থাকলে একটাও থাকে না, সব জানা না হ'লে একটাও পূর্ণ ভাবে জানা হয় না, সব সুখে সুখী না হ'লে, এক মূহূর্ত্তেও একটা পূর্ণ সুখে সুখী হওয়া চলে না। বস্তুর সত্তায়, দেহের সত্তায়, চারিদিকে অনন্ত সম্বন্ধ, বস্তুর পরিচয়ে চারিদিকে অনন্ত সম্বন্ধ, বস্তুর ভোগে চারিদিকে অনন্ত সম্বন্ধ। দেহী তাই পূর্ণ বিরাট্ হবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, জ্ঞানী তাই সর্ব্বজ্ঞ হবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষে, ভোগী তাই সব ভোগ ক'রব এই বাসনা নিয়েই ভোগে মাতে। বড় ভাবটা, নিজের ভাবের বড় উচ্ছ্বাস, বড় বিকাশ, যদি না হ'ত, তাহ'লে এমন 'সর্ব্বগ্রাসী' সংকল্প জীবের প্রাণে উঠতে পারত না। যা আমার নয়, প্রাণ প্রাণে তাকে আমার ক'রতে চাইবে কেন ভাই ?

ছোট প্রাণ ব'লে যেটা বলি, সেটা ভাই তাহ'লে আসলে ছোট নয়,

কাজের গতিকে ছোট,কিন্তু আসলে সেটা সেই মস্ত একটা মহাপ্রাণেরই ভাব, তারই একটা কণা, তারই একটা স্ফুলিঙ্গ, ভেতরে ভেতরে সে সমস্তটার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়ে না। জীবের প্রতি ভাবে আমরা ছোটর সাড়া পেলেও আসলে বড়র সাড়াই পাই। ছোটয় বড়য়, ছোট ভাবে বড় ভাবে, তফাৎ এই. ছোট বড়র সম্পূর্ণ শাসনে থেকে বড়র শিষ্য, বড় শাসক। বিশ্বের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে, যেমন সম্বন্ধে, যেমন বাঁধনে ছোট যখন বাঁধা পড়ে,তেমনই সম্বন্ধ, তেমনই বাঁধন মেনে,তখন ছোটকে চ'লতে হয়, নিজের জীবন নির্ব্বাহ ক'রতে হয়। এই হিসাবে বড় একবারে বন্ধনমুক্ত, উন্মুক্ত প্রাণ, মুক্ত প্রাণ, আর ছোট পরাধীন, সেই পরাৎপর মস্ত বড়র অধীন,তাঁর নিয়মে বাঁধা,চারিদিকে নিয়মের শেকলে বাঁধা, বদ্ধজীব, 'পরতন্ত্র' জীব। বড় সব নিয়ম,চারিদিকে ছড়ান সব সম্বন্ধ, নিজেতে নিজের হাতে গুটিয়ে টেনে রেখে, নিজে নিজেই রাজা, স্বরাট্, বিরাট্, অধিরাট্, আর ছোট তার দাস, দাসের দাস, দাসানুদাস, ক্ষুদ্র প্রজা। ছোট অবস্থার দাস, চারিদিকে যে সব সম্বন্ধের, ছোট প্রাণের সম্বন্ধের, ব্যবস্থা করা আছে, তার দাস, চ'লতে ফিরতে নিজের অবস্থাকে ঠেলে ফেলতে পারে না, আর বড় স্বয়ং ব্যবস্থাপক, সকল প্রাণের সমস্ত অবস্থার ওপরে। ছোটকে সব জীবকে মেনে চ'লতে হয়, তেত্রিশ কোটি দেবতা মেনে চ'লতে হয়, স্থাবর জঙ্গম সবাইকের গতিক বুঝে চ'লতে হয়, না চ'ললেই তার বিপদ, আর বড় সব জীবের, সব দেবতার, প্রাণ, নিজেতে আকর্ষণ ক'রে এনে ব'সে থেকে স্বয়ং 'কৃষ্ণ',স্বয়ং 'সর্ব্ব দেবেশ্বর' 'হরি'।' ছোট সদা সর্ব্বদাই মরণের ভয়ে জড় সড়, ঐ বুঝি যে গণ্ডির ভেতর আছি,যে ছোট খাট সম্বন্ধ পাতিয়ে ব'সেছি,সেটা ভেঙ্গে গেল,এই ভেবেই ব্যস্ত ত্রস্ত, আর বড় সব গণ্ডির বাইরে থেকে, সব সম্বন্ধের ওপরে থেকে, অজয় অমর অভয়। ছোটর সম্বন্ধ কেবলই ভাঙছে, দেহের সম্বন্ধ তার মাঝে মাঝেই ভাঙছে, সে ঘুরে ঘুরে জন্মাচ্ছে, সংসার ক'রছে,আর বড় অজ, নিত্য,শাশ্বত, চিরন্তন, পুরাতন, সনাতন। তফাৎ ভাবতে গেলে মনে হয়, কোথায় ছোট আর কোথায় বড়, এতে

ওতে বুঝি কোনও ঘনিষ্ঠতাই নেই, কিন্তু আসল ভাব এক ভাব ভাবলেই সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, খণ্ডের ভেতরেই অখণ্ড, ছোটর ভিতরে বড়, মর্ত্ত্যের আড়ালেই অমর্ত্ত্য, ভীতের পিছনেই অভয়, বিপন্ন আপনাতে আপনি সম্পন্ন, অবস্থার কিঙ্কর নিজেরই কিঙ্কর, রাজাই নিজে নিজের প্রজা, ছাড়াই নিজের শেকলে নিজে বাঁধা, শাসনকর্ত্তা নিজের শাসনই মেনে যায়। প্রাণ বড় হ'য়েই বড় থেকেই ছোট হয়, ছোট হ'য়েই ছোট থেকেই বড় হয়। নিজের রঙ্গে 'শ্রীরঙ্গনাথ' ছোট বড় দুই ভাবে রঙ্গী। যেখানেই ছোটকে পাবে সেই খানেই বড়কে পাবে। বড় 'বিষ্ণু' নিজে 'বামন' হ'য়ে আছে, থাকলেও 'ত্রিবিক্রম' 'উরুক্রম' ত্রিভুবন ব্যেপেই আছে, ওপরে মাঝে নীচে, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, খণ্ড প্রাণের ভাবের মাথায়, খণ্ডিত ভাবের অধীশ্বরী দিতির পুত্রের মাথায়, পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জগতের প্রতি ভাবেই যখন ছোট প্রাণের সন্ধান পাবে ভাই,তখনই বুঝবে বড়রও সন্ধান পেয়েছ, প্রাণের প্রমাণে মহাপ্রাণেরও প্রমাণ পেয়েছ, কেননা প্রাণের সাড়ায় সর্ব্বত্রই মহাপ্রাণেরই সাড়া। যে যেখানে জন্মাচ্চ, ব'ড়র ছোটর ভাব এনে জন্মাচ্চ, কিন্তু সেই ছোটর বড় ভাব বজায় রেখে জন্মাচ্চ; যে যেখানে থাকচ, বড় ভাবকে খর্ব্ব করে থাকচ, কিন্তু বড় হ'তে পার্ব্ব এই ভাবও সেই সঙ্গে হৃদয়ে পোষণ ক'রছ; যে যেখানে লয় পাচ্চ,ছোট হ'য়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্চ, কিন্তু সব দিকেই বড়তে মিশিয়ে যাচ্চ। যে ভাব মনে যখন উপলব্ধি ক'রচ, অনুভব ক'রচ, তাতেই উপলব্ধি করবার অনন্ত ভাব চারিদিকে রইল ভাবতে ভুলছ না; মনে ছোট খাট যখন যা একটা স্মৃতিতে উঠছে, তখন মনে করবার অনন্ত ভাব আগে পাছে প'ড়ে র'য়েছে এ ভাবটাও জাগছে; এটা ওটা ভুলছ যখন দেখ, তখন ভাবলেই দেখতে পাও, সারা বিশ্ব জোড়া চারদিকের সম্বন্ধই তুমি ভুলে আছ। ভোগে ভোগে এটা ওটা চাকতে চাকতে ছোট হ'য়েও, জীবনের সব রঙ্গ, সব মজা, সব রস, সব দিকে ভোগ করবার ঝোঁকে, সকল ভোগে অনুরাগ তোমার প্রতি ভোগের পাছে পাছেই থাকে; ছোট খাট যে ভোগেই যখন মাত, তখন

আবার মস্ত অফুরন্ত ভোগে মাতব এই উৎসাহেরই প্রশ্রয় দাও; ভোগের শেষে যখনই যেখানে বিতৃষ্ণা আসে, বৈরাগ্য আসে, উপরতি আসে, শান্তি দেখা দেয়, তখনই সেখানে উত্তম ভোগের, যাতে বিতৃষ্ণা নেই সেই ভোগের, সেই রকমের অনন্ত ভোগের, আশার স্বপ্নের কোলে তোমার বৈরাগ্য লয় পায়। ছোট বড় সব জায়গায় হাত ধরা ধরি ক'রেই আছে। বড় ছেড়ে ছোটর লীলারঙ্গ নেই, ছোট ছেড়েও বড়র লীলারঙ্গ নেই। ছোটও সত্য, বড়ও সত্য, দুই সত্যে এক মহাসত্য। ছোটটা বড়র রঙ্গ, রঙ্গ হ'লেও সত্যেরই রঙ্গ, সত্য নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে ব'সে নিজেকে যেন মিথ্যে ব'লে পরিচয় দিয়েই এই রঙ্গ ক'রে থাকে। চারিদিকে সব রঙ্গ প্রাণের রঙ্গ ব'লেই প্রাণ আপনাকে আপনি চুরি ক'রেছে, প্রাণে প্রাণের পরিচয় তাই হঠাৎ কেউ বুঝতে চায় না। চাক আর নাই চাক, প্রাণে প্রাণে কিন্তু সবাই পদে পদেই প্রাণেরই সাড়া পাচ্চে, প্রাণেরই সাড়া নিচ্চে। নিজের বুকের মাঝে, প্রাণকে লুকিয়ে রেখে, রঙ্গ ক'রে, জীব কোথায় প্রাণ কোথায় প্রাণ ব'লে জগতের সব খেলা খেলছে। সত্যের ছলনায় মিথ্যার খেলা খেলছে, কিন্তু সত্য প্রাণ, খেলচে নিয়ে চারিদিকে সত্য প্রাণ, সব প্রাণে একপ্রাণ হ'য়েও, খণ্ডের ভাব ছলনার রঙ্গে চারিদিকে সাজিয়ে খেলছে। ছলনার এমনি পরিপাটি যে চারিদিকে ছোটর ভাবেরও সীমা নেই, আবার বড় ভাবেরও সীমা নেই। একদিকে ঐ ভাব অগাধ অতলস্পর্শ, অপরদিকে অনন্ত অমেয়। যেখানে যে ছোট জীব ধর, সে তার দেহে আরও ছোট জীবের নানান স্তর সাজিয়ে ব'সে আছে, তারা আবার নিজের নিজের দেহে অতি ছোট নানান্ জীবের স্তর, এমনি ছোটর ছোট, তার ছোট, এর শেষ সীমা কে ধ'রতে পারে? প্রাণ এই রঙ্গে অণুথেকে পরমাণু। আবার অন্যদিকে জীবের দেহের পাঁচ ভূত পঞ্চ ভূতের মহাদেহে, পঞ্চ ভূত নিয়ে সেই দেহের দেহী 'ভূতনাথ', অনন্ত কাল অনন্ত বিশ্ব ধ'রে অনন্ত প্রাণী এই দেহে পঞ্চত্ব পাচ্চে, লয় পাচ্চে, এ বিরাট্ দেহের, এ বিরাট্ 'লিঙ্গের', সকল জীবের লয়ের আধারের,

কে পরিমাণ ধারণা ক'রবে ? বিশ্বরূপ বিশ্বনাথ বিশ্বপ্রাণ সকল প্রমাণের অতীত, অথচ সকল প্রমাণেই 'নিরূপিত'।

(২৪)

প্রাণের জ্যোতিঃ

যেখানে কিছু আছে, সেই খানেই তার আড়ালে প্রাণ আছে। স্থিতির সঙ্গে, সত্তার সঙ্গে, প্রাণ স্বতঃসিদ্ধ। জগতের চারিদিকেই ত সত্তা ছড়ান, কিছুই নেই এমন ভাব জগতের কোথাও নেই। প্রাণ, ব্যাপক প্রাণ, তা হ'লে এদের সবাইকের আড়ালে, সবাইকের কেন্দ্রে, সব সত্তার কেন্দ্রে অবশ্যই আছে। ঐ আসল বড় প্রাণের সন্ধান ক'রতে হলে খুঁজে দেখতে হবে,সব বস্তুর,সব সত্তার,কেন্দ্রে কে আছে। সবাই জানে, সবাই দেখছে, আমার জগতের কেন্দ্রে র'য়েছে 'সূর্য্য'। বড় প্রাণের খোঁজ কাজেই এই সূর্য্যমণ্ডলেই ক'রতে হবে। সূর্য্যই যখন জগতের কেন্দ্র, সেই খানেই তখন জগতের প্রাণ। জগৎ আছে, জগতে যা কিছু আছে, সবই আছে, ঐ সূর্য্যকে ধ'রে। জগতের সব স্থিতির মূলেই সূর্য্য। জগতের সব খণ্ডটা হ'য়েছে ঐ সূর্য্য থেকেই। সূর্য্যই জগতের তাই 'সবিতা'। সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছে ব'লে গ্রহ উপগ্রহগুলা সবই চরমে সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরছে। সূর্য্য থেকেই ছুটেছে, সূর্য্যের দিকেই ছুটছে, ছুটো ছুটির দোটানায় প'ড়ে নিজের নিজের কক্ষে ঘুর পাক খাচ্চে সব। সব ছিল একদিন এই সূর্য্যে, 'বিবস্বান্' দেবতাই একদিন সবাইকের আবাস স্থান দিয়েছিল। সূর্য্যের টানই প্রাণের টান। সবাইকের টান সূর্য্যের দিকে, সবাই টানে

সূর্য্যকে। প্রাণ ব'লেই টানে, প্রাণই টান, টানই প্রাণ। টানাটানি, আকর্ষণ বিকর্ষণ, প্রাণময় সূর্য্যেরই লীলা, ঐটেই তাঁর স্বভাব। আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়া সূর্য্যের সত্তা, সেই বড় প্রাণের সত্তা, কল্পনাই করা যায় না। নিজেকে নিজে থেকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া, আবার ছুড়ে দিয়ে নিজেকে নিজেতে আনবার রীতিকেই লোকে খেলা বলে। আমি আমার ভাবটা ঝেরে ফেলে দিয়ে, সেই ভাবটা গুটিয়ে আনবার যে চেষ্টা যখন করি, তখন সেই চেষ্টায় নিজের খেলাই খেলি। আমাকে ভুলে বাইরের কতকটাকে আমার করবার জন্যে সম্বন্ধের টানাটানিতেই খেলা। সারা জীবন ধ'রে আমি এই খেলা খেলি। নিজেকে বাইরের টানে ফেলে দিই, বাইরের সবাইকে নিজেতে টানতে থাকি। জীবনের নিজ ভাবই এই। আমি যতদিন থাকি ততদিন এই ভাব ধ'রেই থাকি। সব থাকা যেখানে থাকে, সেই বিবস্বানের থাকার প্রাণে কাজেই জগৎ ব্যেপে টানাটানি র'য়েছে। বিবস্বান্ দেবের এই নিত্য লীলা কোনও কালেই অচল হবে না, হ'তে পারে না। প্রাণ প্রাণহীন হ'তে পারে না। অবশ্য যদি এই দেবতার প্রাণও যদি অন্য কোনও কেন্দ্রে থাকে, তবে সেই আরও বড় প্রাণের টানে প'ড়ে ইনি যখন সেখানে মিশবেন, তখন এঁর আশ্রিত ছোট খাট অনন্ত প্রাণও সেইখানে মিশবে, কিন্তু মিশলেও সেই মেশাটা চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। প্রাণের লীলায়, প্রাণের স্বভাবে, আবার বিশ্ব ছোট বড় প্রাণে ভ'রে উঠবে। বাস্তবিকই ছোট প্রাণে বড় প্রাণে সূর্য্যকে ধ'রে এই লীলা আবহমান কাল চ'লছে চ'লবে। জগতে পরমাণুতে পরমাণুতে, অণুতে, অণুতে, ছোটয় ছোটয়, আবার ছোটয় বড়য়, সব টানাটানি, ঐ সূর্য্যের বড় টানাটানিরই খণ্ড খণ্ড ভাব মাত্র। এক সূতোয় জগৎ বাঁধা, এক প্রাণে জগতের স্থিতি, সেই প্রাণের নিজের খেলায়, নিজের নাড়া চাড়ার স্পন্দনেই, সমস্ত আকর্ষণ বিকর্ষণ। সূর্য্যের যে মহাজ্যোতিঃ সেটা ঐ আকর্ষণ বিকর্ষণের স্পন্দনেই তেজের আশ্রয়, জ্যোতির আশ্রয়। প্রাণময় সূর্য্য সেই জন্যেই জ্যোতির্ম্ময়, একমাত্র জ্যোতির্ম্ময়

'পূর্ণ' পুরুষ। জগতের সব তেজঃ, সব জ্যোতিঃ তাঁরই তেজের কণা নিয়েই নিজে নিজে প্রকাশ পায়।

আলোতেই জিনিষ জ্ঞানগোচর হয় একথা না ব'ললেও চলে। কথাটা কিন্তু গভীর ভাবে বুঝতে চেষ্টা ক'রলে একটা মস্ত রহস্য ধ'রতে পারা যায়। সব আলোই চরমে সূর্য্যের আলো, প্রাণের আলো। জগতের জিনিষ এক আকারে না এক আকারে সুতরাং প্রাণময় সূর্য্যের আলোয় প্রকাশ পাবে এটা স্বতঃসিদ্ধ। জিনিষের জ্ঞানে, জিনিষের প্রাণ, জিনিষের প্রাণের জ্যোতিঃ, যে জানছে তার প্রাণের জ্যোতিতে না মিশুলে জ্ঞানটা ঘ'টেই উঠবে না। যে প্রাণের আলোয় বাইরে জিনিষকে দেদীপ্যমান ক'রেছে সেই প্রাণের আর একধারার আলোই, সেই জিনিষকে জ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় ক'রবে। সোজা কথায় সূর্য্যই একদিকে বস্তুর 'প্রকাশক', অপর দিকে সেই বস্তুর জ্ঞানের 'নির্ব্বাহক', যে জানে তার জানবার শক্তির, জানবার অধিকারের 'বুদ্ধি বৃত্তির' 'প্রবর্ত্তক'। তেজের রহস্য, আলোর রহস্য, জ্যোতির রহস্য, যে বোঝে, সে নিশ্চয়ই বোঝে, সূর্য্যের তেজে অন্তরের প্রাণ জ্যোতির্ময় হয়, বাইরের প্রাণের জ্যোতিকে আত্মসাৎ ক'রতে পায়। জ্যোতির্ময় সূর্য্যের তেজে না ভাসলে কেউ বোঝেও না বোঝায়ও না। সূর্য্যের তেজঃ 'আধান' ক'রে তবে 'ধী'বৃত্তি বস্তুকে জ্ঞানের টানে টানতে থাকে, সূর্য্যের তেজে থেকেই বস্তু বুদ্ধির টানে আপনাকে ধরা দেয়। জ্ঞানের যোগে, বাইরের প্রাণের অন্তরের প্রাণের জ্ঞানের 'সমাধানে', উভয় প্রাণের একধারায় 'সমাধিতে', মানুষ নিজের প্রাণে সূর্যের 'ব্যাপক' জ্যোতির, বিশ্বব্যাপী 'বিষ্ণু' তেজের প্রকাশ অনুভব ক'রেই কৃতার্থ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানের যোগে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই বিশ্বপ্রাণের তেজে আপনার প্রাণের তেজের ধারা জীব খেলায় ভুলে অজ্ঞাত সারে মিশিয়ে দেয়; চরম জ্ঞানে আপনাকে যখন আপনি আসল ভাবে বুঝতে চেষ্টা করে, বিশ্বপ্রাণের একভাব ব'লেই ধ'রতে চায়, তখন সেই যোগে, জ্ঞানের পূর্ণ সমাধিতে, সকল প্রাণে যে তেজঃ বেরে আছে, ঘিরে আছে, সেই

বিশ্বপ্রাণময় 'সবিতার', জগতের সকল প্রাণে জাজ্বল্যমান সেই প্রাণ-দেবতার, বেরা তেজ, 'বরেণ্য' জ্যোতিঃ, জ্ঞাতসারে 'আধান' ক'রছি জেনে, নিজের প্রাণে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তবে আপনাতে বিশ্বের ভাব এবং বিশ্বে আপনার ভাব ধারণা করে। এই মহাযোগে নিজ প্রাণের অন্তরে 'সবিতৃ'-তেজের, বিষ্ণু তেজের 'আধান', মহাপ্রাণের কাছে, মহাপ্রাণের কোলে, ক্ষুদ্র প্রাণের আসন দিয়ে, সেই 'উপাসনায়' জীব ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক,ত্রিজগৎ, নিজের প্রাণে প্রকাশমান দেখে। তখন তার কাছে সব এক; সে সবতাতে। সে তখন বোঝে আমিই সেই মহাপ্রাণ,সেই মহাপ্রাণই আমি। তার 'সোহং সোহং' বুদ্ধিতে বিবস্বান্‌ও একধারে হংস, সেও একধারে পরমাণু প্রাণরূপে 'পরম হংস'। জগতে 'হংস'গণকে নিয়ে 'হংসেশ্বর' নিত্যলীলায় ব্যাপৃত, বোঝবার চেষ্টা ক'রলেই এটুকু সবাই বুঝতে পারে। জীব নিজেকে জানতে না চাইলে নিজেকে 'হংস' ব'লে জানতে পারে না। না পারলেও ছোট খাট সব প্রাণেই 'হংসের' ভাব ধারণ ক'রেই জীব জীবনের জানার কাজ নির্ব্বাহ ক'রে যায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সর্ব্বত্র সূর্য্য মণ্ডলের 'হংস' পুরুষই বিষ্ণুতেজে সব জ্ঞানে সব যোগে জাজ্বল্যমান।

মনে হ'তে পারে, চ'খের দেখায়, 'চাক্ষুষ জ্ঞানে,' জিনিষের 'রূপ' নিরূপণ ক'রতে, জ্যোতির ক্রিয়া কতকটা বোঝা যায় বটে, অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানে, রসের আস্বাদনে, গন্ধের আঘ্রাণে, শব্দের শ্রুতিতে, স্পর্শের অনুভবে, জ্যোতির ক্রিয়া ত কিছুই বোঝা যায় না। তবে কি ক'রে বলা যায় প্রাণের জ্যোতিতে জ্ঞান প্রকাশ পায়? সত্য বটে রূপের দেখায় 'রশ্মির' স্পষ্ট মিলন যতটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, অন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ততটা স্পষ্ট বোঝা যায় না। না গেলেও একটু হিসাব ক'রে দেখলেই সেটা ধ'রতে পারা যায়। চোখের দেখাতেও ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে প্রাণে যে জ্যোতিঃ বাইরে এসে বস্তুর প্রাণের জ্যোতির সঙ্গে মিশ খায়, সেটাই কি সহজে বোঝা যায়? আমরা মোটামুটি দেখি আর ব'লি' আলোয় জিনিষটা চ'খের সামনে ভাসল। বাইরের সূর্য্যের

আলো একদিকে যেন বস্তুর প্রাণের আলোকে জাগিয়ে তুললে, অপর দিকে আবার যেন 'ইন্দ্রিয়ের' গোড়ায় প্রাণ-সূর্য্য 'ইন্দ্রের' আলোকে টেনে বার ক'রলে। বাইরের সূর্য্য-রশ্মি কি বাইরের অন্য আলো জিনিষের আলো আর ইন্দ্রিয়ের আলো মিশিয়ে দেবার একটা নিমিত্তমাত্র। 'যোগের' প্রখর আলোকে বাইরের এ নিমিত্তও আবশ্যক হয় না, বস্তুর জ্যোতিঃ আর চক্ষের জ্যেতিঃ যোগের আলোর বলে আপনি দ'প দপে হ'য়ে জ্ব'লে ওঠে। যোগে প্রাণ বড় সূর্য্যের কাছে দাঁড়িয়ে অন্তর থেকে চারিদিকে আলো ছড়ান বুঝতে পারে ব'লেই এমন হয়। সোজাসুজি দেখায় বড় সূর্য্য বাইরে থেকেই সব জিনিষে আলো ছ'ড়িয়ে দেয়। দেখার ব্যাপারেও যেমনি আস্বাদনের, আঘ্রাণের, স্পর্শণের, শ্রবণের ব্যাপারেও ঠিক তেমনিই। রসনার মূলে যে তেজ সেই তেজ রসের তেজে মিশে বস্তুর আস্বাদন জন্মায়, সেই আস্বাদনেই রসের অনুভবে জ্ঞানের জ্যোতির একটা ধারা। ঘ্রাণে গন্ধের তেজ আর ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়ের তেজ, স্পর্শনে বস্তু শীত উষ্ণ এই রকমের তেজ আর স্পর্শেন্দ্রিয়ের তেজ, শ্রবণে শব্দের তেজ আর শ্রবণের ইন্দ্রিয়ের তেজ, এক জ্যোতির প্রবাহে ভেসে জ্ঞানের জ্যোতিকে প্রকাশ করে। আসল কথা আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বস্তুকে যে যে ধারাতেই অনুভব করিনা কেন, বস্তুর অনুভবের সেই সেই ধারাই বস্তুর প্রাণের একটা না একটা 'স্পন্দনের' প্রবাহ মাত্র। প্রাণের স্পন্দনেই প্রাণের তেজ, প্রাণের আলো। যেখানে স্পন্দন, সেই খানেই তেজ। বস্তুর পাঁচ রকমের স্পন্দনের ধারায় পাঁচ রকমের তেজ পাঁচ রকমে আমাদের জানান দিয়ে জ্ঞানের প্রাণে মিশতে এসে পাঁচ রকমের 'ইন্দ্রিয়ের' 'গোচর' হয়। যখনই বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তখনই বুঝতে হ'বে 'গোপতি' 'গবিষ্ঠ' প্রাণময় অন্তরের সূর্য্যই তাকে নিজের 'গোচর' ক'রে নিচ্চে। ইন্দ্রিয়ের পেছনে যদি 'গোপতি' সূর্য্য না থাকত, তা হ'লে জ্ঞানে বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর হবে কেন? সূর্য্যই ইন্দ্রিয়ের প্রাণের অধিষ্ঠান, 'গোপাল' 'গোবিন্দ'। ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রই

তাঁর 'গো'কুল, তিনি তাই 'গোকুল-বিহারী'। ইন্দ্রিয়ের তেজ সকলই তাঁর 'গো'মণ্ডলী। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিজের জোতিঃ প্রকাশ ক'রে সূর্য্যদেব প্রাণ-'গোপাল' হ'য়ে নিজের সব 'গোচর' ক'রছেন। সকল জ্ঞানেব মূলেই এই ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, সকল রকমের জ্ঞানই চরম প্রকৃতিতে তাই 'গোলোকে' 'গোপতির' 'গোচর'।

বস্তুর শক্তিরূপে যে তেজঃ, যে জ্যোতিঃ, জগতের অধিষ্ঠান, সেই তেজঃ সেই জ্যোতিই অন্যভাবে বস্তুর জ্ঞানের দীপ একথা বেশ বোঝা গেল। প্রাণের স্পন্দনেই সত্তা, প্রাণের স্পন্দনেই জ্ঞান, দুটা আলাদা আলাদা ভাব মাত্র। ঐ স্পন্দনই তেজঃ, ভগবান্ সূর্য্যের অঙ্গের জ্যোতিঃ। ভোগের দিক্ দিয়ে, আনন্দের দিক্ দিয়ে, দেখলে, আবার এই জ্যোতিই, জগতের প্রাণের শোভা, তার শ্রী, তার সম্পত্তি, তার ঐশ্বর্য্য, তার ভোগের সব। ভোগের জিনিষের যে সৌন্দর্য্যে, যে 'রমণীয়' ভাবে, প্রাণ সেইদিকে টানা পড়ে, সেটা তার প্রাণের শোভা, প্রাণের কান্তি, না হ'লে প্রাণ সেদিকে ছুটত না। প্রাণের জ্যোতিকে আশ্রয় ক'রেই প্রাণ প্রাণের ভোগের। প্রাণ পূর্ণ ভাব ধারণ করে, অন্য সব প্রাণকে ভোগ ক'রতে চায়, অন্য সবাইকের কাছে আপনাকে ভোগ করাতে চায়, নিজের এই সম্পত্তি নিয়েই, সর্ব্বব্যাপী আকর্ষণের প্রভাব নিয়েই, সেই আকর্ষণের স্পন্দনের দ্যুতি নিয়েই। সেই মহাকর্ষণের মহান্ ভোগেই প্রাণ 'সম্পন্ন' হয়, নিজের মহিমায় বিরাজ করে। বিশ্বব্যাপী ভোগের আকর্ষণের ঐ তেজঃ, ঐ ঐশ্বর্য্যই, প্রাণের রাজত্ব, তাতেই প্রাণ 'বিরাট্'। প্রাণে প্রাণে ভোগের আকর্ষণে, প্রাণের ভোগের জ্যোতিঃ স্বতঃসিদ্ধ, কেননা, আকর্ষণের স্পন্দনেই জ্যোতিঃ। একই জ্যোতির প্রকার ভেদ ব'লেই, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যেমন জগতের বস্তুর পরস্পরের আকর্ষণে নিজের নিজের সত্তা অন্তরের প্রাণের কাছে জ্যোতির্ময় হয়, আকর্ষণের ভিন্ন ধারায় জগতে জানাজানির ভাব ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যেমন অন্তঃপ্রাণে প্রকাশ পায়, তেমনি ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারেই ভোগের আকর্ষণও 'রম্যভাবে' 'রমণীয়' জ্যোতিতে অন্তঃপ্রাণে

'রমাপতি' 'গোবিন্দের' নিজজ্যোতিতে মিশিয়ে যায়। এক মহাকর্ষণের ভিন্ন ভিন্ন প্রবাহে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিঃ আবিষ্কার ক'রে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু-তেজে বিশ্বব্যাপা তেজস্বান্ ভগবান্ গোপতি সূর্য্য ইন্দ্রিয়ের মূলে বিশ্ব-ব্যাপী গো-লোকে অধিষ্ঠান ক'রে জগতে স্থিতির লীলার জ্ঞানের লীলার সঙ্গে ভোগের লীলা আনন্দের লীলাও প্রচার ক'রেছেন। যে যেখানে যে ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রতে চায়, যে ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে আনন্দ ক'রতে চায়, সেই আনন্দ, সেই ভোগ, সেই ঐশ্বর্য্যের চরমতত্ত্ব খুঁজে দেখ, দেখবে এক মহাজ্যোতিঃ সব জায়গায় দেদীপ্যমান। ঐ মহাজ্যোতি-তেই সবাই আকৃষ্ট হয়, সবাই ঐ শোভায় মুগ্ধ হয়। খণ্ড প্রাণের সব ভোগের মূলেও ঐ জ্যোতিঃ, মহাপ্রাণের মহাভোগের মূলেও ঐ জ্যোতিঃ। জগতে সব জিনিষের কান্তি এক মহাজ্যোতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা। সেই মহাজ্যোতিই সাক্ষাৎ 'শ্রী', সাক্ষাৎ 'রমাদেবী'। শ্রীপতির জগৎ ভোগের লীলা ঐ শ্রীদেবীকে নিয়েই। তোমার আমার প্রাণের মূলেও শ্রীপতি অধিষ্ঠান ক'রে আছেন ব'লেই তুমি আমিও জগতের ভোগশ্রীতে অনুরক্ত হই। আসল শ্রীর, প্রাণের শ্রীর, সন্ধান না নিয়ে, যেখানে ঐশ্বর্য্য ভোগের কিছু আছে ব'লে ভোগ ক'রতে যাই সেখানেই বিড়ম্বিত হই। ঠিক প্রাণের আকর্ষণ যেখানে নেই সেখানে শ্রীও নেই, সে ভোগও নকল ভোগ মাত্র।

অখণ্ড পূর্ণ প্রাণের ভাবে আদিত্য পুরুষ, অনন্ত জ্যোতিতে জ্যোতি-র্ম্ময় হিরণ্যবর্ণ পুরুষ, সর্ব্বব্যাপা তেজের আধার বিষ্ণুপুরুষ, যে দেব-দেব সবিতা, তাঁর যা কিছু সবই জ্যোতির্ম্ময়, সবই হিরণ্ময়, কেননা সবই প্রাণের মহাপ্রভায় প্রভাময়। কবিরা যে ভাবেই তাঁকে কল্পনা ক'রেছেন,সেই ভাবেই তাঁর চারিদিকে অনন্ত জ্যোতিঃ ছ'ড়িয়ে দিয়েছেন। জ্যোতিতেই তিনি আছেন, আর যেখানে যা কিছু আছে তা ঐ জ্যোতি-তেই তিনি ধ'রে রেখেছেন, জ্যোতিতেই তিনি প্রকাশ পান, আর যেখানে যা কিছু প্রকাশ পায় ঐ জ্যোতিতেই তাকে তিনি প্রকাশ পেতে দেন, জ্যোতিতেই তিনি আনন্দ ভোগ করেন, আর যেখানে যে আনন্দ

ভোগ করে তাকে ঐ জ্যোতিতেই তিনি আনন্দ ভোগ ক'রতে দেন। বিষ্ণুতেজের 'সাবিত্র' জ্যোতির এই তিন প্রধান ধারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝবার জন্যে 'আখ্যায়িকায়' তারা তিন রকমের ভাবে 'খ্যাতি' লাভ ক'রেছে। সমস্ত স্থিতির গোড়ায় সত্তার অধিষ্ঠানে এই জ্যোতিই দেদীপ্যমান দিব্য 'বারি', সব নিয়ে সব ঘিরে আছে ব'লে 'বারি', সব ব্যেপে আছে ব'লে ঐ জ্যোতিঃ দিব্য 'আপোময়' জ্যোতিঃ, স্থিতির মূলে সব জিনিষ ঢাকা দিয়ে রাখবার জন্যে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য 'সমুদ্র'। এই জ্যোতির্ম্ময় বারি, মহাসমুদ্র, আপোদেবতা, ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সব নিয়ে আছে, স্বর্গে মর্ত্তে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্রই এর অধিকার, এ সামান্য জল নয়। বেদের আখ্যায়িকার এই বারির অধীশ্বর বরুণ ছোট খাট দেবতা নয়, একবারেই সর্ব্বেশ্বর 'হিরণ্যবর্ণ' 'বর্ম্মেতে' নিজের দেহ আবৃত ক'রে চারিদিকে জ্যোতির্ম্ময় বার্ত্তাবহে বেষ্টিত হ'য়ে সকলের ওপর ব'সে, সকলের ওপর রাজত্ব ক'রছেন! বেদের কবির দৃষ্টিতে ইনিই মহাসূর্য্য দেবাদিদেব। সবই আছে এঁর নিয়মে, এঁর জ্ঞানে, এঁর ভোগে। জ্ঞানের ভাবের মূলে এই জ্যোতিঃ সমস্ত ভাবের স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দেবার চৈতন্যময় প্রতিভাময় আলোক, এই আলো না প'ড়লে বস্তু অজ্ঞানের অন্ধকারেই ঢেকে থাকে। জড় সূর্য্যের জড় আলোর ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চাক্ষুষ দর্শনের ধারায় এর অতি অকিঞ্চিৎকর অধিকার দেখা গেলেও, এ আলো জড়ের অধিকারের বাইরে, পূর্ণ নিত্য সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃ, যোগীরা যোগে যে পরম জ্যোতিঃ দেখেন সেই জ্যোতিঃ। আলোয় আঁধারে সমস্ত অবস্থাতেই এই ব্রহ্মজ্যোতির স্পন্দনেই জীবের সকল রকমের জ্ঞান। এই জ্যোতির অধিষ্ঠানে বেদের কবি জানবার জানাবার এক 'ব্রহ্ম' মূর্ত্তিই দেখেন। বিশ্বব্যাপক অনন্ত দিব্য জ্যোতিই এই ব্রহ্মের শরীর। এই ব্রহ্মকেই আত্মা পরমাত্মা নাম দিয়ে, জ্ঞানের জ্যোতিঃ, আত্মজ্যোতিঃ পরমাত্ম জ্যোতিঃ ব'লে উপনিষদের কবি প্রচার ক'রেছেন। এইরূপে সত্তা ও জ্ঞানে যে জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় দিব্য বারি এবং

সনাতন জ্যোতিঃ, তাই আবার ভোগে জ্যোতির্ম্ময় 'অমৃত রস'। ভোগে পূর্ণতার জন্য যে যেখানে 'প্রীতিতে' আকৃষ্ট হয়, সে সেই খানেই প্রাণের টানে একটা দিব্য রসের আস্বাদ পাবার জন্যেই হয়। সব ভোগের গোড়ায় এই রস নানান্ ধারায় বয়। ভোগের লীলায় ভোগের প্রাণ রসের প্রাণ। এক মহারসের রসধারার স্পন্দনে সমস্ত ভোগ। জীবের প্রাণের প্রীতির সমস্ত ভোগের অধিষ্ঠানের মূলে উপনিষদের কবি তাই 'রস'ময় পুরুষের কল্পনা ক'রেছেন। রসনার জড় রসের আস্বাদনে এ আনন্দ ভোগের অকিঞ্চিৎকর একটী কণা থাকলেও, এ রস প্রাণে প্রাণে আকর্ষণে প্রাণের স্পন্দনে জ্যোতির্ময় দিব্যরস। প্রাণ এ রসে বঞ্চিত হ'য়ে কখনই থাকে না, এ রস অমৃত, এর মরণ নেই। ভোগের ঐশ্বর্য্যের জ্যোতির আড়ালে এই মধুর জ্যোতিঃ সকল অবস্থাতেই আছে। গোপতির গোলোকের মূল আধারে, বিষ্ণুর পরম পদে, তাই বেদের কবি মধুর উৎসই দেখেন। ঐশ্বর্য্যের পাশেই মাধুর্য্য, মাধুর্য্যের পাশেই ঐশ্বর্য্য। যেখানে বস্তুর শ্রী সেইখানেই বস্তুর সরস প্রাণ।

সূর্য্য-মণ্ডলের আড়ালেই এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় আদিত্য পুরুষের খোঁজ নিতে হবে একথা সত্য, কিন্তু ভাই তোমার আমার চখের সামনে ঐ জড় সূর্য্যই কি সেই সত্তাময়, জ্ঞানময়, আনন্দময় পুরুষ? না তা হ'তে পারে না। মরণের হাত হ'তে এ ত অব্যাহতি পায়না। জড়-বিজ্ঞান বলে এও হ'য়েছে, থাকছে, যাবে। হওয়া যাওয়া থাকার অধিকারে এর সব ভাবই র'য়েছে ছিল থাকবে। বিকার পরিবর্ত্তন এতে কত ঘ'টছে, কত ঘ'টবে, তা সংখ্যা করাই যায় না। মোটামুটিই দেখনা, নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে, গ্রহ উপগ্রহ উল্কা ধূম-কেতুর সৃষ্টি ক'রে, তাদের নিয়ে এখন টানাটানি ক'রে, সৌর জগৎ এ সাজিয়ে ব'সেছে। এ ভাবের কালে কালে কতই পরিবর্ত্তন ঘ'টেছে, ঘ'টছে, ঘ'টবে। আজ যারা এর টানাটানিতে ঘুরছে, এদের কতক ক্ষণ-স্থায়ী, কতক দীর্ঘকাল-স্থায়ী, কিন্তু সবই একদিন না একদিন এ

ঘুরপাকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এক রকমে না এক রকমে লয় পাবে। উল্কাপাত, তারাপাত, চোখের সামনেই ত কত দেখা যায়। গ্রহ উপগ্রহ কেতুগুলাও সময়ে ধ্বংস পাবে। কত ছিল, কত হ'য়েছে, কত হবে। অবশ্য দু দশ বছরে এদের লয় হয় না, যুগ যুগান্তরে হয়। তাহ'লেও এদের জন্ম আছে, বাঁচন আছে, আবার মরণও আছে। যে পৃথিবীতে তুমি আমি এখন আছি, এ একদিন ছিল না, এখন আছে, আবার থাকবেও না। কবে হ'য়েছে, বৎসরের গণনায় সেটা সংখ্যা করা যায় না, যুগের গণনায় ক'রতে হয়। এর বুকের ওপর আবার কত পরিবর্ত্তন যুগ যুগান্তরে ঘ'টেছে সে ভাবতে গেলেও আশ্চর্য্য মানতে হয়। এক গ্রহের যা অপর গ্রহেরও তাই। সৌর জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিত্যই পরিবর্ত্তন। পরিবর্ত্তনেই মরণের অধিকারের প্রকাশ। জড় সূর্য্য যখন পরিবর্ত্তনের অধীন তখন সে অমর নয়, তার জ্যোতিঃ যতই প্রভাময় হোক না কেন, সে জ্যোতিঃ প্রাণের দিব্য অমর জ্যোতিঃ নয়, তাতে ঠিক সত্তা নেই, পূর' জ্ঞান নেই, আসল ভোগ নেই। যে তেজে সত্তা, যে দীপ্তিতে জ্ঞান, যে প্রভায় শ্রী, সেই অখণ্ড জ্যোতিঃ, 'অদীন' আদিত্য জ্যোতিঃ, জড় সূর্য্যের যেখানে প্রাণ সেইখানে। ভাব দেখি ভাই সে কোথায়? ঐ সূর্য্যের প্রাণের অধি-ষ্ঠান ধ'রতে হ'লে একবার জগতের কার্য্যকারণ ভাবটা ভাল ক'রে আলোচনা ক'রে দেখতে হবে। বস্তুর প্রাণ কোথায় খুঁজতে হ'লে বস্তুটা হ'য়েছে কোথা থেকে আর কি ক'রে তা দেখতে হয়। মোটা-মুটি দেখ্‌লে দেখা যায় যেখানে একটা জীবন্ত জিনিষ গ'জিয়ে ওটে, সেইখানেই প্রথমে তার বীজের অবস্থা, তার পর সেই বীজ গর্ভ অবস্থায়, তার পর তার গর্ভ অবস্থা ঘুচে গিয়ে, প্রসবের মুখে তার প্রকাশ, তার জন্ম, তার 'প্ররোহ', তার দেহের সিদ্ধিলাভ হয়। কার্য্য কারণের ভাবে সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার। সৌর জগৎও একদিন বীজ হ'য়ে ছিল, তার পর গর্ভ অবস্থায় ছিল, তার পর দেহ লাভ ক'রেছে, তার পর সেই দেহে কত পরিবর্ত্তন ক্ষণে ক্ষণে ঘ'টেছে ঘ'টছে ঘ'টবে। এ রীতি

না ভেবে পারবার জো নেই। এই সঙ্গে আরও একটু ভাবতে ক্ষতি নেই। জগতে কোথাও কিছু 'একটা' হয় না, সেই রকমের অনেকই হয়। মানুষ বল, পশু বল, বৃক্ষলতা বল, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু জীবন্ত, সবই অনেক 'ব্যক্তিতে' নিজ ভাব ব্যক্ত ক'রে থাকে। দেখা যায় এক বীজে সহস্র বীজ, একবীজে শত সহস্রের কালে সৃষ্টি সম্ভব। সৌর জগতের জীবন্ত ভাব দেখে কাজেই মনে ক'রতে পারা যায়, এমনই শত সহস্র সৌর জগৎ আছে, ছিল, থাকবে। সত্য সত্যই বিজ্ঞান বলেও তাই। ঐ যে তোমার চোখের ওপর রাত্রে কত কত নক্ষত্র অনন্ত আকাশে নিজের নিজের জ্যোতিঃ প্রকাশ ক'রছে, দূর থেকে স্ফুট অস্ফুট ভাবে তাদের চোখে দেখছ, কি. দূরবীণ দিয়ে দেখছ, এরা নাকি এক একটা মস্ত সূর্য্য, এদের আলাদা আলাদা সৌর জগৎ আছে। ঐ যে 'ছায়া-পথ' 'অর্চ্চিমার্গ', ওটা ঐ সূর্য্যদেবতারই পথ, 'দেবযান', ঐ পথে অসংখ্য সূর্য্যই অনন্ত আকাশে গতায়াত ক'রছে। ঐ আকাশের 'বারিতে,' ঐ 'আকাশ-গঙ্গায়' ঐ 'যমের জাঙ্গালে' কত ডুবছে, কত ভাসছে,কে তার ইয়ত্তা ক'রবে বল ? এখন বোঝ দেখি বিশ্বব্যপী জ্যোতির্ম্ময় বারিতে কত সূর্য্য তা হ'লে বীজরূপে থাকছে, গর্ভ অবস্থায় থাকছে, আবার প্রকাশ পাচ্ছে। সৌর জগতের সূর্য্য দেবতার জন্মরহস্য বিচার ক'রেই তাই পুরাণের কবি বলেন সমস্ত জগতের প্রাণে জ্যোতির্ম্ময় সমুদ্র তিন স্তরে নিজেকে বিভাগ ক'রেছে, এক এক জগতের সূর্য্য প্রকাশ পেয়ে এক বারিতে খেলা ক'রছে, তার আড়ালে আবার তাদের প্রকাশের পূর্ব্বে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় রাখবার এক বারি, চরমে সবাইকের আড়ালে যেখানে এক মহাবীজে অনন্ত সৌর জগতের বীজ সে আর এক বারি। এক মহাবারির তিন ভাব।

শিশু জ'ন্মে দুগ্ধেই জীবন ধারণ করে। জগতের জীব দুগ্ধেই বেঁচে থাকে। দুধ প্রাণধারণের প্রধান খাদ্য একথা সবাই জানে। এটা কিন্তু অনেকেই জানে না, সব খাদ্যই দুধ, দুধ ছাড়া কিছু নয়। বৈজ্ঞানিকের কাছে শুনে থাকবে ভাই যে বড় বড় সব খাদ্যকেই এখন

দুধে পরিণত করা যাচ্চে,এমন কি কালে নাকি সব অন্নরস দুধের আকারেই বিজ্ঞান কেণা বেচার বাজারে সাজাতে পারবে। যাক্ সে কথা। মোটের ওপর খাদ্যের ভেতরে দুধের ভাবই তার শরীরপোষণের শক্তির মূল। জীবের জীবন অন্নরসে বলাও যা, দুগ্ধের রসে বলাও তাই। জীবনের এই মন্ত্রটি বিচার ক'রে পুরাণের কবি তাই সৌর জগতের জীবন 'ক্ষীর-বারিতে' নির্দ্দেশ ক'রেছেন। আমার জগতের সূর্য্য এই জগতের সব প্রাণ নিজের কেন্দ্রে নিয়ে 'ক্ষীর-সমুদ্রেই' ভেসে ভেসে আছেন। সব জগতের সব সূর্য্যই এইরকম 'ক্ষীরসমুদ্রে'। তার পরেই কবির ভাবে ভাবলে পাবে 'গর্ভসমুদ্র' অনন্ত 'গর্ভবারি'। এই গর্ভবারিতে অনন্ত সৌর জগতের. বীজ এসে সৌর জগতের জন্মের পূর্ব্বে থাকছে, অনন্ত কাল ধ'রে এই গর্ভবারি থেকেই সৌর জগৎ প্রকাশ পেয়ে ক্ষীরবারিতে ভেসে আসছে। এর পরেই মূলে সেই সমস্ত জগতের প্রাণের চরম বীজের বারি,'কারণ বারি'. 'কারণ সমুদ্র।' মহাপ্রাণের বিশ্বলীলার বীজ এই 'কারণ-বারিতেই' প্রথমে ফেলা হ'য়েছিল, ভাবতে গেলে এই রকমেই ভাবতে হয়।

সেই বীজে অনন্ত বীজ, অনন্ত জগতের সৃষ্টি। পরিণামে এই 'কারণ-বারিতেই' সব সৌরজগৎ লয় পাচ্ছে, সেই খান থেকেই আবার সব ক্রমে বেরিয়ে আসছে। প্রাণের আকর্ষণের ভাব ভাবলে বুঝতে হয় সব প্রাণ প্রথমে সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য্যমণ্ডলে 'আকৃষ্ট', তারপর সূর্য্য-মণ্ডলের প্রাণ 'গর্ভবারির' প্রাণের কেন্দ্রে 'আকৃষ্ট', তার পর আবার সমস্ত গর্ভবারিরই প্রাণ 'কারণ-বারির' প্রাণের কেন্দ্রে'আকৃষ্ট'। এই ভেবেই পুরাণের কবি বলেন, বিশ্বপ্রাণের এক 'সংকর্ষণ' দেবতা কারণবারিতে গর্ভবারিতে আর ক্ষীরবারিতে শুয়ে আছেন। জলে শুয়ে আছেন ব'লে ইনিই নারায়ণ। প্রাণের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বারি ছাড়া আর কিসে এঁর অধিষ্ঠান হ'তে পারে? সূর্য্যের প্রাণেই এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে খুঁজতে হয় ব'লে ইনিই 'সূর্য্যনারায়ণ'। ক্ষীরসমুদ্রের বুকে মরণের জগতের জীবন্ত প্রাণের অধিষ্ঠানে বিরাজমান

বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুপুরুষ, বিরাট্‌পুরুষ ইনিই; গর্ভবারির অন্তরে থেকে মরণের জগতের গর্ভডিম্বে প্রাণ সঞ্চারণ ক'রেছেন এই মার্ত্তণ্ডপুরুষ, এই হিরণ্যগর্ভপুরুষ, এই ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মা; আবার কারণবারিতে থেকে অনন্ত জগতের বীজ শক্তির অধিষ্ঠান হ'য়ে আদি পুরুষ, মরণের প্রাণের চরম মূর্ত্তিতে 'শেষ' পুরুষ, বিশ্বলীলায় পূর্ণপ্রাণ 'পুরুষ' 'অনন্তদেব' ইনিই। সূর্য্যের প্রাণ ভাই এই সব বিষ্ণু দেবতার ভাবে। সেই বিষ্ণুর তেজই এঁর প্রাণের বরণীয় তেজঃ। দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ঐ সব বারিরাশি আলোড়ন ক'রে, প্রাণের জ্যোতিঃ, প্রাণের আলো, প্রাণের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় আদিত্যপুরুষকে পেলাম বটে ভাই, কিন্তু ঐ আলোয়, ঐ রশ্মিতে মরণের একটা ছায়াও পাছে পাছে র'য়েছে, এটাও বেশ ধ'রতে পারা যায়। মরণ ভাই জীবনেরই কপট ভাব একথা কি বোঝ না? যে মরে সে জীবনটা পাল্টে নেবারজন্যেই মরে, কাজেই মরাটা একটা ছলনার ভাব বৈ আর কিছুই নয়। জগতের প্রাণ নিয়ে যে মরণের খেলা চ'লছে এও তা হ'লে একটা অমর প্রাণের ছলনার লীলা। জগতের প্রাণের আলোয় পাশে যে ছায়া আসে, সেটা, সেই অন্ধকারটা, সেই মরণের অন্ধকারটা, একটা খাঁটি জ্যোতির্ম্ময় প্রাণের লুকোচুরি ভাব ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। তার লুকোচুরির খেলায় আলো আঁধার, নিজে সে পূর্ণ আলোকে নিয়তই আলোকময়। তার ভেল্কিবাজিতেই, তার ইন্দ্রজালেই, মরণের ছলটা জগৎকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। সূর্য্যমণ্ডলের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে খুব সন্তর্পণে এই ছলনার জাল, মায়ার জাল,ভেদ ক'রে দেখতে পারলেই, ঐ সকল প্রাণের প্রাণ, মরণের অতীত, ছলনার অতীত, নিত্য সনাতন পরম পুরুষ, আপনাতে আপনি পূর্ণ, নিত্য ঐশ্বর্য্যে, নিত্য রসে, নিত্যজ্ঞানে, নিত্যসত্তায় বিরাজমান শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে দেখতে পাবে। পূর্ণ শুদ্ধ 'সত্ত্বে'র জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় খাঁটি সত্তার তেজের, খাঁটি জ্ঞানের প্রকাশের, খাঁটি আনন্দের সৌন্দর্য্যের আলোকে দেদীপ্যমান, সূর্য্যমণ্ডলের অন্তরালে প্রকাশমান শ্রী 'বসুদেবে'র আত্মাতে ইনিই।

সেই দেবের সহচরী দিব্যজ্যোতির কেন্দ্রে, শ্রী'দেবকীর' গর্ভে, ইনিই। তাঁরই বিশুদ্ধ পূর্ণ ধাম,—যে ভাবে তাঁর অমর ভাব, আনন্দের সকল বিঘ্নের অতীত ভাব, জ্ঞানের সকল বাধার অতীত ভাব, অকুণ্ঠ ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই ধামই—শ্রী'বৈকুণ্ঠ' ধাম। তাঁকে নিয়েই, মরজগতের অন্তরালে যে অমর তেজঃ, যে তেজের প্রভাবে জগৎ সব ম'রেও মরে না, বাঁচতেই মরে, ম'রে বাঁচে, সেই তেজের মহাজ্যোতির 'গো'লোক। তাঁকে নিয়েই, যে দীপ্তির প্রভাবে জগতের সব পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণিক ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূলে অফুরন্ত অক্ষয় জ্ঞানের প্রভা, যে প্রভা না থাকলে জীবের জ্ঞানেন্দ্রিয় অজ্ঞানের আঁধারেই ডুবে থাকত, কিছুই দেখতে পেতনা, সেই জ্ঞানের আলোকে আলোকময় 'গো'লোক। তাঁকে নিয়েই, যে ভোগের সৌন্দর্য্যে, আনন্দের রূপে, আকৃষ্ট হ'য়ে জীব কোথায় ঐ সৌন্দর্য্য, কোথায় ঐ সৌন্দর্য্য ব'লে নানান্ ভোগ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্চে, কোথাও ঠিক সেটি পাচ্চেনা, সেই শুদ্ধ আনন্দের মূল সৌন্দর্য্যের দ্যুতিতে দ্যুতিমান্ মহারসজ্যোতির 'গোলোক'। গোলোকের আদিত্যনারায়ণের জ্যোতিই জীবের থাকবার তেজের মূল স্থান, জ্ঞানের আলোকে দৃষ্টির মূল দৃষ্টিদ্বার, সৌন্দর্য্যের ভোগে আনন্দের রসের চরম গুপ্তক্ষেত্র। স্থিতির, জ্ঞানের, ভোগের সব সম্বন্ধ আকর্ষণ ক'রে, যে আকর্ষণের বিপরীত গতিতে, ছলনার শক্তির গতিকে, মায়ার জগতে হাতরা হাতরি টানাটানি, যাতে মায়ার জীব বেঁচে বাঁচেনা, জেনে জানে না, সুখে সুখ পায় না, সেই সব টানের সব টান মূলের দিকে গুটিয়ে নিয়ে, সেই মূল আকর্ষণের তেজে তেজোময় পুরুষ ব'সে আছেন 'শ্রীকৃষ্ণ' বাসুদেব।

প্রাণের আলোতেই যখন এই সূর্য্যনারায়ণ দেব বিরাজমান, তখন যেখানে প্রাণের সন্ধান পাব সেইখানেই অবশ্য তাঁকে পাব। জীবে জীবে প্রাণ। সর্ব্বত্রই জীব,সর্ব্বত্রই প্রাণ। সর্ব্বত্রই জীবের প্রাণে প্রাণে, প্রাণের ভেতর, দেখলেই দেখবে এই আলো। এই জ্যোতিঃ নিয়েই

জীব বাঁচে, জানে, সুখ করে। জীবের অন্তরের মধ্যেও সুতরাং ঐ সূর্য্যনারায়ণ। প্রাণের অন্তরে, তার শুদ্ধ অন্তরালে, মহাজ্যোতির অবকাশ। সেই দিব্য আকাশে, পরম ব্যোমে, প্রাণের সূর্য্যনারায়ণের গোলোক। সেইখানে অধিষ্ঠিত হ'য়েই তিনি জীবের জীবনকে সত্তার তেজে, জ্ঞানের আলোকে, আনন্দের শ্রীতে, সম্পন্ন ক'রেছেন। জীব যখনই নিজের জ্ঞানের সুখের সত্তার ছলনাময় সম্বন্ধ, বিপরীত আকর্ষণ, সোজা ভাবে টানতে পারে, সব সম্বন্ধকে এক ক'রতে পারে, সবেতে আপনাকে, আপনাকে সবেতে ধ'রতে পারে, এক টানের মহাতেজে নিজের সব টানের তেজঃ এনে তার মধ্যেই সেই তেজকে স্থাপিত ক'রতে পারে, তাতেই নিজের তেজকে 'অন্তর্হিত' ক'রতে পারে, তখন সেই আসল সম্বন্ধের আকর্ষণে, শুদ্ধ যোগে, জীব নিজের অন্তরেই ঐ প্রাণগোবিন্দের 'পাদ' মূলে, সেই রশ্মিতে নিজের প্রাণকে সেই মহাপ্রাণের স্ফুলিঙ্গ ব'লে হৃদয়ঙ্গম ক'রে কৃতার্থ হয়। আপনাকে আপনি হারিয়ে, প্রাণ গোবিন্দের 'পাদচ্যুত' হ'য়েই, জীব মরণের ছায়ায়, অজ্ঞানের ছায়ায়, দুঃখের ছায়ায়, অভিভূত হয়। প্রাণের ভেতরেও যে আলো, বাইরেও সেই আলো, একই সূর্য্যের দিব্য জ্যোতিঃ। ভেতর বার মায়ার ছলনায়, প্রাণহারা প্রাণের বিড়ম্বনায়। আলোর প্রকৃতি যে ধ'রতে পেরেছে, সে সূর্য্য মণ্ডলের ভেতর দিয়েও যাঁর সন্ধান পায়, প্রাণের ভেতরেও তাঁরই সন্ধান পায়। একই আলোকের একই অধিষ্ঠান। মায়ার আঁধার ওর ওপরে এসে প'ড়লেই অখণ্ড প্রাণের খণ্ড ভাবের ছলনায়, ঐ প্রাণসূর্য্য নানাভাগে যেন খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে পড়ে বটে, কিন্তু সব আঁধারের আড়ালেই এক প্রাণসূর্য্য। তোমার আমার সব জীবের খণ্ড প্রাণের এক এক মূল সত্য তেজঃ যেখানে, যে 'সত্য' লোকে, সেই সত্য লোকেই, সকল প্রাণের, সর্ব্বব্যাপী প্রাণের অখণ্ড তেজঃ দেদীপ্যমান। সত্যদেব সত্যনারায়ণ এক গোলোকে, এক জ্যোতির্লোকে থেকেই সবাইকের কাছে আলাদা আলাদা মত ধরা দেন। সমস্ত খণ্ড খণ্ড প্রাণের মূল অবকাশ যেখানে, সেই খানেই

এক অখণ্ড পরম ব্যোম, পূর্ণ গোলোক, তাতেই প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রাণ-সূর্য্য 'ছন্ন' মূর্ত্তিতে, মৃত্যুর ইন্দ্রজালে, আবৃত হ'য়ে, নানান্ দিক্ দিয়ে নানান্ ভাবে 'গো' চর হ'য়ে থাকেন। প্রতিপ্রাণের হৃষীকেশই ক্ষীরবারির বিষ্ণু, গর্ভবারির হিরণ্যগর্ভ, কারণবারির সংকর্ষণ, আবার সকল 'উপাধির' অন্তরালে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। সবই সেই এক প্রাণ সূর্য্য সত্যদেব সত্যনারায়ণের লীলা। চরমে ঊর্দ্ধে প্রাণের এক অখণ্ড সত্য ভাবের লীলা। নীচে খণ্ড প্রাণের ভাবে, মিথ্যার ছলনায় সত্যের ভাবে, মরণে জীবন্ত, অজ্ঞানে জ্ঞানময়, দুঃখে সুখের ভাবময়, বিচিত্র লীলা। আলোয় আঁধারে, প্রাণের কপট প্রাণছাড়া ভাবে, প্রাণের আলোর দিকেই জীব ছুটো ছুটি ক'রছে, পূরো পূরি থাকার মত থাকতে পারে না ব'লে প্রাণের আশা ছাড়ে না, পূরো পূরি জানতে পারে না বলে জানবার আশা ছাড়ে না, পূরো পুরি সুখ পায় না বলে সুখের আশাও ছাড়ে না। প্রাণের গোলোকে প্রাণের জ্যোতির আলো তার কখনই নেবে না।

(২৫)

পূর' প্রাণ

অখণ্ড প্রাণের দেবতার সিংহাসন যে আদিত্যমণ্ডলের কেন্দ্রে, সেই কেন্দ্রে, সেই গোলোকধামে, সেই অমৃত জ্যোতির নিকেতনে, মরণের প্রভাব,—একেবারেই শূন্য প্রাণকে অষ্টে পৃষ্ঠে আকষ্ট বন্ধনে অপ্রাণের বিড়ম্বনায় বেঁধে রাখে যে 'যম', প্রাণের প্রাণীর সেই 'সংযমন' কারী দেবতার অধিকার,—সকল রকমেই 'কুণ্ঠিত',

কোনও দিকেই তার প্রসর নেই। মহাতেজের প্রাণের দেবতা, নিজের ইচ্ছেয়, নিজের মায়ায়,আপনার ভাব আপনাতে লুকিয়ে,নিজের 'ছায়াটা' নিজের 'সংজ্ঞাটা' মাত্র ধ'রে, নামে প্রাণ হ'য়ে, খেলার খেলা খেলতে কাজে যখন প্রাণছাড়া হ'তে চায়,তখন সে সেই ভাবে,সব জগতের বিচিত্র সৃষ্টির ভাবে, মরণের খেলায়, অমর প্রাণকে নানান্ স্তরে সাজাব এই 'বিশ্বকর্ম্মার' ভাব অনুসরণ করবার রীতিতে, সকল প্রাণের সকল প্রাণীর বাঁচবার তেজের মহা-অধিষ্ঠানের ভাব, 'বিবস্বানের' ভাব, ছেড়ে, জন্মের ধারা এনে, মরণের ধারাকে পেছুতে রেখে, 'নব জাত' প্রাণের ভাব, 'বৈবস্বত' ভাব ধ'রে,জন্ম মরণের জগৎ,প্রাণিজগৎ শাসন ক'রতে থাকে, নানান্ রঙে, নানান্ ঢঙে, মরা প্রাণকে বিচিত্র বিধানে সাজিয়ে নিয়ে সবাইকে পরস্পরকে দেখায়, কিন্তু নিজের প্রকৃত ভাবে, নিজের ধামে, নিজের আসল অধিষ্ঠানে, খেলার ঐ ছলনার আবরণকে, মায়ার আবরণকে, কোনও রকমেই স্থান পেতে দেয় না, মরণের ছায়াকে সেই পুণ্যলোক স্পর্শ ক'রতেও দেয়না, সব দিকে প্রাণের দিব্য জ্যোতিই ছ'ড়িয়ে রেখে দেয়। মরণ খেলার জিনিষ, কপটতার জিনিষ, প্রাণের নিজের জিনিষ নয়। আবার যেখানে মরণের ভান সেই খানেই জন্মের ভান। খেলা যত ক্ষণ জন্ম মরণও ততক্ষণ। তাই বিশ্বমণ্ডলে, যেটা প্রাণের খেলারই ক্ষেত্র সেই মায়ার জগতে, জন্ম আর মরণের অনন্ত প্রবাহ সব দিকেই চ'লেছে। নানা আকারে নানান্ উপাধিতে এই জন্ম মরণ। যত কিছু সংসারের পরিবর্ত্তন সবই এই জন্ম মরণ। মরা বাঁচা বাঁচা মরার, হওয়া যাওয়া যাওয়া হওয়ার ভাবেই সমস্ত পরিবর্ত্তন,সব জিনিষের সব অদল বদল ভাব, পরিবর্ত্তনের তা ছাড়া আর অন্য মানে নেই। এক ভাবে না এক ভাবে কিছু না ম'রলে, এক ভাবে না এক ভাবে একটা নূতন কিছু না জন্মালে,পরিবর্ত্তন ঘটেই না। গাছ পালা কীট পতঙ্গ মানুষ পশু স্থাবর অস্থাবর এক দিকে না এক দিকে এ ক রকমে না একরকমে ম'রে আর জ'ন্মে তবে সংসারের ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ঘটাচ্ছে। পরিবর্ত্তনের সংসারে প্রাণ প্রতিপদেই নিজের ভাব বেশ ফোটাতে গিয়ে বাধা

পাচ্ছে, মরণের হাতে প'ড়ছে, কুণ্ঠিত হয়ে প'ড়ছে, নিজের তেজঃ তাকে কেবলই 'সংকুচিত' ক'রে নিতে হচ্ছে। নিত্য প্রাণের, শুদ্ধ প্রাণের, 'আদিত্য' ধামে কিন্তু এই 'সংকোচ', এই 'কুণ্ঠা' একেবারেই নেই। প্রাণের অবাধ নিত্য জ্যোতির লোক সেই ভাবে বৈকুণ্ঠ লোক। প্রাণের সেখানে সকল ভাবেই অবাধ প্রসর ; সত্তায়, জ্ঞানে, আনন্দে কোনও দিকে কোনও রূপ সংকোচ সেখানে থাকতে পারে না ; প্রাণ সেখানে সত্তায় ভোরপূর, জ্ঞানে ভোরপূর, আনন্দে ভোরপূর। যে ভাবেইপ্রাণ থাকুক না কেন, 'বৈকুণ্ঠে' সেই ভাবেই প্রাণ সব ভাব নিয়ে আছে, আবার একটা ভাবের সবটা নিয়ে, সবটা জুড়ে, আছে। খণ্ড প্রাণের জগতে, মরণের অস্ত্রে খণ্ড বিখণ্ড প্রাণের দেহে, এ ওর নয়, ও তার নয়, সে এর ওর নয়। একটা মরণের প্রাণীর দেহ, একটা খণ্ড, একটু খণ্ড নিয়ে, নিজের সত্তা জাহির করে। তার সে সত্তায় সমস্ত জগৎ জ'ড়িয়ে থাকতে বোঝা যায় না। সে একখণ্ডে থাকলে অপর খণ্ডে তার থাকবার অধিকার যেন থাকেই না। সত্তাতেও যা, জ্ঞানেও তা। জানবার সব ধারাই ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ। সব জীবই একটু দেখে, একটু শোনে, একটু বোঝে। একটু অল্প পরিসরের মধ্যেই প্রত্যেকের জ্ঞান। ভোগের দশাও ঠিক এমনি। সবই অল্প আয়তন নিয়ে, অল্পের সংসর্গে ভোগ। একটা খণ্ড জীবনের সারা জীবনটাতেও যতটা ভোগ, তার পরিসরটা মাপতে চেষ্টা ক'রলেও বোঝা যায় অতি অল্প ভোগ। রহস্যটুকু কিন্তু এর ভেতর এই, যে স্বল্প পরিসরে নিজের সত্তা, নিজের জ্ঞান, নিজের ভোগ, ভোগ ক'রতে ক'রতেও জীব অনন্ত পরিসরে সেই সত্তা, সেই জ্ঞান, সেই ভোগ, ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রাখে। খেলতে ব'সেও প্রাণ প্রাণে প্রাণে নিজের ভাব সমজাতে পারে। সবাই আমার হোক, আমি সবাইকে নিয়ে থাকি, সব জানি, সব ভোগ করি, এই ভাব প্রাণের অন্তঃস্তরে সকল সময়েই জেগে আছে। সেই ভাবটা চরিতার্থ করবার জন্যেই জীবের খণ্ড প্রাণের জগতে চারিদিকে ছুটোছুটি, আকুলি বিকুলি। মায়ার আবরণে ছায়ার প্রসরে প্রাণের

দিব্য অমর জ্যোতিঃ খণ্ড বিখণ্ড হ'য়েই সকল রকমে প্রকাশ পায়। মায়ার অতীত বৈকুণ্ঠ ধামে সেই জ্যোতিঃ সকল ভাবেই অখণ্ড। যে প্রাণ অখণ্ড প্রাণের ভাগীদার, সেই ভক্তির প্রাণ, সেই ভক্তের প্রাণ, জ্ঞানে কর্ম্মে ভোগে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুভাবে বিষ্ণুময়, বৃহত্তম ভাবে 'ব্রহ্মময়', নির্ব্বাধ ভাবে 'শিবময়'। খণ্ড প্রাণে একটার সঙ্গে আর একটার সম্বন্ধ ঘ'টিয়ে তবে তার থাকা, তবে তার জানা, তবে তার ভোগ। পিতা পুত্র সম্বন্ধে, বীজ প্ররোহ সম্বন্ধে, জীবের সত্তা। একই প্রাণের কারণ আর কার্য্যে দুটা পৃথক্ ভাব, পৃথক্ খণ্ড নিয়ে জীবের জন্ম স্থিতি। যে দেখে, যাকে দেখে, প্রাণের এই দুটা খণ্ড ধ'রে জীবের খণ্ড জগতে জ্ঞান। যে প্রাণের সংসর্গ, যার ঘনিষ্ঠতায় ভোগ, সেই ভোগের প্রাণ, আর যে ভোগ করে তার সেই ভোগের প্রাণ, আলাদা থেকেই ভোগের উপকরণ গুছিয়ে দেয়। বৈকুণ্ঠের ব্রহ্মময় শিবময় বিষ্ণুময় প্রাণে থাকার, জানার, আনন্দ করবার এ বিড়ম্বনা আপনা হ'তেই খ'সে যায়। ভক্তের সেখানে অধিষ্ঠান সর্ব্ব ঘটে, জ্ঞান কাজেই তার সর্ব্বব্যাপী, ভোগেরও তার বাধা বিঘ্ন নেই। একপ্রাণে সেখানে সবপ্রাণ, সব প্রাণে একপ্রাণ, সবই এক প্রাণের শুদ্ধ ভাব, শুদ্ধ লীলা, দিব্য লীলা।

গোলোকে এই বৈকুণ্ঠ ভাব কোথা থেকে আসে, কেন আসে ব'লতে পার কি ভাই? প্রাণের রহস্য একটু আলোচনা ক'রলেই ব'লতে পারবে তাতে আর সন্দেহ নেই। মরণের হওয়া যাওয়ার ভাব, চঞ্চল 'রজোভাব', দারুণ 'তমোভাব', প্রাণকে রাঙ্গিয়ে তোলার ভাব, প্রাণকে আঁধারে টেনে নিয়ে ঢেকে ফেলার ভাব, যখন টুটে যায়, যেখানে টুটে যায়, সেই ভাবে, সেই 'বিরজার' ক্ষেত্রে, সেই 'তমসার পারে', কেবল প্রাণের তেজোময় ভাব, দিব্য অমর জ্যোতিঃ, 'শুদ্ধ' 'ঊর্জ্জিত' 'সত্ত্বই' প্রকাশ পেয়ে থেকে। সেই সত্ত্ব, সেই প্রাণ, মর জগতের প্রাণের আড়ালে থাকলেও, মর জগতে তার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হ'তে পারে না, কেবল অমর বৈকুণ্ঠ লোকেই তার পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব। এই সত্ত্বের তেজে

জীব হ'য়ে ম'রে স্থির হবার চেষ্টা অনুক্ষণ ক'রছে, মরণের প্রভাবে স্থির হ'তে কখনও পাচ্চে না। মরণের হাত ছাড়িয়ে এই সত্ত্বের পূর্ণ প্রভাবে ভক্তির প্রাণের স্থির ভাব সকল দিকেই অকুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ে। তখন তার সত্তায় 'স্থির' প্রাণের ভাব, জ্ঞানে 'স্থির' প্রাণের ভাব, ভোগে 'স্থির' প্রাণের ভাব। শুদ্ধ প্রাণের বৈকুণ্ঠ লোকে ভক্তের জীবন অস্থির হ'তে পায় না, ভক্তের জ্ঞান অস্থির হ'তে পায় না, ভক্তের ভোগ অস্থির হ'তে পায় না, ভক্তের কোনও ভাবই অস্থির হ'তে পায় না। আপন ছাড়া যেখানে কিছু নেই, সবই যেখানে আপনার ভাব, সেখানে কার বীজে কে হবে, কোন ভূতে কে মিশবে, কাকে কে জানবে, কাকে নিয়ে কে আনন্দ ক'রবে? তবে কি সেখানে প্রাণ 'জীবনভ্রষ্ট', 'জ্ঞানভ্রষ্ট', আর 'ভোগভ্রষ্ট'? না তাহ'লে ত প্রাণ প্রাণভ্রষ্টই হ'য়ে পড়ে। না বাঁচা না জানা না ভোগ করা ত' মরণেরই কথা। প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের এই তিন ভাব। বৈকুণ্ঠের প্রাণ আপনার সব ভাব নিয়েই আপনি আছে, আপনার সব ভাব নিয়েই আপনি জানে, আপনার সব ভাব নিয়েই আপনি আনন্দ করে। শুদ্ধ লীলায়, নিত্য লীলায়, প্রাণের নিজের বিচিত্র অনন্ত ভাবই শুদ্ধ প্রাণের জীবনের, জ্ঞানের, ভোগের উপকরণ।

শুদ্ধ সত্ত্বের, মহাসত্ত্বের, মহাপ্রাণের অনন্ত মহাভাবের, আড়ালে সর্ব্বত্রই এক অখণ্ড স্থির অমর নিত্য নিষ্কপট ভাব। থাকা থাকাই, চিরকালই থাকা, কালের অতীত হ'য়ে থাকা, সব জায়গার থাকা, স্থানের অতীত হ'য়ে থাকা, কোনও রকমে কোনও দিক্ দিয়েই না থাকার ভাব তাকে ছুঁতে পারে না। জানা জানাই, সব জানা, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কিছুই সে জানার বাইরে থাকে না, সে জানা স্থানের ধার ধারে না, কালের ধার ধারে না, কখনও সে জানায় এটুকু বা সেটুকু জানা হয় এ ধাঁধাঁ আসে না। ভোগ ভোগই, সব নিয়ে আনন্দ, সকল সময়েই আনন্দ, স্থান কাল অতিক্রম ক'রে সে আনন্দ, বিষাদের ছায়ায় সে আনন্দ একটুও ঢাকা প'ড়তে পায় না। যা হ'তে

থাকা, যা নিয়ে থাকা, নিজ থাকা ছাড়া তারা আর কিছু নয়। যে জানে যা জানে সে দুইই জানবার ভাবে মিশিয়ে যায়। যে ভোগ করে, যা ভোগ করে, সে দুইই আনন্দের ধারা মাত্র, পৃথক্ ভাবে থাকে না। প্রাণের গর্ভেই প্রাণ, প্রাণের আস্পদেই প্রাণ, সেই প্রাণই স্থিতির ভাবে। প্রাণই জানে, প্রাণকেই জানে, জানাতেই প্রাণ। প্রাণই ভোগ করে, প্রাণকেই ভোগ করে, ভোগেই প্রাণ, প্রাণেই ভোগ। নব রঙ্গে এক রঙ্গ, এক রঙ্গে নব রঙ্গ। সেই এক রঙ্গে অনন্ত রঙ্গ। তিন ধারা এক স্রোতেই মিশেছে, এক স্রোতই তিন ধারায় ব'য়েছে। থাকা ছাড়া জ্ঞান নেই, ভোগ নেই। জ্ঞান ছাড়া থাকা নেই, ভোগ নেই। ভোগ ছাড়া থাকা নেই, জানা নেই। প্রাণের থাকাই প্রাণের জানা, প্রাণের ভোগ করা। প্রাণের জানাই প্রাণের থাকা, প্রাণের ভোগ করা। প্রাণের ভোগই প্রাণের থাকা, প্রাণের জানা। সব যেখানে একভাবে, একভাব যেখানে সব ভাবে, সেখানে ধারার ভেদ ধরার ভেদ মাত্র। সব প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানই থাকা, সব প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানই জানা, সব প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানই ভোগ। মরণের জগতে মরণের কপট আবরণে নানান্ দিকে প্রাণ নানান্ ভাবে ঢাকা পড়ে ব'লে থাকা না থাকা হয়, জানা না জানা হয়, ভোগ দুর্ভোগ হয়, আবার থাকাতেই জানা হয় না ভোগ হয় না, জানাতেই থাকা হয় না ভোগ হয় না, ভোগেতেই থাকা হয় না, জানা হয় না। থাকার বাঁধুনি, জানার বাঁধুনি, ভোগের বাঁধুনি যে এক সূতাতেই আছে, ছলনার কপট অস্ত্রাঘাতে সেই সূতাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখতে হয়। এককে সব দিকেই আলাদা আলাদা দেখতে শিখিয়ে প্রাণের প্রাণছাড়া ভাবের ছল একে তিন তিনে নয়, নয়ে নয়ে অনন্ত সাজিয়ে তোলে। সাজিয়ে তোলায় দুঃখ নেই, দুঃখ এই অনন্ত ভাবে এক ভাবের, এক প্রাণের, এক মহাসত্ত্বের প্রভাব ধারণা ক'রতে দেয় না। একভাবে অনন্ত ভাব, অনন্ত ভাবে একভাব ধরাই প্রাণের অকুণ্ঠ ভাব, বৈকুণ্ঠ ভাব। প্রাণে এ জীব যতক্ষণ

না জাগে ততক্ষণ সকল রকমে সীমাবদ্ধ হ'য়ে, সংযমিত হ'য়ে, যমের শাসনে থাকা, সেই শাসনে জানা, সেই শাসনে ভোগ করা। আমি এতটুকু, এইটুকু জানছি, ঐটুকু ভোগ ক'রছি, এই বুঝে, ততক্ষণ বিড়ম্বিত হ'তে হয়। থাকার সঙ্গেই তখন জানবার ভোগের যা জানছি পাচ্চি এ ভাববার অধিকার পাইনে। জানবার সঙ্গেই জীবনের সন্ধান আনন্দের সন্ধান পাইনে। আনন্দের সঙ্গে জীবনের খোঁজ, জ্ঞানের খোঁজ থাকে না। বাঁচনে অজ্ঞান, বাঁচনে দুর্ভোগ, জ্ঞানে কষ্ট, জ্ঞানের চেষ্টায় জীবনী শক্তির হ্রাস, আনন্দে মোহ, আনন্দে জীবনধ্বংস পদে পদেই মর জগতের খেলায় ফুটে ওঠে। এখানে জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ, আনন্দের সম্বন্ধ, যেন নেই। দীর্ঘজীবী ব'লেই জ্ঞানী নয়, দীর্ঘজীবী ব'লেই সুখী নয়। এখানে জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের আনন্দের যেন সম্বন্ধ নেই। জ্ঞানী জ্ঞানের চর্চ্চায় আয়ুঃক্ষয় ক'রছে, তার মুখ দুঃখের কালিমা যেন ঢেকে দিয়েছে, এ দৃশ্য চারিদিকেই। ভোগী এখানে ভোগের বিড়ম্বনায় মরণকে ডেকে আ'নছে, নানা রকমে নিজের মূঢ়তার পরিচয় দিচ্ছে। প্রাণের ভাব প্রাণ ছাড়া পথে এসে এইরূপ নানান্ বিপত্তি ঘ'টিয়ে তোলে। শুধু কি তাই? বাঁচনেও জীব পদে পদে মরণ ভোগ ক'রছে, যখন জানে তখন কিছুই জানলাম না বোঝে, সুখের আড়ালেও মহাদুঃখ ভোগ করে। প্রাণ খণ্ডিত হ'য়ে এমনি ভাবেই কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। একবার অখণ্ড ভাব যখন জেগে ওঠে, তখন সে প্রাণ সমস্ত প্রাণের ভাগীদার হ'য়ে দাঁড়ায়, সেই মহাভক্তিতে জ্ঞান, সত্তা, আনন্দ, সব একাধারে, তখন তাদের ভেদ নেই, ভেদে সম্পূর্ণ অভেদ। পূর্ণ প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন ভাব পোষণ ক'রতে পারে না। প্রাণের বৈকুণ্ঠ ভাবে, প্রাণছাড়া হবার, ছিন্ন প্রাণ ভিন্ন প্রাণ হবার ভাবের, অতীত ধামে, খাঁটি সত্যময় প্রাণের ভাবে, সত্তায় জ্ঞানে ভোগে ভেদ নেই ব'লে এমন কথা ভেবনা ভাই যে সেই মহাপ্রভাব সত্ব, অমৃত জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্ব, নিরাকার নিরাধার শুদ্ধ চৈতন্যেরই সত্ব, মাত্র জ্ঞানেরই প্রাণ। ইচ্ছা হয় তুমি সেই অকুণ্ঠ মহাচৈতন্যের

ভাবে বিভোর হ'য়ে, সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানের ভাবে বিহ্বল হ'য়ে থেকে, আর কোনও দিক্ ধারণা করবার চেষ্টা না ক'রতে পার, কিন্তু তা ব'লে এটা মনে ক'রলে ভুলে হবে,ভুল বলি কেন অপরাধ হবে,প্রাণের পূর্ণ বিভূতিকে লঘু করা হবে, অমান্য করা হবে, যদি মনের কোণেও এমন ভাবনাকে স্থান দাও, যে সর্ব্বব্যাপা চৈতন্যের পাশেই সর্ব্বব্যাপা সত্তা নেই, সর্ব্বব্যাপা ভোগ নেই। সর্ব্বদাই ধারণায় রাখতে হবে, যে ভাবি আর না ভাবি, শুদ্ধ সত্ত্বে সকল অবস্থাতেই তিন শুদ্ধ প্রবাহ, সত্তার, জ্ঞানের, ভোগের প্রবাহ, আর সেই তিন প্রবাহের অনন্ত অথচ অখণ্ড ধারা। অনন্ত অখণ্ড ভাবে তিন ভাব, আর তিন ভাবে একভাব ব'লে, এক ভাবেও যে তিন ভাব আর তিন ভাবে অনন্ত অখণ্ড ভাব সে সত্য অপলাপ করবার জো নেই। অকুণ্ঠ প্রাণে সব ভাবই সত্য, ছলনার লেশ মাত্র নাই; জ্ঞানও যেমন সত্য, জ্ঞানের অনন্ত ভাবও তেমনই সত্য, পূর্ণ সত্য, আবার জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের মত সত্তায় সত্য, সত্তার অনন্ত অখণ্ড ভাবও সত্য, আনন্দও সত্য, আনন্দের অনন্ত অখণ্ড ভাবও সত্য। এইটুকু ভুলে গেলে বিষম বিড়ম্বনায় প'ড়তে হয়। এই বিড়ম্বনায় প'ড়ে কেউ ভাবেন বৈকুণ্ঠ ভাবে কেবল জ্ঞান, নিরালম্ব জ্ঞান, তাতে জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই, আমি জানছি, অমুকটা জানছি এভাব নেই। হরি হরি, তা যদি হ'ত ত জ্ঞান আর দাঁড়াত কোন ভিত্তিতে? যেখানে জ্ঞানের কোনও উপকরণই নেই সেখানে জ্ঞান কোথায়? সে জ্ঞান ত অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র। আসল কথা বৈকুণ্ঠের ভাবেও জ্ঞাতা আছে, জ্ঞেয় আছে, আমি জানছি, অমুকটা জানছি এ ভাব অবশ্যই আছে। রহস্যের মধ্যে এই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান তিনই যে একভাবেরই ধারা সেটাও অবাধে সেই ভাবে বুঝতে পারা যায়। একভাবের ধারা ব'লে তারা অসত্য নয়, ছলনা নয়, কেন না বৈকুণ্ঠের প্রাণে ছলনার গন্ধ থাকতে পারে না। আরও এক রহস্য এই যে তিন ধারাই অনন্ত অখণ্ড। যা কিছু জানবার সবই এক সূতোয় বাঁধা, জ্ঞানের ছিন্ন ভিন্ন ভাব মোটেই নেই। ইচ্ছে হয় জ্ঞানে

একটা ভাবের ওপর, জানবার একটা জিনিষের ওপর, অভিনিবেশ হ'তে পারে, তা ব'লে কখনও প্রাণের সমগ্র ভাব অকুণ্ঠ প্রাণের জ্ঞানের অগোচর থাকে না। এক বিজ্ঞানের সঙ্গে সকল বিজ্ঞান বাঁধা, সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে এক বিজ্ঞান বাঁধা। কেউ মিথ্যে নয়, সব সত্য। জ্ঞান পূর্ণ ভাবে কখনই সর্ব্বস্বহীন হয় না, আপনার ভাণ্ডার খালি ক'রে ফেলে না। পূর্ণ জ্ঞানে চারিদিকে জানবার অফুরন্ত ভাণ্ডার। শুধু আপনাতে আপনি থাকা কথার কথা, জ্ঞানের কথা নয়। তৃতীয় রহস্য এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণভাবে পূর্ণ সত্তা পূর্ণ ভোগ। জানবার ধারার সঙ্গে থাকবার ধারা, আমি আছি এই ধারা, পূর' মাত্রায় জেগে ওঠে। যেখানে যা কিছু আছে সবাইকে নিয়ে সবাইকের সঙ্গে একপ্রাণে গাঁথা হ'য়ে আছি, আমাকে ছেড়ে কেউ নেই, কাউকে ছেড়ে আমি নেই, সকলের সঙ্গেই আমার অচ্ছেদ্য অভেদ্য সম্বন্ধ, সব এক আত্মা একপ্রাণ, দেহের সব আলাদা আলাদা ভাব, আলাদা আলাদা ভাবে এক অখণ্ড ভাব। থাকবার ধারার পাশেই আনন্দের ধারা, ভোগের ধারা। সবাই আমার প্রাণ, আমি সবাইকের প্রাণ, সবাইকে নিয়ে আমি পূর্ণ, সবাই আমাকে নিয়ে পূর্ণ, আমার ভোগে সবাইকের ভোগ, সবাইকের ভোগে আমার ভোগ, সব ভোগের, সব আনন্দের, সবাই অংশী, সব ভক্তই ভাগীদার, পূর্ণ অংশের অংশীদার, একপ্রাণে সব প্রাণ, সব প্রাণে একপ্রাণ, এই খাঁটি এক প্রাণতার ভাব বৈকুণ্ঠের ভোগে নির্বাধ। বৈকুণ্ঠ পুরুষ ইচ্ছে হ'লে জ্ঞানের সত্তার ভোগের একভাবের আড়ালে অন্য ভাবকে রেখে দিয়ে একভাব নিয়ে মেতে থাকতে পারে ব'লে সেই সব অনন্ত অখণ্ড ভাব প্রকৃত আড়ালে প'ড়বে না, অসত্যের আবরণ না এলে আড়াল দেবে কে ? বৈকুণ্ঠে এক সত্যে সব সত্য, সব সত্যে এক সত্য। এইকুটু হৃদয়ে বেশ ক'রে ধারণা ক'রে এইবার একবার বোঝ দেখি ভাই বৈকুণ্ঠলোকের কি মহিমা, সে লোকের কত বিভূতি, কত শুদ্ধ সম্পদ, প্রাণ সেখানে কত অনন্ত ভাবে সম্পন্ন, কত অনন্ত ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত !

সবই সেখানে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত, সবই সেখানে পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানী, সবই সেখানে পূর্ণ ভোগে ভোগী। অপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান, অপ্রতিষ্ঠ ভোগ, অন্ধ স্থিতি, অন্ধ ভোগ, কষ্টের জ্ঞান, কষ্টের জীবন, কোনও রূপে এই পূর্ণ প্রাণের লোকে সম্ভবপর হয় না। জ্ঞান থাকার, আনন্দ থাকার, পূর্ণ আকারে থাকার, সব দেহই জ্ঞানময়, সব আনন্দই জ্ঞানময়, পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞানময়, সব দেহই আনন্দময়, সব জ্ঞানই আনন্দময়, পূর্ণ আনন্দে আনন্দময়। সবাই সেখানে সবাইকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক দেহই সব নিয়ে পূর্ণ। সব জ্ঞানই একজ্ঞানে, প্রত্যেক জ্ঞান সকল জ্ঞানে পূর্ণ, সব আনন্দই এক আনন্দে, প্রত্যেক আনন্দই সব আনন্দে পূর্ণ। প্রাণে যেখানে ছেদ ভেদ নেই সেখানে এমন ছাড়া অন্য ভাব দাঁড়াতেই পারে না। বৈকুণ্ঠের লীলা সমগ্র অংশে পূর্ণ লীলা, প্রত্যেক অংশে পূর্ণ লীলা। এ লীলা সর্ব্বোতো-মুখী, এ লীলার কোনও দিকে আবরণ নেই।

একবার মর জগতের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখলে বুঝতে পারবে ভাই বৈকুণ্ঠলোকের মহিমা কত উচ্চে। মর জগৎও সচ্চিদানন্দ প্রাণের লীলা, অমর জগৎও সচ্চিদানন্দ প্রাণের লীলা। তফাৎ এই মর-জগতে খণ্ডিত প্রাণের খণ্ডিত লীলা, অমর জগতে অখণ্ড প্রাণের অখণ্ড লীলা। খণ্ডিত ভাব অবশ্য প্রাণের কপট ভাব, সত্য সত্য প্রাণ খণ্ডিত হ'তে পারেনা, তবে খণ্ডিত লীলায় ইচ্ছা ক'রে প্রাণ আপনার কাছে আপনি লুকোচুরী খেলে এই খণ্ড লীলার অভিনয় করে। এই খণ্ড লীলার অভিনয়েই জগতের মরণ লীলা, জন্মমরণের লীলা। খণ্ড লীলার অভিনয়ে প্রাণ খণ্ডিত, সত্ত্ব খণ্ডিত, সত্তা খণ্ডিত, জ্ঞান খণ্ডিত, আনন্দ খণ্ডিত। অখণ্ড লীলায়, সত্তায়, জ্ঞানে, আনন্দে, খণ্ড ভাবের, ভেদের, সম্পর্কই নেই। ভেদের স্রোতে প'ড়ে খণ্ড লীলায় জীবনের সঙ্গে মৃত্যু, জ্ঞানের সঙ্গে মোহ, আনন্দের সঙ্গে বিষাদ অনিবার্য্য। জীবন থেকে জীবনকে তফাৎ ক'রতে হ'লেই মরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। জ্ঞান থেকে জ্ঞানকে তফাৎ ক'রতে হ'লেই মোহের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আনন্দ থেকে

আনন্দকে তফাৎ ক'রতে হ'লেই বিষাদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। জিনিষ যখন প্রতিপদে নূতন হ'চ্চে, নূতন জীবনের ভাব ধ'রছে, তখন ব'লতেই হবে প্রতিপদে ম'রছে আর বেঁচে উঠছে। এক জীবনেও জীব এক জীবনের স্রোতে থাকে না। তার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন। তাই বলি সে ক্ষণভঙ্গুর। এক জীবনে অন্য জীবনে একই প্রাণের পরিবর্ত্তনে এই মরণের ছায়া স্পষ্ট, এক জীবনের মধ্যে সমস্ত পরিবর্ত্তনে অস্পষ্ট, এই মাত্র ভেদ। শুধু তাই নয় এক প্রাণে অন্য প্রাণে, এক জীবে অন্য জীবে,প্রাণের এক ভাব খণ্ড প্রাণে ঠিক নেই,একে অন্যে ঠিক সমপ্রাণতা জীবে নেই। অখণ্ড প্রাণে এই সমপ্রাণতা সম্পূর্ণ অটুট। এক অঙ্গে বাজলে অপর অঙ্গে সেখানে বাজবেই বাজবে। আত্মভোল প্রাণও প্রাণ ব'লে মর জগতে এই একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে প্রাণ প্রাণে প্রাণে ব্যাকুল হ'লেও কখনই তা প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারেনা। যতটা পারে ততটাতেই আত্মভাবের স্ফূর্ত্তি অনুভব ক'রতে পারে। বৈকুণ্ঠ ভাবে এই অনুভব স্বতঃসিদ্ধ। মর জগতের জীবের প্রাণের আশে পাশে চারিদিকের জীবের মরণের ছায়া অনুক্ষণ এসে প'ড়ছে, তার বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই। অমর জগতে কিন্তু কোনও রকমেই এ ছায়া কোন দিক্ দিয়ে প'ড়তে পায়না, কেননা সবই অচ্ছিন্ন এক অমর দেহের ভাবে। সত্তার ভাবেও যেমন জ্ঞানের ভাবেও তেমনি। বস্তুর জ্ঞান পদে পদেই বদলাচ্ছে, এখন যা জানছি পরক্ষণে তা অন্য রকমে জানছি, আমি যা জানছি অপরে আবার সেটা অন্য রকম জানছে। তা হ'লেই এ জ্ঞানে জ্ঞান স্থির হ'লনা, তাতে অজ্ঞানের ছায়া মিশিয়ে প'ড়ল। কত ভাবে কত রকমে কতদিক্ দিয়ে একটা জিনিষকে জানতে চেষ্টা করা হয় তা জানবার পদ্ধতি যে আলোচনা করে সেই জানে। তোমার আমার দৃষ্টিতেই এক জল কত রকমের, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে আবার সেটী অন্য কত রকমের,রসায়ন তাকে এক রকমে দেখতে ব'লবে, পদার্থ বিজ্ঞান তাকে আর এক রকমে দেখতে ব'লবে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন গুণে তাকে ভূষিত ক'রবে। জ্ঞানের খণ্ড ভাবের

দরুণেই এই বিড়ম্বনা। এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান সম্ভব যেখানে, সকল বিজ্ঞানে এক বিজ্ঞান সম্ভব যেখানে, সেই অখণ্ড জ্ঞানের লোকে এ বিড়ম্বনা উঠতে পারেনা। আনন্দের ভাবেও ঠিক এই রকম। যখনই একটা ভোগে তৃপ্তি না পেয়ে আর একটা ভোগে তৃপ্তি পাবার জন্যে ছুটি, তাতে না হ'লে, তার পর সেটা ছেড়ে আর একটা, এমনি চির জীবন ছুটো ছুটিই সার করি, তখনই পদে পদে বুঝি ,ভোগে সুখের তৃষ্ণা মেটে না, সুখের সঙ্গে দুঃখ ভোগের স্তরে স্তরে জ'ড়িয়ে আছে। আমার ভোগে আর অপরের ভোগে তুলনা ক'রেও একের সুখ অপরের দুঃখ প্রতিপদে হৃদয়ঙ্গম করি। আমার বড় সম্পদে অপরের সম্পত্তির হানি, অপরের বড় সম্পদে আমার সম্পত্তির হানি, জীবনের প্রতিব্যবস্থার কাজেই সম্পত্তির সুখের ভোগ একদিক্ দিয়ে না একদিক্ দিয়ে দুঃখে মাখান। যেখানে এক সম্পত্তিতে, এক প্রাণের ঐশ্বর্য্যে, সবাই সম্পন্ন, সকল সময়েই সম্পন্ন, সেই অখণ্ড লোকে বিষাদের ছায়ার অবকাশই থাকতে পারে না। প্রাণের সে ভাব নিত্য সম্পন্ন ভাবের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়।

সত্তার জ্ঞানের আনন্দের অকপট অবিচ্ছিন্ন ভাবের প্রবাহে বৈকুণ্ঠে মহাপ্রাণের ভক্তিবদ্ধ ভক্তের, বৈকুণ্ঠের ভাবের প্রাণে অনুপ্রাণিত জীবের, পূর্ণপ্রাণজীবময় বৈকুণ্ঠের কোনও ধারেই জন্ম নেই মরণ নেই, স্থিতির বিকার নেই, অনুভব নেই, মোহ নেই, জ্ঞানের বিকার নেই, অনুরাগ নেই, বিতৃষ্ণা নেই, উৎসাহের বিকার নেই। এই প্রাণে আছে কেবল শুদ্ধ স্থিতি, শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ উৎসাহ, চারিদিকে অবিচ্ছিন্ন অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত উৎসাহ। শুদ্ধ সত্ত্বের যে ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই বৈকুণ্ঠে নাই। সব দিকেই সব ভাবেই বৈকুণ্ঠ শুদ্ধ সত্ত্বের শুদ্ধ প্রাণের জগৎ। নূতন কিছু সেখানে হ'চ্ছেনা, পুরাণ কিছু সেখানে ঘুচে যাচ্ছেনা, যা কিছু আছে, আর থাকবার যা তা সবই আছে, সে সবই নিছক আছে। বীজে জীবের প্রবেশ নেই, গর্ভে

জীবের স্থিতি নেই, গর্ভ হ'তে মুক্তিতে উৎপত্তির নিবৃত্তি নেই, জন্মের একটা ধারাও বৈকুণ্ঠের জীবন স্রোতে বয় না। এইখানে অবশ্য একটা মস্ত আশঙ্কা মনে ওঠা খুব স্বাভাবিক। বড় বড় ঋষিরা, পূর্ণজ্ঞানের পরমহংসরা এক বাক্যে ব'লেছেন, সংসারের জীব মুক্তি পেলেই বৈকুণ্ঠভাব পায়, ভক্তির চরম সোপানে বৈকুণ্ঠলোক পায়। তা যদি হ'ল তাহ'লে বৈকুণ্ঠে ত মুক্ত জীবের নূতন প্রবেশ স্বীকার ক'রতে হয়। আপাততঃ সমস্যাটা খুব জটিল মনে হ'তে পারবে, কিন্তু সমস্যাটার অস্তিত্বই নেই। প্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে জীব শুদ্ধ প্রাণেরই পুরুষ, বৈকুণ্ঠেরই পুরুষ। সব জীবই আপনাতে আপনি বৈকুণ্ঠময়। ছলনার ছেদের ভেদের ভাব, প্রাণছাড়া ভাব, টুটে গেলে, জীব আপনাতে আপনার প্রতিষ্ঠাই পেলে। নূতন কিছু পেলে না। ছলনার বেড়াটা ভেঙে গেল এই মাত্র। বৈকুণ্ঠের ভাবে সে যা ছিল তাই রইল। যেটা হ'য়েছিল ঘুচে গেল। সেটা তার বৈকুণ্ঠভাবের নীচের ভাব, সে ভাবের বাইরের ভাব। বাইরের ভাবও ছল মাত্র, খেলার ছল, ইচ্ছে ক'রে আপনা হ'তে আপনাকে লুকানর ছল। সেটা গেল এল তাতে আসলের কিছুই গেল এলনা। প্রাণ আপনাতে আপনি বৈকুণ্ঠেরই। সকল অবস্থাতেই সে বৈকুণ্ঠের। বৈকুণ্ঠ থেকে কেউ সত্য সত্য বেরিয়ে যায় না, সেখানে সত্য সত্য কেউ নূতন আসেনা। যেটা বলি বাইরে সেটা ছলনার ছল। প্রাণ মাত্রেই বৈকুণ্ঠে, বৈকুণ্ঠ ছাড়া প্রাণ নেই। বৈকুণ্ঠ থেকে জীবের অধঃপতনের কথাও যা শোনা যায়, আর জগতের কোটি কোটি জীব যে বৈকুণ্ঠভাব হ'তে ভ্রষ্ট জীব সেও ত বেশ বোঝা যায়, সেটাও, বৈকুণ্ঠের সেই মরণের কথাটাও, ছলনার কথা। যা নিয়ে মর জগতের মরণের ভাব, মরণের সেই আরম্ভের ভাব, তার অনুবৃত্তির ভাব, তার নিষ্পত্তির ভাব, দেহের জীবশক্তির ক্ষয়, ক্ষয়জন্য বিকৃতি, শেষে দেহ ত্যাগ, তা সব শুদ্ধ প্রাণের দেহে, সর্ব্বপ্রাণব্যাপী দেহে অসম্ভব। প্রাণের তেজঃ যেখানে অক্ষয় অজর অমর সেখানে মৃত্যুর ভাব হয়ও

না, থাকেও না, তার সমাপ্তিও নেই। বৈকুণ্ঠ ভাব থেকে জীবের স্খলন ছলনার ঘেরার মধ্যেই বদ্ধ। ছলনারই উৎপত্তি, ছলনারই নিবৃত্তি। জন্মের প্রবাহ, সংসার, ছলনারই উৎপত্তির স্রোতে। মোক্ষে তার নিবৃত্তি। প্রাণের বৈকুণ্ঠভাব অন্তঃ প্রাণে নিত্য জাগরূক। জগতে স্থিতির সঙ্গেও যে হওয়া যাওয়া জড়ান, অবস্থার এধার ওধার পরিবর্ত্তন, নিত্য উপচয় অপচয়, সেই থাকবার শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি বৈকুণ্ঠের প্রাণে নেই। প্রাণের সর্ব্বব্যাপী তেজঃ কি কারণে ক্ষুণ্ণ হবে, অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবে? ছলনার আবরণ তেজের বাইরের জিনিষ, সেই আবরণেই হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব, ছেদ ভেদ সম্ভব। অন্ধকারে আলোকের স্ফুরণ কমে বাড়ে, অখণ্ড আলোক নিজেতে নিজে ক'মতে বাড়তে পারে না। বৈকুণ্ঠে এইরূপে জন্মরহিত, মরণরহিত, শুদ্ধ-স্থিতিই স্বতঃ সিদ্ধ। স্থিতির নয় ধারার শুদ্ধ সত্ত্বের ধারাটিই বৈকুণ্ঠে অক্ষুণ্ণ। জ্ঞানেরও এমনি। প্রাণের সব সম্বন্ধই যেখানে এক যোগে অবস্থান ক'রছে, যেখানে সম্বন্ধের হওয়া যাওয়া নেই, সেখানে নূত সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ নেই, অনাগত সম্বন্ধের অনুমান নেই, কল্পিত সম্বন্ধের আস্থা নেই, অনুভবের কোনও ধারাই নেই, আবার সম্বন্ধের ছেদের বিস্মৃতি নেই, সম্বন্ধের ভেদের ভ্রান্তি নেই, সম্বন্ধের লোপের সংশয় নেই, মোহের কোনও ধারাই নেই, ওদিকে সম্বন্ধ ভাববার, সম্বন্ধ বিচার করবারও কিছু নেই, ধ্যান নেই, যুক্তি নেই, আছে এক নিত্য সুলভ যোগজ্ঞান, নিত্য যোগের, নিত্য সমাধির ধারণা, কেননা জানবার নসব সম্বন্ধেরই একযোগে এক প্রাণে স্থিতি। সব সংসর্গ সব সঙ্গ এক প্রাণের যোগে আছে ব'লে ভোগের ধারাতেও বৈকুণ্ঠে অবিচ্ছিন্ন প্রীতির উৎসাহ, তা ছাড়া সংসর্গের হওয়া যাওয়ায় ছেদ ভেদ লোপে অনুরাগ, হাসি, কান্না, বিতৃষ্ণা, বিস্ময়, ঘৃণা, ক্রোধ, ভয় কিছুই নেই। বৈকুণ্ঠের নিরবচ্ছিন্ন স্থিতির, নিরবচ্ছিন্ন ধৃতির, নিরবচ্ছিন্ন প্রীতির অবাধ ভাবের অখণ্ড অখণ্ড ধারার পরিচয় দিতে গিয়ে ভাবুক রসজ্ঞ মর্ম্মবিদ্‌গণ মরণের স্থিতির, মরণের ধৃতির, মরণের

প্রীতির ভাষায়, অগত্যা তাদের পরিচয় দেন ব'লে মনে ক'রনা ভাই মরণের ভাব বৈকুণ্ঠের স্থিতি বৈকুণ্ঠের জ্ঞান বৈকুণ্ঠের ভোগকে ছুঁতে পারে।

এইবার একবার ভাই নিজের প্রাণের সিঁড়ি ধ'রে গোলোকে বৈকুণ্ঠধামে উঠে দেখ সে ধামে কি অনন্ত অখণ্ড ঐশ্বর্য্য, অনন্ত অখণ্ড জ্ঞান মহিমা, কি অনন্ত অখণ্ড মাধুর্য্য। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ছলনার জগতের অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অকপট সত্তার শক্তি ঐ বৈকুণ্ঠে। জগতের জীবের সমস্ত স্তরের সত্তা, সত্তার একমাত্র অধিষ্ঠান, ঐ বৈকুণ্ঠ-লোকেই প্রতিষ্ঠিত। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগৎ প্রাণে প্রাণে ঐ খানে। ঐ খানেই নিত্য ব্রহ্মাণ্ডপতিগণ, নিত্য প্রজাপতিগণ, নিত্যদেবগণ, নিত্য জীবগণ, বিরাজমান। অনন্ত শক্তির আধার বাসুদেবের অধিষ্ঠানেই, সেই বিরাট্ দেহেই সকলের আসন। ছলনার জগতে সকলের ছলনার খেলা, নিত্য লীলা নিত্যভূমিতেই। সকল জীবেরই পূর্ণভাব বৈকুণ্ঠে, ছলনায় ছিন্ন ভিন্ন অপূর্ণ ভাব সংসারে। বৈকুণ্ঠের বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ গো বৃষভ সুর নর 'স্থাবর' 'জঙ্গম' যত কিছু সবই পূর্ণ প্রাণের শ্রীতে শ্রীমান্। ছলনায় তাদের শ্রীভ্রষ্ট ভাব জগতেই বদ্ধ। অখণ্ড প্রাণের জ্যোতিতে শ্রীদেবী সমস্ত জীবের বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য বিধান ক'রছেন। বলা বাহুল্য তিনি বাসুদেব নারায়ণেরই সহচরী, তাঁরই অর্দ্ধাঙ্গিনী। জ্ঞানে জ্ঞানের চরম সোপানে সিদ্ধ যোগিগণ, নিত্যযোগিগণ, পূর্ণজ্ঞানের মূর্ত্তিতে পরমহংস ঋষিগণ, যোগেশ্বরগণ জ্ঞানের সকল কলা পূর্ণভাবে ঐ বৈকুণ্ঠে বিস্তার ক'রে রেখেছেন, সেখানকার সবাই সেই অনন্ত জ্ঞানের ভাগীদার। ছিন্ন জ্ঞানের ছিন্ন প্রাণের জগতের প্রবাহে এই সব অখণ্ড কলারই খণ্ড বিকাশ। জ্ঞানের সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ বিদ্যাদেবী দ্বিতীয় নারায়ণী ভাবে সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত। আনন্দে, ভোগের চরম রসে, বৈকুণ্ঠের নিত্য মধুময় ভাবে, নিত্য মধুবনে, প্রাণের শুদ্ধ সংসর্গের পূর্ণ সিদ্ধিতে, যাদের পাবার সব দিকে সবাইকে পেয়ে, পূর্ণ প্রীতিতে, এই রসময়

ধামে এক প্রাণে সকল প্রাণের নিত্য বিলাস, নিত্য লীলা। আনন্দের ভাবে গোলোকের গোষ্ঠে সবাই গোপ গোপী গোপেশ্বরকে ঘিরে আছে, তারই ভাবে মেতে আছে। প্রীতির পূর্ণ ধারা সেই ভাবে। গোপেশ্বরী এই আনন্দের লীলার শক্তি, নারায়ণী শক্তি। জীবজগৎ চারিদিকে এই রসের লোভে ব্যাকুল হ'য়ে বেড়াচ্চে, ছলনায় প'ড়ে খণ্ড প্রীতিতে পূর্ণ প্রীতির আস্বাদনে বঞ্চিত হ'চ্চে।

(২৬)

প্রাণের সাধনা

প্রাণের সত্তা প্রাণের কর্ম্মে একথা বেশী ক'রে বোঝান আর আবশ্যক হয় না। মরণের জগতেও দেখা যায় যেখানে ক্রিয়ার অভাব, যেটা নিশ্চেষ্ট, যেটা শুধু জড় সড় হ'য়ে আছে নিজে কিছু করে না, সেই খানেই বলা যায় একটা প্রাণের অধিষ্ঠান নেই, সেটা প্রাণ-হীন জড় পদার্থ। খাঁটি প্রাণহীন অবশ্য কিছু থাকতে পারে না, কেননা সত্তাই প্রাণ। তবে যেখানে কতকগুলা ছোট প্রাণ জড় হয়, অথচ আর একটা বড় প্রাণের অধিষ্ঠানে সমবেত ভাবে কাজের পরিচয় দেয় না, সেই খানে আমরা বুঝি সমবেত ভাবে সেটার একটা আলাদা সত্তা নেই, আলাদা জীবন নেই। নইলে সকল জড়ের প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, প্রত্যেক অণু প্রাণে প্রাণের কার্য্য আছেই আছে। আসল কথা একটা অখণ্ড প্রাণের কার্য্যেই একটা অখণ্ড প্রাণের সত্তা। কাজেই প্রাণ, প্রাণেই কাজ। প্রাণের এ ভাব ছাড়া প্রাণকে বোঝবার জো নেই। মর জগতের ছিন্ন ভিন্ন কুণ্ঠাগ্রস্ত প্রাণেও 'এই,' অমর

জগতে বৈকুণ্ঠভাবের পূর্ণ অখণ্ড প্রাণেও এই। প্রাণে কাজ কাজ কাজ কেবলই কাজ। থাকা আর কাজ করা প্রাণের পক্ষে একই কথা। প্রাণের ঘুম নেই, প্রাণের বিশ্রামও ঠিক নেই। প্রাণের নিদ্রা যোগনিদ্রা, প্রাণের শান্তি যোগের শান্তি। এক কর্ম্মক্ষেত্রের দিক্ থেকে অন্য কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে প্রাণকে স'রিয়ে নিয়ে যোগ করাই প্রাণের নিদ্রাসুখ, বিশ্রামসুখ অনুভব করা। প্রকৃত প্রস্তাবে কাজের ভার মাথা থেকে ফেলে দিয়ে প্রাণ আরাম পায় না, সুখ পায় না। প্রাণ কাজ নিয়েই নিত্য সুখী, সেই আরামেই 'আত্মারাম'। কাজের ধারার এদিক্ ওদিক্ এই মাত্র। মরণের জগতে মরণের প্রাণের চারিদিকে যে সব কাজ সেই সব কাজ থেকে অবসর নিয়ে প্রাণ নিজের দিকে আপনাকে গুটুতে গুটুতে, অন্তরের প্রাণের ক্ষেত্রের দিকে আপনাকে টে'নে নিয়ে, সেই দিকের কাজে যখন লাগে, তখনই সে প্রাণের বাহিরের ভাবে বিশ্রাম মাত্র, অন্তরের ভাবে অন্য কাজের ধারা। স্বপ্নে ভাবনার কাজ, সুষুপ্তিতে ভাবনার কাজ, এমন কি সমাধিতেও ভাবনার কাজ। বাইরে সৃষ্টি ছেড়ে অন্তরে সৃষ্টির কাজে প্রাণের আরাম। মরণের জগতে কাজে চেষ্টায় সৃষ্টিরই ধারা। এটা ক'রছি ওটা ক'রছি,এর মানে এটা সেটা নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলছি ছাড়া কিছু নয়। যেখানে মরণ নেই, সেখানে অমর প্রাণের কাজে অখণ্ড প্রাণের এক এক অখণ্ড ভাবে অভিনিবেশ মাত্র, একথা বলাই বাহুল্য। কুণ্ঠাহীন প্রাণের প্রত্যেক দিব্য ভাবই সমস্ত ভাব নিয়ে, কাজেই এক অভিনিবেশেই সব ভাবে অভিনিবেশের কাজ হয়। বৈকুণ্ঠের প্রাণের কাজ তাই সকল অবস্থাতেই সর্ব্বব্যাপী। সর্ব্বব্যাপী হ'য়েই একনিষ্ঠ। যেখানে একে সব, সবে এক, সেখানকার জীবনের এই বিচিত্র রহস্য। ফল প্রাণ মরণের ফাঁসই গলায় পড়ুক, আর অমর ভাবেই থাকুক, সে সকল ভাবেই কাজে কর্ম্মে ব্যাপৃত। কাজে কর্ম্মেই প্রাণ নিজের পরিচয় দেয়।

বৈকুণ্ঠের অনন্ত অখণ্ড বিভুতিতে প্রতিষ্ঠিত থেকেও এই কাজ-

কর্ম্মের জন্য প্রাণ আপনাকে আপনি 'বলি' দিয়েছে। নিরালম্ব শূন্য প্রাণে কাজ সম্ভবেনা, এক একেশ্বর হ'য়ে ঐশ্বর্য্য করা চলে না। প্রাণ তাই নিজেই নিজের অখণ্ড বিভূতি চারিদিকে সাজিয়ে তোলে। চারিদিকে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ, তাদের নিয়েই প্রাণ মহাপ্রাণ হ'য়ে সর্ব্বেশ্বর, তাদের সম্বন্ধে তাদের ব্যাপারে ব্যাপৃত থেকেই 'কর্ম্মী'। সবই অখণ্ড, সবই 'স্বরাট্', তাদের নিয়ে মহাপ্রাণ স্বয়ং স্বরাট্, বিরাট্, অধিরাট্। এই রাজরাজেশ্বর ভাবের মূলে কিন্তু প্রাণের আত্মত্যাগ, আত্মাহুতি, আত্মবলি, আত্মযজ্ঞ। আপনার প্রাণ বলি দিয়ে, আত্মমেধ যজ্ঞে, আত্মপুরুষের যজ্ঞে, আত্মপুরুষ, পূর্ণপ্রাণ, মহাপ্রাণ বিশাল যজ্ঞবাটের অবতারণা ক'রেছেন। সার্ব্বভৌম রাজা রাজচক্রবর্ত্তী সেই যজ্ঞবাটে যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞপুরুষ। নিজের অখণ্ড অখণ্ডনীয় যজ্ঞ-শরীর থেকেই কর্ম্মযজ্ঞের সমস্ত উপকরণ। চারিদিকে নিত্য ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ ক'রে নিত্য প্রজাপতিগণ, অনন্ত ব্রহ্মা, অনন্ত প্রজাপতি-গণ, অনন্ত নিত্য ব্রহ্মাণ্ডের ভাবে যজ্ঞপুরুষের কর্ম্মযজ্ঞের সমাধান ক'রছেন। অনন্ত সুর, নর, তির্য্যক্ অখণ্ড দিব্য মূর্ত্তিতে এই কর্ম্মযজ্ঞের নানান্ কর্ম্মের ভাবে ব্যাপৃত। সবাইকের জীবন অনন্ত জীবনের জন্য উৎসর্গ করা। প্রত্যেকেই সবাইকের কাজে, সবাইকের নিজের কাজেই সকলের কাজ। একলা আপনার জন্য কাজ এই বৈকুণ্ঠে যজ্ঞপুরুষের যজ্ঞবাটে সম্ভবেনা। সর্ব্বেশ্বর সবাইকের প্রাণের কাজ ক'রে আপনি কর্ম্মী, প্রত্যেকেই সবাইকের কাজ ক'রে কর্ম্মী। সকল কর্ম্মে চরমে এক কর্ম্ম, একের কর্ম্ম, এক প্রাণের কর্ম্ম। বিরাট্ যজ্ঞক্ষেত্রে আত্মত্যাগের, সকলের উদ্দেশ্যে আত্মপ্রাণ উৎসর্গের, যজ্ঞে, সবাই যজমান। সবাই সবাইকের কাজ ক'রেই বাঁচছে। 'বিশ্বব্যাপী কাজ, সকলের প্রাণধারণের কাজ, মহাযজ্ঞের কাজ ছাড়া জীবন বৈকুণ্ঠে নেই। যজ্ঞেশ্বরের প্রাণই যজ্ঞ, যজ্ঞই প্রাণ, তিনি স্বয়ং যজ্ঞ, সেইভাবে তাঁহার চারিদিকের প্রাণও যজ্ঞের ভাবে অনুপ্রাণিত। চারিদিকেই প্রাণ সকল প্রাণের জন্য, কাজেই যজ্ঞের প্রাণযজ্ঞ।

যজ্ঞের মূলমন্ত্র সকল প্রাণের উদ্দেশ্যে আপন প্রাণের নিয়োগ। শুদ্ধ প্রাণের ধর্ম্মই এই। শুদ্ধ প্রাণ সব প্রাণের কাজ ক'রেই থাকতে চায়। সকল প্রাণের যিনি কেন্দ্রে তিনি তাই এক ব্রহ্ম হয়েও পূর্ণব্রহ্মের ব্রহ্মযজ্ঞের ভাবে নিজের প্রাণে অনন্ত প্রাণ গ'ড়ে, মহাসৃষ্টির নিত্য-যজ্ঞে আত্মবলি দিয়ে, শেষে সেইসব অনন্ত অখণ্ড প্রাণের জন্যই নিজের প্রাণ নিয়োগ ক'রে রেখে দিয়েছেন, তাতেই আর এক মহাযজ্ঞের ভাব নির্ব্বাহ ক'রে যাচ্চেন। তাঁর কাজ, বৈকুণ্ঠের সকল নিত্য জীবের কাজ। প্রত্যেক নিত্যজীবের কাজও সকলের কাজ আর তাঁর কাজ। যজ্ঞ ছাড়া কাজ নেই, কাজ ছাড়া যজ্ঞ নেই। নিত্য শরীরে শরীর ধারণের কাজ নেই, ক্ষুধা তৃষ্ণার কাজ নেই, লোকযাত্রার, লোককে বাঁচিয়ে রাখবার, কাজ নেই, আছে কেবল ভক্তির যজ্ঞ, ভক্তির কাজ, সবাইকে আপনার ক'রে, আপনাকে সবাইকের ক'রে নিয়ে থাকবার কাজ, এক প্রাণের মহাপ্রাণের কাজে সকল প্রাণের কাজ করবার কাজ। এক প্রাণে সকল প্রাণের ভাগীদার হওয়ার ভাব, সেইভাবে সকল প্রাণকে আপনার ভাববার ভাব পোষণ করা ছাড়া অন্য কাজ অমর প্রাণে সম্ভবে না।

সত্তার দিক্ দিয়ে, কর্ম্মের দিক্ দিয়ে যেমন দেখলে ভাই বৈকুণ্ঠ মহাযজ্ঞের ক্ষেত্র, বৈকুণ্ঠপতি স্বয়ং যজ্ঞ, যজ্ঞপুরুষ, বৈকুণ্ঠের প্রাণ যজ্ঞের প্রাণ, তেমনি জ্ঞানের দিক্ দিয়ে যদি দেখ ত' দেখবে ঐ পুণ্য-ক্ষেত্র মহাতপস্যার ক্ষেত্র, মহাযোগের ক্ষেত্র, মহাপ্রাণ ক্ষেত্রপতি মহাযোগেশ্বর, তাঁর দিকে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ যোগের প্রাণ। যোগের বলেই তিনি যোগের ক্ষেত্র সাজিয়েছেন, তাদের যোগেই তিনি যোগী, তাঁর যোগে সবাইকের যোগে সবাই যোগী, ভক্তিযোগের যোগী বৈকুণ্ঠ-ময়। মরজগতেও যোগের ভাব ছাড়া জ্ঞান নেই, যোগের কথা আর জ্ঞানের কথা ভাবলেই একথা বোঝা যায়। সর্ব্বত্রই প্রাণে প্রাণে এক হওয়ার ভাবে জ্ঞান ছিন্ন ভিন্ন প্রাণের জগতে ফুটিয়ে নিতে হয়, অখণ্ড প্রাণের জগতে এটা স্বতঃসিদ্ধ। সমস্ত অনুভবে

সমস্ত স্মৃতিতে, সমস্ত ভুলে, খণ্ড প্রাণের জগতে যত কিছু জ্ঞান এই প্রাণে প্রাণে ঐক্যে। জানবার ভাবের প্রাণ জানছি ভাবের প্রাণে মিশ না খেলে জ্ঞান হ'তেই পারে না। বৈকুণ্ঠের প্রাণে এই ঐক্য নিত্য বর্ত্তমান। খণ্ডিত প্রাণে এই ঐক্য প্রাণের ছলনার আবরণে কখনই পূর' মাত্রায় ঘ'টে ওঠে না। মর জগতের প্রাণে প্রাণে যে জানে যা জানে এই উভয় প্রাণে যতটুকু ঐক্য হয়, জ্ঞানও ততটুকুই হয়। ঐক্যের তারতম্যেই জ্ঞানের তারতম্য। জানবার বস্তু সাক্ষাৎ প্রাণে টেনে আনবার চেষ্টাতেই হউক, আর পরোক্ষ থেকে তাকে টেনে আনবার চেষ্টাই হউক, তার ধাতটা আপনার ধাতে ফুটিয়ে না তুললে জ্ঞান হয় না। যাকে জানছি সেইটার প্রাণে যা আছে সেইটুকু আমার প্রাণে জাগল, তবে জ্ঞান হল। সব প্রাণেই সব ভাবের অধিষ্ঠান, কাজেই জানবার জিনিষের ভাব যে জানে তার প্রাণে স্ফূর্ত্তি পাবে এতে বিচিত্র কিছুই নেই। তবে এ জগতে নাকি সব প্রাণই কপটতাময়, মায়ায় ছিন্ন ভিন্ন, তাই প্রাণে প্রাণে এক ক'রতে গিয়েও, সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন ভাব এক ক'রতে পারা যায় না। সর্ব্বত্রই প্রাণে অপ্রাণের ভাব, তাই মেলাতে গিয়ে অপ্রাণের ভাব এসে পড়ে, অজ্ঞান এসে পড়ে। জগতের প্রাণে প্রাণে পূর' ঐক্য নেই ব'লেই জ্ঞানে অজ্ঞান সর্ব্বত্র। তাহ'লেও ঐক্যের প্রসঙ্গেই জ্ঞান, অন্য রকমে জ্ঞান নয়। ভ্রষ্ট যোগে ভ্রষ্ট জ্ঞান। বৈকুণ্ঠে ঐক্য অখণ্ড প্রাণে নিত্য, যোগ নিত্য, জ্ঞান নিত্য, যোগ অখণ্ড, জ্ঞান অখণ্ড। এমন প্রাণ নেই যে সেখানে অন্য সব প্রাণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে আবদ্ধ হয়। সব প্রাণে এক, এক প্রাণে সব। সবাই একটা সর্ব্বব্যাপী প্রাণের ভাব পোষণ করে, সর্ব্বব্যাপী প্রাণের মহাযোগে মহাসম্বন্ধে সবাই যোগী, আর সেই সর্ব্বব্যাপী প্রাণ যোগেশ্বর। অথবা সেখানে সবাই যোগেশ্বর, তিনি যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। নিত্য ব্রহ্মাণ্ডে দিব্যর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, তপস্বিগণ, হংসগণ নিত্য দেহে এই যোগভূমিতে যোগারূঢ়। যোগী ছাড়া সেখানে কেউ নেই। সব প্রাণীই যোগী, সব প্রাণই যোগের

প্রাণ। সেখানকার তরুগুল্ম, পশুপক্ষী, সুরনর, সবই মহাপ্রাণের অচ্ছেদ্য যোগে, অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে, নিত্য জ্ঞানের মহাসমাধিতে যোগমগ্ন। যে যে ভাবেই থাকুক না কেন, নিত্য লীলার জন্য যে দেহই ধরুক না কেন, জ্ঞানের আকারে, চিন্ময় আকারে, প্রাণের চিন্ময় ভাবে, সবাই যোগেশ্বরের প্রাণ নিজের প্রাণে আশ্রয় ক'রে সর্ব্বপ্রাণব্যাপী যোগে যোগময়। সকল ভাবেই পূর্ণ যোগে পূর্ণ জ্ঞান অখণ্ড প্রাণের জগতে দেদীপ্যমান। অখণ্ড প্রাণের বৈকুণ্ঠ ধাম অনন্ত যোগের যোগাশ্রম।

সব প্রাণে এক প্রাণ, এক প্রাণে সব প্রাণ মিশুতে পারায় যেমন প্রাণের চরম যজ্ঞ, প্রাণের আসল কর্ম্ম, প্রাণের আসল সত্তা, আবার অন্যদিকে প্রাণের চরম যোগ, প্রাণের আসল চৈতন্য, আসল জ্ঞান, তেমনি আর একদিকে ঐ ভাবেই প্রাণের চরমপ্রীতি, প্রাণের আসল আনন্দ, প্রাণের আসল ভোগ। মরণের জগতে আমার প্রাণের সঙ্গে যা মিশ খাবে তাতেই সুখ পাব বুঝে সেই রকম প্রাণের সন্ধানে ছুটো ছুটি ক'রে আমরা বেড়াই। প্রাণের সঙ্গে অবশ্য প্রাণ ছাড়া অন্য জিনিষ মিশ খেতে পারে না। প্রাণের সঙ্গেই প্রাণের যথার্থ সংসর্গ হ'তে পারে। খণ্ডিত প্রাণ খণ্ডিত প্রাণের সংসর্গে আসতে গিয়ে এই শুদ্ধ সংসর্গ থেকে বঞ্চিত হয়, যে মেশে, যার সঙ্গে মেশে, দু'য়েতেই অপ্রাণের ছায়া পড়ায় প্রকৃত প্রাণে প্রাণে মিল হয় না, তাই খণ্ড প্রাণের জগতে সংসর্গের সুখ, প্রীতির সুখ, ভোগের সুখ নেই, যা হয় তা খণ্ড বিখণ্ড, দুঃখের আঘাতে চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন। অখণ্ড প্রাণের জগতে প্রাণের চারিদিকেই পূর্ণ সংসর্গ, কাজেই পূর্ণ সুখ পূর্ণ ভোগ। যে মহাপ্রাণের ভাব আশ্রয় ক'রে সবাই এক প্রাণ, সেই মহাপ্রাণ এই অখণ্ড ভোগে সকলের প্রাণপতি, প্রাণের প্রিয়তম পুরুষ, আনন্দের মহারাসের রাসেশ্বর, প্রীতির আকর্ষণে সকলকে আকর্ষণ ক'রে পূর্ণতম 'শ্রীকৃষ্ণ'। বৈকুণ্ঠভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রাসমণ্ডল। প্রীতির পূর্ণ সংসর্গ, আনন্দের মহারাস ছাড়া এ ভূমিতে আর কিছুই নেই। কর্ম্মের দৃষ্টিতে যেটা মহাযজ্ঞবাট, জ্ঞানের দৃষ্টিতে যেটা মহা

যোগাশ্রম, ভোগের দৃষ্টিতে সেইটাই মহারাসমণ্ডল। মরজগতে এই মহারাসের ভাব মায়ার আবরণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। সবাই এ জগতে সংসর্গসুখ পাবার জন্যই ব্যাকুল, কিন্তু বিড়ম্বিত। ছিন্ন প্রাণের মিলন পূর্ণ মিলনে কখনই পরিণত হ'তে পায় না। অচ্ছিন্ন প্রাণে এ রাস, মহাপ্রাণের ভক্তির রাস, ভক্তির প্রীতির রাস, অবিচ্ছিন্ন। সকল আনন্দের আনন্দকারী, আনন্দের মহাপ্রাণ 'নন্দনন্দন', এই নিত্য রাসমণ্ডলে সমস্ত নিত্য জীবের প্রাণের প্রীতির সমস্ত পূর্ণ ধারা নিয়ে, সমস্ত প্রাণময়ী মূর্ত্তিমতী প্রীতি নিয়ে নিত্য রাসবিহারী। এই নিত্য জগতে সমস্ত নিত্য জীবের দেহ একধারে ক্রিয়াময়, অন্য ধারে চিন্ময়, তৃতীয় ভাবে আনন্দময়। সবই প্রাণের ধারাভেদ। এই মরণের ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের গূঢ়তম অন্তরালে আনন্দময় 'মধু'বনের কেন্দ্রে যারা এই প্রীতিকে আনন্দযোগের শক্তিতে জগতের অতীত ভাবে আস্বাদন ক'রেছে, তারা নিত্য মূর্ত্তিতে নিত্যধামে রাসেশ্বরের আশে পাশে থেকে নিজেদের ভাব সেই সমস্ত আনন্দধামে সমস্ত প্রাণে ছ'ড়িয়ে রেখেছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডের গূঢ়তম প্রীতির লীলাই এইরূপে ঐ নিত্য ব্রহ্মাণ্ডসকলের নিত্য অধিষ্ঠানভূমিতে নিরন্তর জাজ্বল্যমান। বৈকুণ্ঠধাম পূর্ণ আনন্দের নিত্যধাম। সেখানে সব জীবই নিত্য আনন্দের প্রেমলীলায় মগ্ন। সেখানকার প্রাণ, সব স্থাবর জঙ্গম, মধুবনের কেন্দ্রের অখণ্ড অনন্তলীলা ছাড়া আর অন্য সুখ বোঝে না।

মরণের ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মের জ্ঞানের ভোগের চরম আদর্শের পরিচয় কোথায় পাব ? নিত্য জগতের নিত্য প্রাণের পরিচয় মর জগতে কেমন ক'রে নিতে হয় ? কেমন ক'রে আর নেবে ভাই ? প্রাণের ভিতর নইলে প্রাণের সন্ধান আর কোথায় নেবে ? কাজের নিত্যভাব বুঝতে হ'লে অবশ্যই দেখতে হবে প্রাণ নিজের ভাবে কি রকম কর্ম্মে ঢুকতে চায়, কর্ম্মে তার চরম লক্ষ্য কি? যেখানে এই রকম প্রাণের আদর্শ কর্ম্ম অবিচ্ছিন্নের মত হ'য়ে দাড়ায়, বুঝবে সেই প্রাণ মরণের জগতে থেকেও মরণের হাত এড়িয়ে অমর হ'য়ে এই আসল কর্ম্মের

ভাবে অভিনিবিষ্ট হ'য়েছে। জ্ঞানের নিত্য ভাব বুঝতে হ'লে দেখতে হবে চরমে কোন ভাব লক্ষ্য রেখে মরণের প্রাণ জ্ঞানের পথে ছোটে। যেখানে সেই চরম ভাব প্রাণে জেগেছে, যার প্রাণ সেই আদর্শ জ্ঞানের পথে দাঁড়িয়েছে, সেই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে, সে সেই জ্ঞানেই নিজের প্রাণকে অবিচ্ছিন্ন ক'রেছে, ক'রে জ্ঞানের ভাবে অমর ভাব লাভ ক'রেছে। নিত্য প্রাণের ভোগ বুঝতে হ'লে সন্ধান ক'রতে হবে, প্রাণ কিরূপ সংসর্গ ক'রে, কতটা সংসর্গ ক'রে, সুখ পাবার, অখণ্ড আনন্দ পাবার, আশা হৃদয়ে ধারণ করে, আর দেখতে হবে কিরূপ প্রেমে, কোন্ আনন্দে, কোন্ ভাগ্যবান্ এমনি নিরবচ্ছিন্ন সুখের নাগাল পেয়ে, সেই সুখে মগ্ন হ'য়ে, প্রেমের সেই আদর্শপ্রাণে মর্ত্তে অমর ভাব পেয়েছে। মরণের প্রাণ মরণের হ'লেও প্রাণ বটে। তাই প্রাণ নিজের দিকে ভাল ক'রে তাকালেই বোঝে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের অনন্ত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধেতেই প্রাণের সত্তা, প্রাণের জ্ঞান, প্রাণের ভোগ পূর্ণ মাত্রায় ঘ'টতে পারে। সব নিয়ে থাকায়, আপনাতে সবাইকে বোঝায়, সবাইকের হ'য়ে থাকায়, পূর' পূরি একপ্রাণতায়, প্রাণের যজ্ঞ, প্রাণের পূর্ণ জীবন, প্রাণের স্থিতি, প্রাণের যোগ, প্রাণের পূর্ণ চৈতন্য, প্রাণের পূর্ণ জ্ঞান,প্রাণের মহাপ্রেম,প্রাণের পূর্ণ আনন্দ, প্রাণের পূর্ণ ভোগ। জগতের ভাবে থাকলে প্রাণে এই মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি পূর্ণ ভাবে বিকাশ পেতে পারে না, মহাযোগের পূর্ণ সমাধি পূর্ণ ভাবে বিকাশ পেতে পারেনা, মহাপ্রেমের পূর্ণ রাস পূর্ণ ভাবে বিকাশ পেতে পারে না। 'প্রাণ কিন্তু প্রাণ ব'লেই মরণের জগতেও মরণের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই মহাযজ্ঞের, মহাযোগের, মহারাসের ভাব পরিস্ফুট করবার জন্যে লালায়িত হয়। প্রাণের মহাপ্রাণের ভাব সম্পূর্ণ আবিষ্ট না হ'লে তা পারেনা। শুদ্ধ প্রাণের ভাব যতক্ষণ না স্ফূর্ত্তি পাবে ততক্ষণ অপ্রাণের ছলনাত ঘুচবে না। অনেক সাধনার ফলে,ছলনার সমস্ত জাল ছেঁড়বার পরে, মরণের সমস্ত কুহক বুঝে প্রাণথেকে তাকে অপসারণ করবার

পরে, একনিষ্ঠ হ'য়ে কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে মহাপ্রাণকে আশ্রয়ে ক'রলে, মহাপ্রাণের পূর্ণ ভক্তিতে, ভক্তিযজ্ঞে, ভক্তিযোগে, ভক্তিপ্রেমে, প্রাণ আপনাকে আপনি ফিরে পায়, মরণের ভাব তার খ'সে যায়। তখন সে নিত্য যজ্ঞের প্রজাপতি ভাবে, নিত্য যোগের পরমহংসভাবে, নিত্য রাসের মহাসখ্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। সোজা কথায়, নিত্য প্রজাপতির ভাব, নিত্যযোগীর ভাব, নিত্য সখীর ভাব, তার প্রাণে পূর্ণ মাত্রায় আবিষ্ট হয়। প্রাণ তার অমৃত জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বময় ভাবে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তার যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বরের আবির্ভাব, তার যোগে যোগেশ্বরের আবির্ভাব, তার প্রেমে রাসেশ্বরের আবির্ভাব। শুদ্ধ প্রাণে সকল প্রাণের মাঝে মহাপ্রাণের সাক্ষাৎকার স্বতঃসিদ্ধ। মরণের ব্রহ্মাণ্ডেও এইরূপ ভাগ্যবান্ যজমানগণ যখন জগতে আবির্ভূত হন তখন তাঁদের মহাযজ্ঞেও যজ্ঞেশ্বর যে আবির্ভূত হন একথা বলাই বাহুল্য। যখনই কোথাও ভাগ্যবান্ জীবগণ জগতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছেন, তখনই যজ্ঞের প্রাণের প্রাণ ভগবান্ সেই যজ্ঞের, অনন্ত পরার্থপর যজ্ঞের, অধিনায়ক হ'য়ে, পরিচালক হ'য়ে, এসেছেন। কপট মরণের দেহ নিয়ে, কপট মরণের দেহধারী যাজ্ঞিকগণের প্রাণের কেন্দ্ররূপে তিনি জগতে বিরাজ ক'রেছেন। সকল সময়ে জগতের এমন সৌভাগ্য ঘটে না। জগৎ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে সাধারণতঃ অকর্ম্মের ছলনায় প'ড়ে অযজ্ঞের অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বহুভাগ্যে জগতের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও জগতের জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী যাজ্ঞিকের উদয়, তাঁরই প্রাণের দিব্য জ্যোতিতে আকৃষ্ট হ'য়ে শত শত যাজ্ঞিকের অভ্যুদয়, শেষে স্বয়ং যজ্ঞপুরুষের 'অবতার'। মরণের জগতে সাধারণের দৃষ্টিতে কিন্তু সকলেই সাধারণ মর্ত্ত্য পুরুষ, মরণের জীব। সাধারণ মর্ত্ত্য জীব সেই গূঢ় যজ্ঞের রহস্য ভেদ ক'রতে পারে না। যে সন্ধান নিতে চায়, যার প্রাণ এই যজ্ঞের খোঁজ নিতে ব্যাকুল, সেই এর সন্ধান পায়। ভগবানের যজ্ঞ অবতারের, প্রজাপতি গণের যজমানভাবে জগতে আবির্ভাবের, রহস্য সকলের জানবার 'নয়।

শুদ্ধপ্রাণ যজমানগণের অভ্যুদয়ে যেমন যজ্ঞপুরুষের অবতার, শুদ্ধ প্রাণ পরমহংসগণের অভ্যুদয়ে জগতে সেইরূপ হংসপুরুষ মহা-যোগেশ্বরের আবির্ভাব, শুদ্ধপ্রাণ প্রেমময় ভক্তগণের অভ্যুদয়ে আবার রাসেশ্বরের আবির্ভাব। কত ভাবে জগতে যে এই যজ্ঞপুরুষ ও যাজ্ঞিকগণ আবির্ভূত হ'য়েছেন, যোগেশ্বর ও যোগিগণ আবির্ভূত হ'য়েছেন, প্রেমপুরুষ ও প্রেমের ভক্তেরা আবির্ভূত হ'য়েছেন, তা বলা যায় না। এদের অবির্ভাবের পরবর্ত্তী কালেও মরণের জগৎ এই সব আদর্শ বুকে ক'রে রেখে ধন্য হ'য়েছে। মরণের প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে সকল সময়েই এই আদর্শ অনুসরণ করবার জন্যেই ছোটে। মরণের প্রাণ, মরণের জীব, যখনই পূর্ণ যজ্ঞের, পূর্ণ যোগের, পূর্ণ ভোগের সন্ধান পায়, তখনই তার প্রাণে স্বতঃসিদ্ধ বৈকুণ্ঠভাব নিত্যভাব আপনি প্রকাশ হ'য়ে পড়ে; তখন সে বোঝে অনিত্য ভাবে সে সংসারে, নিত্যভাবে নিত্যই সে বৈকুণ্ঠে, সে বৈকুণ্ঠছাড়া কদাপি নয়। এতক্ষণে যা বোঝা গেল তাতে এটুকু বেশ বোঝা গেল শুদ্ধ প্রাণে মরণের প্রাণ স্ফুরিত না হ'লে, মরণের প্রাণকে না জাগালে, মরণের প্রাণকে নিজের ভাব আপনি না বুঝিয়ে দিলে, মরণের প্রাণ কখনই ভক্তির পূর্ণ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ হ'তে পারে না। কর্ম্মে জ্ঞানে আনন্দে কোনও দিকেই নয়। শুদ্ধ প্রাণ যেখানে উপদেষ্টা, শুদ্ধ প্রাণ যেখানে আচার্য্য, মরণের প্রাণ যেখানে শিক্ষণীয়, মরণের প্রাণ যেখানে শিষ্য, সেই খানেই মরণের জীবের সৌভাগ্য উদয়ের সম্ভব। একবার তোমার পুণ্যময় ধর্ম্মশাস্ত্রের দিকে তাকিয়ে দেখ এই রহস্য সঙ্গে সঙ্গে তোমার দৃষ্টিগোচর হবে। যজ্ঞের ভাব যদি বুঝতে চাও দেখ তোমার যজ্ঞের প্রথম আচার্য্য কে? প্রথম শিষ্য কে? তোমার যোগের প্রথম আচার্য্য কে? প্রথম শিষ্য কে? তোমার প্রেমের প্রথম আচার্য্য কে, প্রথম শিষ্য কে? যজ্ঞধর্ম্মে, যোগধর্ম্মে, প্রেমধর্ম্মে কারা তোমার সমস্ত উপদেশের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন?

বৈদিক-ঋষির ভাষায় ব'লতে হ'লে বলা যায় সকল প্রাণের জন্য

আত্মোৎসর্গের মহাযজ্ঞে, কর্ম্মের চরম কর্ম্ম সৃষ্টির যজ্ঞে, অনন্ত প্রাণের জন্য আত্মবলি দিয়ে, প্রাণের সাক্ষাৎ দেবতা বৈকুণ্ঠ পুরুষ সেই সৃষ্টি যজ্ঞের নিজেই নারায়ণ ঋষি হ'য়ে, নিজের কাছে সেই যজ্ঞের গূঢ় রহস্য ব্যক্ত ক'রেছেন। শুদ্ধ প্রাণ মরণের প্রাণ হ'তে গিয়ে আপনার কাছে আপনি আত্মবলি যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছেন। সৃষ্টির পুরুষমেধ যজ্ঞে তাই পুরুষই দেবতা, নারায়ণ ঋষি। ব্রহ্মাণ্ডের মরণের প্রাণের এইখানেই যজ্ঞদীক্ষা, কর্ম্মের মূলসূত্র শিক্ষা। তার পর জগতে এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, প্রচার হ'ল কি করে? প্রচার ক'রলে কে? এ তত্ত্ব জানতে হ'লে বেশীদূর খুঁজতে হবে না। প্রাণ যেখানে মরণের হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, বিবস্বানের ভাব ছেড়ে বৈবস্বত ভাব ধ'রেছে, বৈবস্বতের অধিকারভুক্ত সমস্ত জীবকে ক'রেছে, সেই মরণের প্রাণের ঠাকুরের কাছে, বৈবস্বত ভাব যিনি আপনাতে মেনে নিয়েছেন সেই বৈবস্বত মনুর কাছে, বৈবস্বতের শাসনাধীন জীব তোমার সন্ধান নিলেই হবে। বৈবস্বত অধিকারে বৈবস্বত মনুই সকল প্রাণীর ওপর, মরণের প্রাণের সমস্ত স্তরের ওপর, রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে, যজ্ঞের আদর্শকেই মরণের জগতের প্রাণের নিকট আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ ধ'রে রে'খেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের পুরুষ নারায়ণের সৃষ্টিমূর্ত্তি ব্রহ্মার নিকট এই দীক্ষা নিয়ে বৈবস্বত মনু জগৎকে এই দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রেছেন, স্বয়ংও এই মহাব্রতে ব্রতী হ'য়েছেন। পুরাণের ভাষায় যজ্ঞের রহস্য এই ভাবেই ব্যক্ত। বৈশ্বানর তেজে, অগ্নির সর্ব্বজীবব্যাপ্ত তেজে, জগতের প্রাণের প্রতিষ্ঠা। সেই অগ্নিতে জগতের ভাবে প্রাণদেবতার যে কোনও ভাবকে ধ'রে, সেই দেবতাকে লক্ষ্য ক'রে, যজমান মানব তোমার জীবনের প্রধান উপকরণ, প্রাণের কর্ম্মে বেঁচে থাকবার যা প্রধান উপায়, তাই আহুতি প্রদান কর, তোমার প্রাণের ভাব তা হ'লেই জগতের প্রাণের ভাবে অর্পণ করা হবে, তখন সেই আহুতি আদিত্যের নিকট, অখণ্ড প্রাণের দেবতার নিকট পৌঁছাবে, ক্ষুদ্র প্রাণে, ছিন্ন প্রাণে, অখণ্ড মহাপ্রাণের ভাব জাগবে, সেই আহুতি সৃষ্টিদ্বারে অন্নদ্বারে জগতের প্রাণের পরিপুষ্টি

ক'রবে, তোমার উৎসর্গ করা জীবন সমস্ত জগতের প্রাণ হ'য়ে দাঁড়াবে, বৈবস্বত পুরুষ যজ্ঞের এই মন্ত্রে জীবের প্রাণের কর্ম্মের অধিকারী মানুষের প্রাণের মহাশুদ্ধির ব্যবস্থাই প্রচার ক'রেছেন। ভাই প্রাণের সাধনার জন্যে এই মহাযজ্ঞের মন্ত্র অপেক্ষা আর কোন্ উৎকৃষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ক'রবে বল ? এই মন্ত্রে যজ্ঞই যে জীবের একমাত্র ধর্ম্ম, প্রাণকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার উপায়, একথা কি আর বেশী ক'রে বোঝাতে হবে ? জগতের কর্ম্মযুগে, বৈদিকযুগে, যজ্ঞই মানুষের উত্তম ধর্ম্ম ব'লে কেন নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল এটা এখন বোধ হয় ভাই তুমি বেশ বুঝতে পারলে। কর্ম্ম-ময় বেদ যজ্ঞ ধর্ম্মের উপদেশ না দিয়ে আর কোন্ ধর্ম্মের উপদেশ দেবে ?

মরণের প্রাণের কর্ম্মযজ্ঞের প্রথম গুরু, প্রথম শিষ্য, সেই যজ্ঞের বিধান রহস্য পেলে ভাই, এইবার একবার এস আলোচনা করা যাক, শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন ক'রে দেখা যাক, ঐ প্রাণের জ্ঞানযোগের গুরু কোথায় ? কোন্ ভাগ্যবান্ ঐ যোগে প্রথম উপদিষ্ট ? কার কাছে এই শিক্ষা নিতে হয় ? এ যোগের মূল রহস্য কি ? একটু খুঁজে পেতে দেখলেই দেখবে ভাই যজ্ঞ দীক্ষার প্রচারেও যে পদ্ধতি এখানেও সেই পদ্ধতি। শুদ্ধ প্রাণ সর্ব্বপ্রাণের মহাযোগে যোগেশ্বর হ'য়ে,'বিবস্বান্ মূর্ত্তিতে' 'হংস' রূপে প্রতিষ্ঠিত আদিত্যনারায়ণের নিকট, আপনারই যোগের ভাবের প্রাণের নিকট, সবাই আমার প্রাণে আমি সবাইকের প্রাণে, সবাই আমার সমাধি জ্ঞানে, আমি সবাইকেরই সমাধি জ্ঞানে, এই মন্ত্র ব্যক্ত ক'রেছেন, জ্ঞানতন্ত্রের ঋষি, ভগবদ্গীতার ঋষি, এই কথাই বলেন। প্রাণ যেই বৈবস্বতের অধিকার ভুক্ত হ'ল, অমনি সেই বিবস্বান্ দেবতা বৈবস্বতের অধিকারের অধিকারী বৈবস্বতে মনুকে মৃত্যুর অধিকারে এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখবার ভার দিলেন। কঠোপনিষদের ঋষিও নিজ বৈবস্বত যমের নিকট অজ্ঞ—'নচিকেতাঃ'—মানব এই জ্ঞান লাভ ক'রেছে এই কথাই প্রচার ক'রে গেছেন। যজ্ঞকর্ম্মে যে অগ্নি জগতের সত্তার তেজঃ, জ্ঞানের যোগে সেই অগ্নিই জগতের জ্ঞানের জ্যোতিঃ।

উপনিষদের ঋষির মুখে তাই এই বিদ্যা 'অগ্নিবিদ্যাই'। সমস্ত জ্ঞানের সার জ্ঞান, সমস্ত যোগের শ্রেষ্ঠ যোগ রাজযোগ, এই অগ্নিবিদ্যা। মৃত্যুর প্রাণের, মরণের জগতের, অধিকারী বৈবস্বত হ'তেই, মরণের জগতে এই মহাবিদ্যা মহাযোগ প্রচলিত। ভাই, উপনিষদের ঋষির মুখে উজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত নচিকেতার উপাখ্যানের সার মর্ম্ম যদি একবার অনুধাবন করবার চেষ্টা কর, তা হ'লে বুঝবে এই নাচিকেতস বিদ্যা, মরণের অজ্ঞানের প্রাণের আদর্শ জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযজ্ঞের সমান মন্ত্রেই অনুমন্ত্রিত। এক প্রাণের সকল প্রাণে যোগ, সকল প্রাণের এক প্রাণে যোগ, পূর্ণ একপ্রাণতায় প্রাণের চরম জ্ঞান। অজ্ঞ জীব 'নচিকেতাঃ' অজ্ঞ হ'লেও, মরণের মোহে প'ড়েও, প্রাণে প্রাণে বোঝে এক প্রাণের উপদেশ ছাড়া জানবার যোগে তার কিছু বড় নেই। মরণের প্রাণের অধিকারী যত রকমেই অজ্ঞানের ভাবে নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করুক না, কেন, নচিকেতাঃ মহাপ্রাণের বিদ্যা, কি ক'রে খণ্ডপ্রাণ অখণ্ডভাব পাবে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হ'য়ে বৃহত্তম 'ব্রহ্ম' ভাব পাবে, সেই বিদ্যাই চায়। খণ্ড প্রাণে খণ্ড প্রাণের যোগে, জ্ঞান যত বড়ই হোক না তবু খণ্ড বৈ অখণ্ড নয়। এটা ওটা অসংখ্য ভাবের প্রাণে তোমার খণ্ড প্রাণের জ্ঞান নিয়োগ কর তবু সেটা খণ্ডিত প্রাণের খণ্ড জ্ঞান। যতক্ষণ প্রাণ অনন্ত প্রাণের ভাব এক সঙ্গে প্রাণে জাগাতে না পারবে, একজ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান লাভ ক'রতে না পারবে, এক প্রাণের যোগে সকল প্রাণের যোগ না পাবে, ততক্ষণ প্রাণ ক্ষুদ্র, সে বিদ্যা রাজবিদ্যা নয়, অগ্নিবিদ্যা নয়। রাজবিদ্যা অগ্নিবিদ্যা এক প্রাণে সর্ব্ব প্রাণের বিদ্যা। নচিকেতাঃ চরমে এই বিদ্যাই বৈবস্বতের নিকট আদায় ক'রে নিজেও ধন্য হ'য়েছেন, জগৎকেও ধন্য ক'রেছেন। এই রাজযোগের অগ্নিবিদ্যার সার সঙ্কলন ক'রে, 'সাবিত্রী' জপ করে, সেই মন্ত্র ধ্যানে, মানবের চরম কল্যাণ ঋষিরা নির্দ্দেশ ক'রে গেছেন। অখণ্ড আদিত্য প্রাণে প্রাণের যোগই ঐ ধ্যানের চরম তাৎপর্য্য। সেই যোগেই জীবের চরম জ্ঞান। প্রাণের আদিত্য-ভাবেই সকল প্রাণের ভাব। সকল প্রাণের কেন্দ্রে ভগবান্ আদিত্য।

মানব, বৈবস্বতের অধিকারভুক্ত মানব, প্রাণের জ্ঞানসাধনায় সর্ব্বতোভাবে সকল প্রাণের সঙ্গে এক প্রাণ হ'লেই তুমি কৃতার্থ হবে। সাবিত্রীমন্ত্র ধ'রে সর্ব্বপ্রাণময় সবিতার ধ্যানযোগ তোমার এই জ্ঞানযোগের প্রধান সম্বল।

এইবার ভাই জগতের প্রেমভক্তির লীলার, আনন্দের লীলার, আদি গুরু আদি শিষ্য আর সেই লীলার প্রচার পদ্ধতি ভাবতে হবে, ভেবে দেখতে হবে মৃত্যুর প্রাণের কিরূপে এই লীলায় যোগাযোগ। কর্ম্মযজ্ঞ আর জ্ঞানযোগের তুলনায় প্রেম ভক্তির একটু বৈচিত্র্য আছে, এ কথা গোড়াতেই ভাল ক'রে বোঝা দরকার। প্রেমভক্তির প্রাণ ভালবাসার প্রাণ। অখণ্ড প্রাণের ভাবে, বৈকুণ্ঠের নিত্য ভাবে, বৈকুণ্ঠের প্রাণের কেন্দ্র, সকলপ্রাণের প্রিয়তম, সকলের প্রাণের প্রেমরসের আকর্ষণকারী, কৃষ্ণচন্দ্র। প্রিয়তম ব'লে তিনিই পুরুষ আর সব স্ত্রী, এক রমণ আর সকলেই রমণী। যে যে দেহেই থাকুক, সিদ্ধভাবে, প্রীতির চরম ভাবে, সবাই 'কৃষ্ণরমণী'। সেখানে মৃগ পশু পক্ষী লতাও সিদ্ধভাবে এই রমণীর হৃদয় নিয়েই প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গ-বদ্ধ। এই অনন্ত রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হ'য়েই কৃষ্ণের নিত্য আনন্দের রাস। শুধু তাই নয়, সেখানকার অনন্ত প্রাণের ধারার সব প্রাণই অখণ্ড প্রীতির অভিনয়ে প্রত্যেকেই অপর সকলের দৃষ্টিতে এক এক কৃষ্ণ। সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ, প্রত্যেক কৃষ্ণই অনন্ত রমণী-মণ্ডলে বেষ্টিত। প্রীতির ভাবে এ এক অদ্ভুত রহস্য। নিত্যরাসে মধ্যে কৃষ্ণ, চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকামিনীগণ, সর্ব্বত্র কৃষ্ণ, প্রতিকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণকামিনীগণ, কৃষ্ণকামিনীগণও প্রত্যেকে অপর সকলের নিকট কৃষ্ণ। এই রাসের প্রথম আচার্য্য কে? অবশ্যই গোপলোকের, মধুময় আদিত্যলোকের অধিষ্ঠাতা, গোবিন্দ, গোপাল। তাঁর চতুর্দ্দিকে যে প্রেমভক্তির ভক্তগণ, তাঁর শিষ্যগণ, তাদের প্রাণে গোপরমণীরই ভাব। গোপরমণী হ'য়েই প্রত্যেকে তাঁর উপাসিকার ভাব, আরাধিকার ভাব, প্রাণে ধারণ ক'রে কৃতার্থ। এই লীলার উপদেশ আর কিছুই নয়,

কেবল এই যে, প্রত্যেক শুদ্ধ প্রাণই সব প্রাণকে টানছে, সব প্রাণই এক প্রাণে টানা, প্রাণই প্রাণের ভালবাসার পাত্র, আসল প্রাণের সঙ্গ হ'লেই প্রাণ কৃতার্থ, একবারে সকল প্রাণকে ভালবাসতে পারা, সকল প্রাণের ভালবাসার পাত্র আপনি হ'তে পারা, আর এক সঙ্গে এক প্রাণের হ'য়ে সেই এক প্রাণের প্রেমে পূর্ণ ভাগে ভাগীদার হ'তে পারাই, আনন্দের ভাবে প্রাণের নিত্য ধর্ম্ম। ব্রহ্মাণ্ডের মর্ত্ত জীবের ভাগ্যোদয়ে যদি ভানু-নন্দিনীর উপকূলে, ভানুনন্দিনীর অধিষ্ঠানে, অমৃতরসময় মধুবনের কেন্দ্রে, এই রহস্য বৃষভানুর আত্মজার নিকট প্রকটিত হ'য়ে থাকে তাতে আর বিচিত্র কি ? কেবল ভাবতে হবে এই লীলাভূমি সব ব্রহ্মাণ্ডের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথিবীর প্রাণের কেন্দ্র ভূমি। গোরূপা পৃথিবীর কেন্দ্র ব'লে এই পুণ্যভূমি, গোব্রজ, গোকুল। প্রাণের এই আদর্শ আনন্দলীলায় কেবল গো, গোপ,গোপী, আর স্বয়ং গোপাল, প্রাণগোপাল। বুঝি অখণ্ড আদিত্যলোকের গোলোকের দিব্য মূর্ত্তিও সাধকের দৃষ্টিতে গোমূর্ত্তি, তাই গোলোকের ছায়ায় গোলোকের আবৃত মূর্ত্তি পৃথিবীতেও গোমূর্ত্তি। বাস্তবিকই প্রাণের অধিষ্ঠানের দিব্যমূর্ত্তিতে গোমূর্ত্তির ভাবে কিছুই আশ্চর্য্য নেই। জীবের প্রাণ-ধারণের সকল অন্নরসের সার ক্ষীরধারা যার স্তন্যধারা, জীবের প্রাণ ধারণের অধিষ্ঠানে প্রাণের দিব্য বিধানে তা ছাড়া আর কোন্ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ? গোলোকও তাই গোলোক, পৃথিবীও তাই গোরূপা। তার চরম কেন্দ্রে একভাবে তাই ব্রজভূমির প্রতিষ্ঠা না হ'লে চ'লবে কেন ? * ধন্য (বৃষ) ভানু-নন্দিনী ! ধন্য তাঁর সহচরীবৃন্দ ! আর

* রাধাষ্টমী ব্রত কথায় দেখা যায় সূর্য্যদেব মহাতপস্যায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করেন। তার পর কৃষ্ণের নিকট সূর্য্য এই বর চান যেন সূর্য্যের এমন এক কন্যা জন্মে যে স্বয়ং কৃষ্ণ তাঁর একান্ত অনুগত হন। তাই তাঁর প্রাণের প্রাণশক্তি রাধা, 'গোকুলে' যখন সূর্য্যদেব (বৃষ) ভানু 'গোপ' রূপে অবতীর্ণ হন, আর তিনি স্বয়ং গোপরাজ নন্দের নন্দন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, সেই সময় সেই (বৃষ) ভানুর কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

ধন্য মধুবন ! ধন্য জগৎ ! ধন্য পৃথিবী ! ধন্য ব্রজমণ্ডল ! ধন্য ব্রজেশ্বরী ! ধন্য গো-গোপ-গোপিকাকুল ! আর ধন্য দেবাদিদেব বিবস্বান্ ! তাঁরই ভাবে প্রাণ একদিকে দিব্য লীলার, অন্য দিকে মর্ত্ত্য লীলার চরম শিক্ষা প্রচারে ব্রতী। মানব বৈবস্বতের অধিকার হ'তে যদি মুক্ত হ'তে চাও, প্রীতির বলে যদি সবাইকে আপনার ক'রতে চাও, তাহ'লে প্রাণের প্রাণকে প্রিয়তম ব'লে আলিঙ্গন ক'রে তাঁর আলিঙ্গনে সকল প্রাণের সঙ্গলাভের মন্ত্রই সার মন্ত্র কর। সকল প্রাণই সেই মহাপ্রাণের আলিঙ্গনে বদ্ধ। তাঁর আলিঙ্গনে এক আলিঙ্গনে সবাইকে বুকে রাখতে পারবে। শুদ্ধাবস্থায় সবাই তোমার আলিঙ্গনের পাত্র। শুদ্ধ প্রেমের চরম সোপানে উঠে সমস্ত নিত্য প্রাণের শুদ্ধ প্রেম ভোগ কর। দেখবে কেউ তোমায় ছেড়ে নেই, তুমি কাউকেই ছেড়ে নেই। প্রাণের প্রাণে যখন এটা অবধারণ করনা, সেটা তখন তোমার ভাগ্যদোষ। খণ্ড প্রাণে ছিন্ন প্রাণ, ছিন্ন প্রাণে ভিন্ন প্রাণ। অখণ্ড প্রাণে এক প্রাণ, অনন্ত প্রাণেও এক প্রাণ। একে অনন্ত, অনন্তে এক। কৃষ্ণের মহাকর্ষণের দিব্য আলিঙ্গনের এমনি মহিমা !

ভাই, প্রাণের সাধনায় অখণ্ড প্রাণের দিব্য আদর্শ সবই পেলে। মর জগতেও এসব অমর আদর্শ তোমার দুর্ল্লভ নয়। দুর্ল্লভ না হ'লেও কিন্তু মায়ার ছলনায়, প্রাণে অপ্রাণের আঘাতে, তোমার ছিন্ন ভিন্ন প্রাণে, চারি দিকে ছিন্ন ভিন্ন প্রাণের দৃষ্টিতে, এ সব আদর্শের অনুসরণ করাও তোমার পক্ষে সুকর নয়। তোমার প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন হ'লেও, চারিদিকে জগতের প্রাণ মরণে ছিন্ন ভিন্ন হলেও, একটা কিন্তু সুবিধা আছে। ছেদ-ভেদেও প্রাণ এক প্রাণের ভাব ছাড়তে পারে না। ছেদ ভেদ ত ছল মাত্র, তার ভেতরে ভেতরে একভাবটা না থেকে যাবে কোথায় ? তাই প্রাণ সমাজবদ্ধ হ'তে চায়, আর যতই শুদ্ধ হ'তে থাকে ততই নিজের সমাজকে বিস্তৃত ক'রতে থাকে। কর্ম্মের জীবনে, জ্ঞানের জীবনে, প্রেমের জীবনে সর্ব্বত্রই এই রীতি। প্রথম দশজন লোকের সম্বন্ধে কর্ম্মজীবন, দশজনের জন্য মানুষের কর্ম্মযজ্ঞ, দশজনের

জন্য, আত্ম পরিবার কুটুম্বের জন্য, আত্মোৎসর্গ ক'রতে মানুষ শেখে, শেষে যতই প্রাণে বড় হয় ততই দেশের জন্য,জগতের জন্য প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ধন্য হয়। সমগ্র মনুষ্য জাতির জন্যে, চরমে সমগ্র জীবজগতের জন্যে, যে প্রাণ উৎসর্গ হ'তে পারে, সেই প্রাণ খণ্ড প্রাণের জগতেও পূর্ণের ভাব আয়ত্ত ক'রেছে। যজ্ঞের ভাবে প্রাণ শুদ্ধ হ'তে শুদ্ধতর হ'তে থাকে। জ্ঞানে প্রথমে দশটা বস্তুর সম্বন্ধ নিয়ে, নিজের দেখা শুনো জানা কয়টা বিষয়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ ধ'রে, মানুষ জানতে আরম্ভ করে, ক্রমে জ্ঞানের প্রাণ যতই বিস্তৃত হয়, ততই চারিদিকের সম্বন্ধের সূক্ষ্ম সূত্র, বিজ্ঞানের সূত্র ধ'রতে থাকে, শেষে সকল বস্তুর সর্ব্বব্যাপী মূল রহস্য চরম সম্বন্ধের তত্ত্ব নির্ণয় করবার জন্যে অগ্রসর হয়। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্র ধ'রে ধ'রে যিনি এক প্রাণে সকল প্রাণের তত্ত্ব, সকল প্রাণে এক প্রাণের তত্ত্ব খুঁজে নিতে পারেন, কি ক'রে এক প্রাণের শাসনে জগতের অনন্ত নিয়ম পদ্ধতি প্রবৃত্ত হ'য়েছে এটা হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারেন,তিনি জগতের জ্ঞানের ধারা ধ'রেও পূর্ণ জ্ঞানের যোগের অধিকার লাভ করেন। প্রেমের পথে মানুষ প্রথমে দশ জনের সঙ্গে এক প্রাণ হয়, শুদ্ধির উচ্চস্তরে একটা প্রকাণ্ড মানবসমাজের সঙ্গে এক প্রাণ হয়, সমস্ত সমাজটাকেই ভাল বাসে, চরমে জগতের সমগ্র মনুষ্য সমাজের এমন কি সমস্ত জীব জগতের সঙ্গে এক প্রাণ হ'য়ে সবাইকে আপনার ভাবতে চায়। এই বিশ্বপ্রেম মরণের প্রাণের শুদ্ধতম ভাব। এভাব হ'লে মরণের জগতেও প্রাণ মরণের অতীত হয়।

একটা কথা মনে উঠতে পারে যে মানুষ কর্ম্মযজ্ঞের পরিসর, জ্ঞানযোগের পরিসর, প্রেমবন্ধনের পরিসর কেবল বাড়াতে চায় কেন? চায় প্রাণেরই তাড়নায়। নিজের দিকে মানুষ যতই চাবে ততই বুঝবে সে নিজেতে থেকেও বাইরের প্রাণীতে আছে,সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণীতে আছে, সবাই তাতে আছে। নিজের জন্মকথা আলোচনা ক'রলেই একথা প্রাণে প্রাণে বুঝবে। যেমন একটা বটের বীজে

বটবৃক্ষ, সেই বৃক্ষের অনন্ত ফলে অনন্ত বীজে অনন্ত বৃক্ষ, ক্রমেই এক সূক্ষ্ম বীজশরীর থেকে অনন্ত বটের বংশপ্রবাহ, মানুষেরও তাই, সমস্ত জীবেরই তাই। এক মানুষের বীজে কত সন্তান সন্ততি, ক্রমে তা থেকে বিপুল বংশ, এক বীজে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানব। এর ওপর একবার ভাব দেখি আজকের মানুষ শুধু আজকেরই নয়, কত বার কত জায়গার কর্ম্মক্ষেত্র ঘুরে এসেছে, মানুষ হ'য়ে এসেছে। কোটি কোটি মানুষ জন্ম যদি এক করা যায় তবে সাহস ক'রে ব'লতে পারা যায়,আজকের সমগ্র মানুষ সমাজে একজন মানুষের বীজ ছড়ান। সবাই এক বীজে, এক বীজ সর্ব্বত্র। বীজের ভাব ভাবলে জগতে মানুষের সমস্ত ভিন্ন দেহে এক দেহেরই খোঁজ পাওয়া যায়। এর উপরে আরও একটু ভাব। চৌরাশী লক্ষ যোনি ঘুরে এসে মানুষ মানুষ। কর্ম্মের ফলে এই ঘোরা ফেরা। তা যদি হয় তবে প্রত্যেক যোনিতে প্রত্যেক জীব দেহকে একটা বীজ ভেবে,সেই বীজের বংশধারা ভেবে, যদি দেখ ত বুঝবে, চৌরাশী লক্ষ যোনির জীবেই ঐ মানুষের চৌরাশী লক্ষ ভাবের বীজ থেকে চৌরাশী লক্ষ রকমের জীবের জগৎ ছে'য়ে আছে। একথা ভাবলেই বোঝা যায় জগতে সত্য সত্যই এক জীবে সকল জীবের সত্তা, সব জীবে এক জীবের সত্তা। খণ্ড প্রাণেও প্রত্যেক প্রাণী বিশ্বরূপী। আমি সর্ব্বত্র, সব আমাতে। প্রাণ নিজের ভাবে অনন্ত এবং এক ব'লেই ছলনার ভেদেও এভাব পোষণ না ক'রে পারে না। এই ভাব কপটে অকপটে প্রাণের সঙ্গী ব'লেই এই ভাবের তাড়নাতেই প্রাণ আপনার কর্ম্মে, আপনার যজ্ঞে, জগতের কর্ম্ম, জগতের যজ্ঞ, করবার দিকেই নিজের ভাবে ঝুঁকবে, আপনার কর্ম্মে সকলের কর্ম্ম বুঝতে চাবে, সকলের কর্ম্মে আপনার কর্ম্ম বুঝতে চাবে। চারিদিকেই জীবের কর্ম্মে আমি নিজেকে অর্পণ ক'রেছি, প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্ম্মে আমার কর্ম্ম ক'রছে। অনন্ত জীবনযজ্ঞে এক যজ্ঞ। খণ্ড ভাবেও সব প্রাণে এক প্রাণ ব'লে প্রাণে প্রাণের যোগে, প্রাণে প্রাণের সম্বন্ধে, যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান ছোট

খাট সম্বন্ধ ধ'রে আরম্ভ হ'লেও, চরমে সকল সম্বন্ধের মধ্যে এক সম্বন্ধ, এক সম্বন্ধের মধ্যে সকল সম্বন্ধ ধরবার দিকেই যাবে। অনেক সম্বন্ধের মধ্যে এক সম্বন্ধ ধ'রতে পারাই ত বিজ্ঞানের রীতি। চরম বিজ্ঞান এক বিজ্ঞানে অনন্ত বিজ্ঞান। আনন্দের সংসর্গেও এমনি অন্য সম্বন্ধে আপন্যর মমতা, আপনার ভালবাসার ভাব, কৃতার্থ ক'রতে ক'রতে চরমে সমস্ত জগৎকে আমার করবার ভাবের ঝোঁক ভেতরে ভেতরে টের পাবে। এক টানে সব টান, সব টানে একটান প্রাণের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে। প্রাণের খণ্ডভাব যে ছল মাত্র, প্রাণ কখনই যথার্থ খণ্ড খণ্ড হয় না, প্রাণের সব সাধনাতেই এটা মনে মনে জাগে। নিত্য অনিত্য সকল ভাবেই প্রাণকে যেমন ক'রেই সাধ সব প্রাণে এক প্রাণের ভাব কখনই ছাড়তে পারবে না ভাই।

প্রাণ, যাগের, যোগের, প্রেমের সাধনায়, একবার নিজেকে, বেশ ক'রে জাগিয়ে তোল দেখি। তার পর তুমি তোমার ভক্তির প্রাণে দেখবে তোমার 'সিদ্ধ' অবস্থায় তুমি যেখানে থাকনা, যা নিয়ে থাকনা, নিয়তই মহাশূন্যের ওপরে, 'পরম ব্যোমে' 'গোলোকে' তোমার স্থিতি, সেই অধিষ্ঠানে তুমি 'নিত্য,' 'সনাতন'। তোমার সেখানে সকল রকমেই, সকল দিকেই, অখণ্ড অধিকার। সেই অধিষ্ঠানের এক হিসবে যা একটা চরম ক্ষুদ্র 'পরমাণু', তা আবার অন্য হিসাবে অতি বৃহৎ পূর্ণ 'ব্রহ্ম'। সেই একটা একটা পরমাণুর, প্রাণময় জীবকণার, প্রাণের শক্তি, প্রাণের 'স্পন্দন', প্রাণের ঢেউ, যা কিছু থাকতে পারে সবের ওপর সকল সময়েই নিজেকে ছ'ড়িয়ে দিচ্ছে। অতি সূক্ষ্ম প্রাণকণিকাও নিজের স্পন্দনের তরঙ্গে সকল প্রাণের সকল 'রন্ধ্রেই' ঢুকে আছে। অনন্ত প্রাণ, অগুণতি প্রাণ, সবই 'পরমাণু', সবই 'ব্রহ্ম'। যে স্পন্দনের তরঙ্গে একের সঙ্গে পাঁচের, একের সঙ্গে সকলের আলাপ পরিচয় সম্বন্ধ, সেই তরঙ্গই প্রাণ তোমার নিত্য ভাষা, নিত্য 'শব্দ,' নিত্য 'মন্ত্র', তাতেই তুমি 'ব্রহ্ম'। এই ব্রহ্মের 'বিধানেই' তুমি সকল অবস্থায় সবে, সব তোমাতে। যা কর,

যা ভাব, যা ভোগ, সবই এই 'বিধানে'। আপনার বিকাশেই, আপনার বিলাসেই, প্রাণের স্পন্দনেই, নিজেকে নিজে ছ'ড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে নিজে আহুতি দিয়ে, নিজেকে নিজে ত্যাগ ক'রে, নিজেকে নিজে সমর্পণ ক'রে, তুমি সব ক'রছ, সব জানছ, সব ভোগ ভুগছ। প্রাণের মন্ত্রের যজ্ঞেই তোমার সব কর্ম্ম, সব জ্ঞান, সব ভোগ। যাগেই যোগ, যাগেই তোমার পূর্ণ ভাব। যাগ, যোগ, প্রেম, তিনেই এক, একেই তিন। তোমার নিজের খেলা নিজের লীলা নিজের স্পন্দনেই তোমার যাগ যোগ প্রেম, কর্ম্ম জ্ঞান আনন্দ। মহাব্যোমের প্রাণে, সিদ্ধ প্রাণে, প্রাণ আর প্রাণের নিজের লীলা, নিজের স্পন্দন, নিজের শক্তি, তা ছাড়া আর কিছুই নেই। ছোট দৃষ্টিতে যে তরঙ্গে মরণ, যে তরঙ্গে মোহ, যে তরঙ্গে যাতনা, সেই মরণ, সেই মোহ, সেই যাতনা, সিদ্ধ প্রাণে প্রাণ তোমার নিজের জীবনের খেলা, জ্ঞানের খেলা, আনন্দের খেলা। তুমি তখন নিজের 'স্বভাবেই,' 'সহজ ভাবেই', যাগী, যোগী, প্রেমিক। থাকবার করবার 'বিষয়,' জানবার 'বিষয়', ভোগের 'বিষয়,' 'সিদ্ধ অধিষ্ঠানে' প্রাণ তোমার নিত্যস্পন্দনের নিত্যশক্তির প্রবাহেই ভেসে ওঠে। যে 'মহামন্ত্রে' সবাইকের প্রাণের 'স্পন্দনের' এক 'মহাতরঙ্গ' সব ব্যেপে আছে, সেই কর্ম্মের যজ্ঞের মহামন্ত্র, জ্ঞানের যোগের মহামন্ত্র, প্রেমের রাসের মহামন্ত্র, বিশ্বজোড়া প্রাণের, সব প্রাণের প্রাণের প্রাণের ভাষায় গাঁথা, প্রাণের বাঁশরীতে সাধা। প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বেজে ওঠে সিদ্ধ লোকে সেই **মুরলীর** ধ্বনি। ঐ **মুরলীর** সহজশক্তিতে প্রাণ তোমার সকল যাগের, সকল যোগের, সকল আনন্দের শক্তি, তোমার পূর্ণ কল্যাণের শক্তি। 'ভক্তির প্রাণের' ঐ মোহন '**মুরলীতে**, ঐ চরম **কল্যাণী** শক্তিতেই সমর্পণ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী

উচ্চ অঙ্গের গবেষণাপূর্ণ

১। **ভক্তির প্রাণ** (সম্প্রতি প্রকাশিত)

২। **The Bhakti Cult In Ancient India**

(*Just out*)

সুবৃহৎ ইংরাজী গ্রন্থ। বৈদিক যুগ হইতে ভক্তিবাদ স্তরে স্তরে কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহা বিশদভাবে দেখান হইয়াছে। বৈদিকমত, পাষণ্ডিমত, জ্ঞানকর্ম্মবাদ, জড়বাদ, কর্ম্মযোগ, সাংখ্যদর্শন, নাস্তিক জৈনবৌদ্ধদর্শন, সেশ্বর ন্যায়বৈশেষিক পাতঞ্জলদর্শন, বৈদান্তিক নির্বিশেষ জ্ঞানবাদ, স্মার্ত্ত জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদ, এই সমস্ত একে একে আলোড়ন করিয়া সর্ব্বত্র মূলে ভক্তির অধিষ্ঠান ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। শেষে অতি বিস্তৃত ভাবে সমুজ্জ্বল সাত্বতভক্তিবাদ পর্ব্বে পর্ব্বে বিশ্লেষণ করিয়া বোঝান হইয়াছে।

৩। **বাঙ্গালা প্রয়োগ বিজ্ঞান (উপোদ্ঘাত-খণ্ড)**

বাঙ্গলাভাষার মূল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। হিতবাদী, অমৃতবাজার, বেঙ্গলী প্রভৃতি বাঙ্গলা ইংরাজী সংবাদপত্রে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থের সংস্করণ।

৪। **শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা** প্রেমদাস রচিত

অতি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ। পারমার্থিক ভক্তির তত্ত্বে পূর্ণ। ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে সম্পাদক ইহাতে নানাবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইংরাজী বাঙ্গলা সংবাদপত্র সমূহে এই সংস্করণের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছে।

পাঠ্য পুস্তকাবলী

১। ভারতের কথা

২। সাহিত্যপাঠ প্রথমভাগ
৩। সাহিত্যপাঠ দ্বিতীয়ভাগ
৪। সাহিত্যপাঠ তৃতীয়ভাগ
৫। সাহিত্যপাঠ চতুর্থভাগ
} শিক্ষাবিভাগের অনুমোদিত

সম্পাদিত সংস্করণ—

৬ উপক্রমণিকা ও পরিশিষ্ট

৭। **Raghuvansam XIII**
৮। **Raghuvansam IV**
৯। **Raghuvansam XV**
} ইংরাজী সংস্কৃত তাৎপর্য্য ও ইংরাজী টীকাটিপ্পনীভাগ স্বরচিত (এই সংস্করণ এক্ষণে আর মুদ্রিত নাই)

OPINIONS OF THE PRESS.

THE BENGALEE, 28-3-20

Bangla Prayoga Vijnana

The volume under review is a highly valuable scholarly work. A vast amount of information has been given on every subject dealt with in the work, the Bengali alphabet, the words, word-formations, word-imports and various other cognate matters. The basic principles of the Bengali language have been explained most clearly and authoritatively. We can say without any hesitation that the work will prove a great boon to advanced workers in the field of Bengali language. While the best scientific methods have been adopted in the treatment of the subject matter,the author has laid under contribution all the wellknown authoritative Hindu works on the subject—namely Pratisakhyas, Niruktas, Vyakarans the commentaries, The Tantras and the Puranas. The Philosophies of Grammar and the Rhetorical works. Indeed the author's encyclopaedic knowledge makes his expositions highly interesting and profoundly learned all through.

Sri Sri Vansi Siksha of Premdas edited with copious prefatory notes and an appendix by professor Bhagabat Kumar Goswami Shastri M. A. Research Scholar. Price one rupee six annas.

This great work on the doctrine of ecstatic love and devotion is weil known throughout the Vaishnavite world The notes appear to us to be very valuable and scholarly The life of Vanshibadan to whom Sri Chaitanya confided at first the great secret of his religion has been carefully collected and given at some length in the preface. Premdas's life appears in full for the first time in the introduction and a critical estimate is given of his great work The appendix contains tables of Vansi's main lines of disciples. A very common error about the birth-date of Sri Gauranga has been,

we are glad to note, corrected authoritatively. Altogether much information of great historic value is to be found in the notes added by the learned editor. The edition is practically free form printing errors. We strongly commend the edition to the notice of all interested in Vaishnavism.

A B, PATRIKA, 24-3-20

Bangla Prayoga Vijnana

Introductory part by Professor Bhagabata Kumar Goswami Shastri, M A. Research Scholar. Price Annas eight.

The volume before us deals with the fundamental principles of the Bengali language and is complete in itself. The great merit of the work lies in the fact that while the subject matter is treated in the strictest and most up-to-date scientific method, it makes the fullest use of the best researches of the old Hindu sages—the philosophers, grammarians and historians. In every section of the work, phonetics and phonetic laws, word-arrangements and word-imports, the author has much new information to give, historic, philosophic and scientific. The value of the work is greatly enhanced by the introduction of aphorisms to indicate the general idea on every point followed by elaborate discussions and encyclopaedic informations. The explanations and dis cussions are so lucid that no point touched upon is left in the dark. The book will be of immense help to those engaged in advanced studies and researches in Bengali language. Now that Bengali has been introduced into the curriculum of the University upto the M. A. standard, we recommend its adoption as a text book for advanced studies in the B. A. and M. A. classes.

Sri Sri Vansi Siksha of Premdas—

Edited with elaborate introductions and an appendix by Prof. Bhagabat Kumar Goswami Shastri M. A. Research Scholar, Price one rupee six annas.

Professor Goswami has done a great service to the Vaishnava world by this edition of the great work of Premdas. The main work, as every student of Vaishnavism knows, elaborately deals with the doctrine of religious [illegible]n and love in its highest stage and finest phase of ecstatic devotion to God Srikrishna. It is based upon the teachings of Lord Gauranga to Sri Vansivadana—teachings imparted just on the eve of the Lord's retirement from home and home-life. As such the work has a historic value of great importance. This value of the work is enhanced by the very scholarly introduction and the appendix added in the edition under review. Among other things the reader will find in these additions an elaborate life of Sri Vansi-vadana, an account of the great author and his works, as well as a chart of the main lines of Vansi's disciples. Incidentally an authentic account is given of its holy shrine of Balaram at Bagnapara—the history of the foundation and growth. We commend the book to every one interested in the study of Vaishnavism and Vaishnava history.

সমালোচনা

(বাঙ্গালী ২।৯।২৬)

বাঙ্গালা প্রয়োগ-বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী ইহার প্রণেতা। আমরা জানি, গোস্বামী শাস্ত্রীমহাশয় একজন সুবিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত বৈয়াকরণ। ইউনিভার্সিটীর সকল পরীক্ষায় তাঁহার মতন সাফল্য লাভ করিতে আমরা ত আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি এই পুস্তকের ভূমিকায় এইটুকু বলিয়াছেন—

"এই বাঙ্গালা প্রয়োগ-বিজ্ঞান গ্রন্থখানি চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডে বাঙ্গালা শব্দবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি আলোচিত হইল। এই জন্য ইহার নাম উপোদ্ঘাতখণ্ড। দ্বিতীয়খণ্ড বিভক্তিখণ্ড। এই খণ্ডে নাম বিভক্তির ও আখ্যাত বিভক্তির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আলোচিত হইবে। তৃতীয়খণ্ড প্রকৃতি খণ্ড। ইহাতে বিভক্তির পূর্ব্বাবস্থায় নাম ও ধাতুর উৎপত্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ থাকিবে। চতুর্থখণ্ড বৈচিত্র্যখণ্ড। বাক্য মহাবাক্যাদিতে শব্দের প্রয়োগে যে বিবিধ বৈচিত্র্য সংঘটিত হয় তাহার পরিচয় দেওয়াই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য।"

আমরা তাঁহার এই প্রয়োগ বিজ্ঞান মাঝে মাঝে একটু আধটু পড়িয়া দেখিয়াছি। বেশ ভালই লাগিয়াছে। ভাষাভিজ্ঞ এবং শব্দখণ্ডে সুপরিচিত পণ্ডিত মাত্রেরই এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইউনিভার্সিটির বাঙ্গালাবিজ্ঞানে ইহা পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে আমরা সুখী হইব। তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল লইয়া আলোচনা করিবার স্থান ও অবকাশ আমাদের নাই, সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে সে আলোচনা রুচিকরও হইবে না, তাই আমরা 'বাঙ্গালা প্রয়োগ-বিজ্ঞান' পুস্তকখানি বাঙ্গালায় বিদ্বজ্জন সমাজকে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা

(শ্রীশ্রীরসরাজোপসনা)

মহানুভব শ্রীপ্রেমদাস মিশ্রেণ বিরচিতা মূল্য ১।৵০। ইহা একখানি পুরাতন পুঁথি। ভক্তিশাস্ত্রে রসলীলার অমূল্য পুঁথি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যাঁহারা ভক্ত ভাবুক রসমার্গের সাধক তাঁহারা এই পুস্তকের মূল্য জানেন এবং

বুঝেন। গোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয় এমন অমূল্যনিধিকে নির্ভুল ও নিষ্কলঙ্ক করিয়া বাঙ্গালার রসিক সমাজকে উপঢৌকন দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। রসোপাসনার পরিচয় না দিলে পুঁথির মহিমা বুঝান কঠিন। রস কি, আসক্তি কি, রাগ কি, এবং তাহাদের সাহায্যে ভগবানের সামান্য সাধন কেমন করিয়া হয়, মূলের এই তত্ত্ব যাঁহারা না বুঝিবেন, তাঁহারা এ পুস্তকের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন। শেষ সকল কথা বলিতে হইলে বৎসরেক কাল এই বাঙ্গালীর চারি পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া সন্দর্ভ লিখিতে হয়, সে অবসর ত আমাদের নাই। যাহা হউক এ সুসমাচারটা আমরা উক্ত সমাজে জ্ঞাপন করিতেছি যে, গোস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা সুসম্পাদিত এবং ভ্রম-প্রমাদ বর্জ্জিত হইয়াছে। ভক্ত-ভাবুক মাত্রেই একটাকা ছয়আনা দিয়া গ্রহণ করুন।

(হিতবাদী ১।১১।২৬)

শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা। শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৬নং গ্যালিফ্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।৵০।

বংশীশিক্ষা অতি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ। মনঃশিক্ষা'র সুবিখ্যাত গ্রন্থকার প্রেমিক ও ভক্ত কবি শ্রীপ্রেমদাস মিশ্রের নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত। তিনি এই গ্রন্থে শাস্ত্র প্রমাণাদি সহিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বাঘনাপাড়া পাটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্‌রামচন্দ্র গোস্বামীর পিতামহ শ্রীমদ্বংশীবদনানন্দ গোস্বামীর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে 'শিক্ষা' প্রদান করিয়াছিলেন তাহা সরল পদ্যে বিবৃত করিয়াছেন। আনুষঙ্গিক ভাবে ইহাতে শ্রীমদ্বংশীবদনানন্দের জীবন কথা ও বাঘনাপাড়া পাটের ইতিবৃত্ত ও বর্ণিত হইয়াছে। সম্পাদক উক্ত বংশীবদনের বংশসম্ভূত; সুতরাং তিনিই এ গ্রন্থ সম্পাদনের উপযুক্ত অধিকারী। সম্পাদক এ গ্রন্থে "প্রমাদ ও প্রক্ষেপের" আশঙ্কা করিলেও তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত গ্রন্থকলেবর বিকৃত না করিয়া বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদ অতি অল্পই আছে। আশা করা যায় এইরূপ নির্ভুল ও সুসম্পাদিত গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত হইবে।

বাঙ্গালা প্রয়োগবিজ্ঞান। উপোদ্‌ঘাত খণ্ড। গ্রন্থকার—অধ্যাপক ভাগবতকুমার শাস্ত্রী, এম্, এ,। ১৬নং গ্যালিফ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য ৷৷০ আনা।

বাঙ্গালা প্রয়োগবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যে গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করিয়াছেন, ইহা তাহার প্রথম খণ্ড; ইহাতে বাঙ্গালা শব্দ বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি আলোচিত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের বি, এ, এম, এ প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীতে এই গ্রন্থ পাঠ্য হইলে শিক্ষার্থিগণের বঙ্গভাষাতেও শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সমাদর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—"সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রু সুসমৃদ্ধ ভাষা ছাড়িয়া অপভাষা কখনই বিদ্বন্মণ্ডলীর আদরণীয় হয় না। বিদ্বন্মণ্ডলী যে ভাষার আদর করেন, সেই মার্জ্জিত ভাষাই জাতীয় আদর্শ ভাষারূপে স্থিরীকৃত হয়। * * * সুতরাং জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় রাখিতে হইলে মার্জ্জিত ভাষার অধিকারও অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।" এ বিষয়ে আমরা গ্রন্থকারের সহিত একমত।

গ্রন্থকার শক্তিশালী লেখক। এ গ্রন্থে তিনি যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে ইহা ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের আদরণীয় হইবে। তাঁহার এই গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইলে ইহা বাঙ্গালাভাষার একটী চিরস্থায়ী সম্পদ্‌রূপে গণনীয় হইবে বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। আমরা এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডগুলি পড়িবার জন্য আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছি। বঙ্গদেশে এ গ্রন্থের আদর হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।